আলোকের পথে

কে, এম, আজ্‌হারুল ইস্‌লাম

এডুকেশনাল সার্ভিস—(বেঙ্গল)

মখাদুমী লাইব্রেরী

৫।এ, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা

মূল্য ১০ টাকা।

প্রকাশক—
মখ্‌দুমী লাইব্রেরী
মোহাম্মদ মোবারক আলি
৫ এ, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা।

গ্রন্থকার
মৌলভী কে, এম, আজহারুল ইসলাম
প্রণীত
সাহিত্য জগতের অপূর্ব্ব বই
"হিমালয় বক্ষে"
(যন্ত্রস্থ)

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস,
মেট্‌কাফ্‌ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌;
৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপহার গ্রন্থ

আমার

কে .

.........র নিদর্শন স্বরূপ উপহার দিলাম।

তারিখ } স্বাক্ষর -

কয়েকটী কথা।

যে কথাগুলি বক্ষমান উপন্যাসে আলোচিত হ'য়েছে সহৃদয়. পঠক-পাঠিকার চ'খে সে প্রকাশিত ও নিদ্রিত ভাবগুলি প'ড়লে আমার লেখা সফল হ'য়েছে মনে ক'রব অন্য ভাষার কতকগুলি কথা বইতে আছে, যাঁরা সে ভাষা জানেন না তাঁরা তা' বাদ দিয়ে পড়তে পারেন কেন না ঐ সব-এর সঙ্গে বইর বড় সম্বন্ধ নাই বইতে যে সকল মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করা হ'য়েছে অনেক শিক্ষিত হিন্দুই বোধ হয় সে সব বুঝতে পারেন, তাই সে গুলোর অর্থ পৃষ্ঠার নীচে দেওয়া দরকার বোধ ক'রলাম না। ছাপার ভুল থা'কলে খোদা চাহে আগামী বারে সংশোধন করা যাবে; ক্ষমাশীল পাঠক-পাঠিকা এবার নিজের জিনিষ মনে করে প'ড়বেন

বানীয়াকান্দি (এব্রাকপুর)
কুমারখালী—নদীয়া।
২।২।২২

বিনীত লেখক—
আজহারুল ইসলাম।

একটী মত ঃ—

. নদীয়ার উদীয়মান সাহিত্যিক ও দার্শনিক, নানাভাষাভিজ্ঞ "নদীয়া মেহেরপুর (মহকুমা) ধর্ম্ম ও শিক্ষা-সমিতি বা আঞ্জমনে এসলামিয়ার" সভাপতি মৌলবী কে, এম, আজহারুল ইসলাম সাহেব প্রণীত "আলোকের পথ" পাঠ ক'রে আমরা বাস্তবিক প্রীতিলাভ ক'রেছি লেখক, গ্রন্থে নানা বিষয়ের আলোচনা ক'রেছেন। ধর্ম্ম, সমাজ, আচার-ব্যবহার, মারফত প্রভৃতি বিষয়ে লেখকের সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয়— বইতে উজ্জ্বল ভাবে রয়েছে বই খানি একাধারে উপন্যাস, সমাজচিত্র, এস্‌লামের বিশেষত্ব, মানব-জীবনের সুখ দুঃখের উজ্জ্বল চিত্র

গ্রন্থ খানিতে লেখকের প্রতিভা ফুটে বের হ'চ্ছে লতিফনের চরিত্র অঙ্কনে তাঁর ক্ষমতার প্রকাশ দেখা যায়। ভাষা আর ভাবের মধুরতায় আমরা মুগ্ধ হয়েছি। মুসলমানী শব্দ উপযুক্তরূপে মিলিত হ'য়ে ভাষার মাধুর্য্য আরও বেড়েছে বইখানি বঙ্গ-সাহিত্যের গৌরব প্রকৃত মুসলমানের হৃদয় খুলে এ গ্রন্থ লেখা। মানুষের মন যে এক মহা শক্তির আধার তা' সুন্দরভাবে অঙ্কিত হ'য়েছে। দুনিয়াটাকে ভাল ক'রে দেখবার ক্ষমতা লেখকের যথেষ্ট আছে। আমাদের বিশ্বাস—এ বই লিখে 'আজ্‌হার মিয়া' অমর হ'য়েছেন

গুণ মুগ্ধ বন্ধু—

খলিলর রহমান—(এম, এ,)

(গবর্ণমেণ্ট কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রফেসর)

মোহম্মদ মোহছেন—(বি, এল,)

(সেক্রেটারী, মেহেরপুর আঞ্জমান ইসলামিয়া)

১ম প্রবাহ

আলোকে।

আলোকের পথে।

পরিচ্ছেদ

(১)

আর কেন ভাই, জীবনটাকে এমন ক'রে বিপথে চালিয়ে দিয়ে ব'সে ব'সে ভাব। ঐ দেখ অসীম আকাশে অসংখ্য তারার খেলা "চন্দ্র সূর্য্য পরস্পর সম্বন্ধ রেখে অনন্ত আকাশ-সাগরে ঘুরছে। তারাও গাছ-গুলাও সেই খোদাকে ছেজদা করছে" * আর তুমি খোদার এ সবকে ছেড়ে দিয়ে নিজের ভাবনাই সার করেছ। একবার স্থির হয়ে দুনিয়ার নানা দিকটা দেখতে থাক, সকল ভাবনার আগুন এর মধ্যে নিভিয়ে দাও। আগুনের গাছে ফুল ফু'টে উঠবে, তোমার ভাবনার গাছে পাখী ব'সে গান ক'রবে

ছালামপুরের মুন্সী বাড়ীর কাচারী ঘরের সম্মুখে কুরসীতে বসিয়া কয়েকজন বন্ধু কথোপকথন করিতেছিলেন রমজান মাস এশার ও মগরবের নামাজ শেষ হইয়া গিয়াছে পনর রোজা আজ শেষ হইল গগনের পূর্ব্বপ্রান্তে সুধাকর তাঁহার রমজান-গৌরবদীপ্ত কলেবর লইয়া ধীরে ধীরে আকাশ-সাগরে সাঁতার খেলিতে উঠিয়াছে। ছোট ছোট তারাগুলি,—তাহাদের রাণী ডুবিয়া যাইবে ভাবিয়া,—এক একবার

---

* ছুরা রহমান—৫ম ও ৬ষ্ঠ আয়েত।—কোরান

চক্ষু মেলিয়া দেখিতেছে আর পানির মধ্যে খেলা করিতেছে। নিকটস্থ পুষ্পোদ্যান হইতে বাতাস আসিয়া যখন আবদুল কাদেরের শুভ্র কিস্তি টুপিটির সহিত আলাপ করিতেছিল, তখন তিনি রফিকল্ আলমকে লক্ষ্য করিয়া এই কথাগুলি বলিতেছিলেন। আবার বলিলেন —দেখ ভাই, আমরা কেবল সুখের মধ্যেই খোদার দয়াকে দেখ্‌তে চাই। আমাদের ইমান বড়ই দুর্ব্বল, তাই, ধন-মান-বল খোদার অনুগ্রহ বলে মনে করি,—তাঁর দয়াকে নিজের ইচ্ছা ও সুবিধা মত করে ল'তে চাই বলে সেটাকে বড়ই ক্ষুদ্র ক'রে ফেলি। কিন্তু তাঁর অনুগ্রহ কোন উচু নীচু কঠোর পথ দিয়ে টেনে ল'য়ে এমন সমান জায়গায় পৌছিয়ে দেয় যা আমরা কখনও ভাবতেও পারি না। ইমানের সঙ্গে দড়ি দিয়ে নিজেকে খুব কষে বাঁধ, শত দুঃখ—শত চিন্তা, বুক পেতে হাসি মুখে সহ্য করতে পারবে—আর জীবন রাতটায় যদি চাঁদের আলো নাই দেখা যায়—আঁধারেই কাটে ভোর হলে ত সূর্য্যের আলো দেখা যাবে

রফিকল আলম একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—তুমি যা বলছ ভাই, তা বুঝি বটে, কিন্তু ঠিক থাকতে প রি না সেই ত আমার দোষ। অনেক সময় ইমানের পথ থেকে এমন করে পিছলিয়ে পড়ি—সব বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি যে, দেখি—এদিকও গেছে, ওদিকও গেছে।

আবদুলকাদের বলিলেন—খোদার ইচ্ছাতে নিজকে মিশিয়ে দাও—দেখবে, সব সময়ই তুমি সুখী

আবদুল কাদেরের বাড়ীর নিম্ন দিয়া যে নদীটী বর্ষাগমে দুকূল প্লাবিত করিয়া বহিতেছিল সেই নদীর উপর,—একটু দূরে,—এমন সময়ে একখানি পান্‌সী নৌকা দাঁড় ফেলিয়া উজানে বহিয়া আসিতেছিল

প্রথম মাঝি অপরকে বলিল—ওরে ভাই ছাহছো, আছমানের গায় ক্যামন ম্যাঘ হইছে। জোহা বাঁধ। ম্যাঘ সহল যেন দ্যাও দত্তির

মত হাওয়ায় উড়তিছে। এহন, তুমি যাহা করবাব, ওরে বাবা! ডাহাত্তির মত মার মার কইরে ঝড় আসতিছে রে বাবা,—আর তোমার মতন ডাহাত নাই বাবা—এহনও নোহো বাঁধলে না? আগে জানলি কোন হালার ব্যাটা তোমার চাহরি ল'ত।

কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গে সে দাঁড় ছাড়িয়া দিয়া নৌকার আরোহী-দিগের নিকট জড়সড় হইয়া সরিয়া বসিল। অপর পশ্চিমে মাঝি ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিল—আরে বেল্লিক এয়ছে ডরনেছে কাম চলেগা ক্যায়ছা?

সে ভয়বিজড়িত কণ্ঠে বলিল—মোরে বিলাই বল, আর যাই বল বাবা—আমার গিন্নি যহন আসর হোনে বল্‌ছিল—"ছাহ, আমার মাথা খাও, ম্যাঘ দেহলি আর নোহা বয়ানা" হেইয়ের কথা হেইনা তোমার কথা থাহুক আমার পীরের কথাও আমি হোনব না।

নৌকারোহী দরবেশ সাহেব বলিলেন -আর একটু এগিয়ে চল, ঐ আবদুল কাদের মিয়াদের বাড়ী দেখা যাচ্ছে, ঐখানে না হয় আজ আমরা রাত্রি কাটাব পরদার ভিতর হইতে নুরন্নেহার বলিল—তাতে আর দোষ কি, তিনি আমাদের আত্মীয়—এ বিপদকালে তাঁর বাড়ীতে আশ্রয় লওয়ায় অন্যায় কি?

পূর্বে মাঝি অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবার দাঁড় ধরিয়া অতিকষ্টে নৌকা আবদুল কাদেরদের ঘাটে বাঁধিল। আবদুল কাদের অতি সযত্নে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে উঠাইয়া লইলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বায়ুর বেগে মেঘ কাটিয়া গিয়া আকাশ নির্মল হইয়া গেল নানারূপ সুখাদ্য দ্বারা অতিথিগণকে তৃপ্তি সহকারে আহার করান হইল। কিন্তু বাড়ীর মধ্যে নুরন্নেহার আহার করিতে স্বীকার করিল না আবদুল কাদেরের মাতা জোবেদা খাতুন অনেক অনুরোধ করিয়াও অনেক

আত্মীয়তার কথা তুলিয়াও নুরনকে আহার করাইতে পারিলেন না। আবদুল কাদের বারান্দায় দীপালোকে দাঁড়াইয়া নুরন্-নেহারকে আহার করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন সে, অনুরোধে আরও সঙ্কুচিত হইয়া গৃহের এক কোণে অন্ধকারে যাইয়া দাঁড়াইল তাঁহারা দূর সম্বন্ধে ভাই ভগিনী হইলেও পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ বেশী হয় নাই। আজ অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আলোকস্থিত আবদুল কাদেরের মুখের দিকে সে চাহিল দেখিল,—তাঁহার মুখখানা পবিত্রতায় উজ্জ্বল, আতিথেয়তায় বিনীত আবার যখন তিনি মাতাকে নুরন্নেহার আহার করিল কি না জিজ্ঞাসা করিলেন, সে তৎক্ষণাৎ হাত ধুইয়া অন্ধকারে রেকাবী টানিয়া লইয়া আহার করিতে বসিল তাহার যেন ইচ্ছা হইল, এত অনুরোধ সত্ত্বেও সে আহার করে নাই একথা আবদুল কাদের না জানিতে পারেন

পরদিন সকালে তাঁহারা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন কিন্তু আবদুল কাদের অতি প্রত্যূষে সহরে লোক পাঠাইয়া তাঁহাদের আহারের ভালরূপ বন্দোবস্ত করিলেন রোজার দিন সুতরাং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তাঁহারা আহার সমাপনান্তর নৌকায় উঠিলেন

পরিচ্ছেদ

(২)

জ্যোৎস্নালোকে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইলে, খোন্দাদারদের আহার শেষ হইয়া গেলে, পরস্পর অনেক সাদর সম্ভাষণের পর তাঁহারা নৌকা ছাড়িল অনুকূল বায়ুতে পালের বেগে নৌকা দুলিতে দুলিতে অগ্রসর হইল পশ্চিমে মাঝি গান ধরিল—

ভাইয়া, দোরাজকে ওয়াস্তে দুনিয়াদারী
এছকো লিয়ে হায় কেয়া ঝকমারী কেয়া ঝকমারী ॥

নুরন্নেসার নৌকার মধ্য হইতে এ গান শুনিতেছিল আর একটা ফাঁক দিয়া দেখিতেছিল—নৌকার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ পানির মধ্য দিয়া ছুটিতেছে আর মৃদুমন্দ পবন হিল্লোলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচীমালার সহিত জড়াইয়া জড়াইয়া লুটোপুটি খাইতেছে।

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে নুরন্নেহারদের ঘাটে নৌকা লাগিল। নুরন্ এই মাইজ গ্রামের শিকদার সাহেবের কন্যা নবাবী আমল থেকে এঁরা ক্ষুদ্র জমিদার শিকদার উপাধিও বাদশাহ দত্ত নুরন্নেহারের বয়স পঞ্চদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হয় নাই আজ নুরন্নেচার শয্যার ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া ভাবিল—খোদা। আমি দুনিয়ায় এসেছি কেন? আমি মেয়ে মানুষ, আমার দ্বারা জগতে কোন কাজই সম্ভব নয় মানুষের খাতেরদারী করাও আমার পক্ষে যেন অসম্ভব এত বয়সেও কোন দিন কোন অতিথিকে ইচ্ছামত সেবা করতে পারি নাই আবদুল কাদের মিঞা পুরুষ, তাই তাঁকে সব দান করেছ, তাকে এমন করে লোকের সেবা করতে ক্ষমতা দিয়েছ। তাঁর চরিত্রে পবিত্রতা দিয়েছ,

হৃদয়ে ভক্তির ঝরণা দিয়েছ তাঁর মুখে ইসলামের আলোক দিয়েছ, কিন্তু আমাকে তার কণামাত্র দিলেও বুঝি আমার জীবন ধন্য হ'ত।

নুরনের মা ডাকিলেন—নুরন্নেহার, মা, দুটো খেয়ে শো'ও গে যাও। নুরনের মা বিমাতা হইলেও তাহাকে প্রাণ দিয়া স্নেহ করিতেন। সপত্নী কন্যাকে গর্ভজাত কন্যার মতই দেখিতেন নুরন বলিল—মা! আমার ক্ষুধা নাই, আমি খেয়ে এসেছি মাতা বলিলেন—তা আবার তোমার ক্ষুধা থাকবে কি করে? পরের বাড়ী বাবা, এমন মেয়ে তুমি,—কেমন করে লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে, খেয়ে দেয়ে এলে নুরন বলিল—মা, তোমার কথা সবই সত্য। যাদের বাড়ী কোনদিন যাওয়া আসা নাই এমন বাড়ী, প্রায় ২টা দিন কাটান ঠিক হয় নাই। কিন্তু মা, তুমি যদি একবার তাদের বাড়ীতে যেতে, আর তাঁর এ রকম মধুর ব্যবহার দেখতে তা হলে আমরা ত একদিন দায়ে ঠেকে ছিলাম তুমি এক মাসেও আসতে পারতে না মাতা বলিলেন—শুনলুম দরবেশ সাব ওঁর কাছে বলছিলেন যে, তিনি আবদুল কাদের মিঞার ব্যবহারে একেবারে কেনা হয়ে গেছেন।

নুরন বলিল,—হেঁ, মা, তাঁরা তাঁর ব্যবহারে কেনা হয়ে গেছেন, আর আমি ত একেবারে বিক্রী হয়ে গেছি এই সোজা কথাটী বিদ্রূপস্থলে বলিতে গিয়াও তাহার মুখের উপর একটা কেমন ভাব খেলা করিয়া গেল। মুখখানি একটু লজ্জাসঙ্কুচিত হইল তাহা সংবরণ করিয়া লইয়া সোজা ভাবে বলিল,—বাস্তবিক মা, তাঁর পবিত্র মুখখান দেখলে আর তাঁর প্রাণভরা আলাপ শুনলে তাঁকে বাস্তবিক ভক্তি করতে ইচ্ছা হয়। মায়ের আদর উপেক্ষা করিতে না পারিয়া নুরন কিছু আহার করিয়া নিদ্রা গেল

পূর্ব্বাকাশ লোহিতরাগরঞ্জিত করিয়া শীঘ্রই সূর্য্য উঠিতে

লাগিল জানালা দিয়া প্রাতঃসমীরণ আসিয়া নুরনের শুভ্র কাপড় খানির সহিত ভালবাসা বিলাইতেছিল বিশেষ জীবনীশক্তি-প্রদায়িনী 'বাদছাবা' বহিয়া লইয়া ফজরের নামাজের সময় অতিবাহিত হইতে চলিল দেখিয়া নুরন তাড়াতাড়ি অজু করিয়া নামাজ সমাপনান্তর দরবেশ সাহেবের নিকট পড়িতে গেল দরবেশ সাহেব এই বাড়ীর শিক্ষক তিনি জামেওল আজহার হইতে অধ্যয়ন করিয়া এ দেশে ফিরিবার পর হইতেই এ বাড়ীতে শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী আছেন। তাঁহার বিশ্বাস জাতীয় শিক্ষার দ্বারা মুসলমানের নৈতিক জীবনকে যেরূপ উন্নত করা যায় সেরূপ অন্য শিক্ষার দ্বারা হয় না। তিনি তাহাই কার্য্যে পরিণত করিতে শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়াছেন নাম সৈয়দ আবদুল মন্নাফ ইনি দূর সম্পর্কে শিকদার সাহেবদের আত্মীয় আপন বলিতে ইঁহারা ছাড়া আর কেহ ছিল না বাড়ীখান ও জমি জমা ভাঙ্গনে নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে শিকদার সাহেব তাঁহাকে পীরের মত ভক্তি করিতেন তাঁহার অকপট খোদাপ্রেম দেখিয়া সকলে তাঁহাকে দরবেশ সাহেব বলিয়া ডাকিত

নুরন আসিয়া দেখিল,—দরবেশ সাহেব তখন তছবী পাঠ করিতে-ছিলেন তাঁহার মুখে থাকিয়া থাকিয়া হাসি ও কান্নার রেখা অঙ্কিত হইতেছে নুরন নিকটে বসিয়া দরবেশ সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া-ছিল তাঁহার তছবী পাঠ শেষ হইলে নুরন বলিল—চাচাজান, আপনি তছবী পড়ার সময় হাসেন, কাঁদেন কেন? দরবেশ সাহেব বলিলেন— মা! ও সব রেখে এখন তুমি নিজের বই পড়। নুরন পড়িতেলাগিল—

চুঁ আহঙ্গ রফতান কোনাদ জানে পাক।
চেরার তখ্‌তে মোরদান চেবার রুয়ে খাক।

জমিলা পড়িল—দো চিজ আদমিরা কাশাদ জোরে জোর।
একে আবদানাহ দেগার খাকে গোর।

আবদুর রহিম বানান করিয়া পড়িতে লাগিল—ডিউক অফ ওয়েলিংটন নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয় করিয়াছিলেন

হঠাৎ বই বন্ধ করিয়া নুরন দরবেশ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা চাচাজান, এই দুনিয়ার কোটী কোটী লোক সেই এক খোদাকে ডাকছে, তিনি একা হয়ে এত লোকের ডাক কি করে শুনতে পান? দরবেশ সাহেব বলিলেন—মা। তারহীন টেলিগ্রাফের একটা বিদ্যুতের বাক্সে—শত শত ক্রোশ দূর থেকে কথা বললেও যেমন শুন্‌তে পাওয়া যায় তেমনি এই সকল বিদ্যুতের সৃষ্টিকর্ত্তা খোদাতালার শক্তি রসঙ্গে জীবের আত্মার এত গাঢ় সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও—"সাহরগ থেকে নিকট থেকে" তিনি আমাদের কথা শুন্‌তে পাবেন না? শুধু মানুষের নয়, প্রত্যেক গাছপালার এমন কি পাথর ও মাটীরও, ডাক তিনি শুন্‌তে পান এই সব জীবনহীন পদার্থের সুখ দুঃখ বোধ করবার শক্তি আছে—এ আবিষ্কার মানুষে করেছেন কিন্তু এর বহু পূর্ব্বে খোদা কোরাণে বলেছেন, "আছমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সকলেই খোদার নিকট প্রার্থনা করে" * বোধশক্তিহীন পদার্থ কখনও প্রার্থনা করতে পারে না ত সুতরাং সব জিনিষেরই বোধশক্তি আছে এই এত পরিশ্রমের বাস্তবিক এত বড় বিস্ময়কর আবিষ্কার চেয়ে অনেক সত্য, প্রকৃতির অনেক তত্ত্ব অনেক জোর দিয়ে কোরাণে বিবৃত হয়েছে, এই কোরাণ শরিফটা ভাল করে বুঝতে চেষ্টা কর মা, তা হলে সব ফয়দা লাগবে

নুরন পড়া দিয় উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল জমিলা পড়িতে লাগিল। জমিলা নুরনের চাচাত ভগ্নি

লতিফন আসিয়া বারান্দায় বসিয়াছিল সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করিল—নুরন, কালরাত্রে তুমি মামার বাড়ী

* ছুরা রহমান—এক আয়েত —কোরান।

থেকে বাড়ী এসেছ, মনে সুখ নাই বোন, তাই এতক্ষণও তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসি নাই কি করব, সবই আমার নছিবের ফের।

প্রতিবেশী স্ত্রী লতিফনের সহিত নুরনের অনেক দিন হইতে সৌহার্দ্য নুরনের কাজ কাম নাই—বড় লোকের কন্যা বলিয়া, আর—লতিফনের কাজ থাকিলেও তাহা শাশুড়ীকে সমাধা করিতে হুকুম করিবার পর তাহারও কোন কাজ না থাকার জন্য দুই জনে বসিয়া উলের কাজ করে, গল্প করে আর বই পড়ে লতিফনের বাড়ী নুরনের বাড়ীর খুব নিকটে, পরদার সঙ্গেই এবাড়ী ওবাড়ী যাতায়াত করা যায় কতকগুলি বই পড়িয়া সে যে একজন বিদুষী, এ গৌরব তাহাকে তন্ময় করিয়া রাখে তাহার গরীব স্বামী তাহার আবদার রক্ষার্থে বটতলার নভেল নাটক অনেকগুলি ক্রয় করিয়া দিয়াছেন তার স্বামী আবদুল করিম এক মাড়োয়ারী বাবুর ইক্ষুমাড়াই-কল তৈয়ারী কারখানার কেরাণী। তাঁহাকে প্রত্যহ ৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আপিসে যাইতে হয়। সন্ধ্যার আগে প্রায়ই গৃহে ফিরিতে পারেন না সম্প্রতি মাড়োয়ারী বাবু বলিয়াছেন—"বাবু, তুমি যদি ঠিক সময় মত আসিতে না পার তবে তোমার মাহিনা কাটা যাবে " মাত্র ২২৲ টাকা বেতন এর থেকে আবার কাটা গেলে উপায় হবে কি, এই ভয়ে আবদুল করিম প্রায়ই অর্দ্ধাহারে বা কোন দিন আহার না করিয়াও আপিসে যান, আর সময়েরও অতিরিক্ত কাজ করিয়া, সন্ধ্যার পর বাড়ী ফেরেন বাড়ী আসিয়া প্রায়ই দেখেন—তাঁহার বিদুষী ভার্য্যা খট্টাঙ্গে শয়নান্তর পুস্তকে চক্ষু বুলাইতেছেন

ইহার গত রাত্রে বাড়ী আসিতে আবদুল করিমের একটু রাত্রি হইয়াছিল তিনি বাড়ী আসিয়া ডাকিলেন—লতিফন! লতিফন

অনেকক্ষণ কোনই উত্তর দিল না অনেক ডাকাডাকির পর বলিল—আমাকে এত বাত্রে বিরক্ত কর কেন? ভাততরকারী তোমার মা রেঁধে রেখেছেন, খাওগে।

আজ আবদুল করিমের মাতা জ্বরে শয্যা লইয়াছিলেন তাই তিনিও উঠিয়া আসিতে পারেন নাই

আবদুল করিম দ্বিরুক্তি না করিয় পানি লইয়া ভাত বাড়িয়া আহারে বসিলেন সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর আজ আহার করিতে করিতে তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রু গড়াইল। লতিফন বিছানার চাদরটাও পাতিয়া দিল না দেখিয়া আবদুল করিম মনের কষ্ট চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া বলিলেন,—লতিফন! এই তোমার বিবেচনা? আমি তোমাদের সুখের জন্যই এই আসা যাওয়ায় ৮ মাইল পথ হেঁটে আর মাড়োয়ারী বাবুর আপিসে ৭।৮ ঘণ্টা খেটে প্রাণটা ওষ্ঠাগত করে বাড়ী এলাম, আর তুমি আমাকে এক গ্লাস পানি দেওয়াও সঙ্গত মনে করলে না? লতিফন বলিল,—স্বামীকে পানি দেওয়া সঙ্গত তা আমি জানি আর বইতেও দেখেছি বটে, কিন্তু তুমি রোজ রোজ এ রকম রাত্রি করে বাড়ী এস, আর আমি রাত জেগে বসে থাকি! কি ক্রীত দাসীই আমি হয়েছি গো! তুমিই বল পড়া শোনা করতে! পড়া শোনা তা হলে ফেলে রেখে তোমার এসব করতে হবে! আমি এত কষ্ট সহ্য করতে পারব না ২৪ ঘণ্টা যে তোমার চাকরী করতে পারে এমন একটা দেখে বিয়ে করে আন।

কথাগুলি আবদুল করিমের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিল। কোনরূপ শাসন-বাক্য প্রয়োগ করিলে চীৎকার করিয়া লোকের নিকট তাঁহাকে লজ্জিত করে এই ভয়ে তিনি কোনরূপ রূঢ় বাক্য ব্যবহার করেন না আজও তিনি নম্র সুরেই বলিলেন—লতিফন, তুমি কি মনে কর, আমি নিজে

ইচ্ছা করে এত রাত্রি করে বাড়ী আসি? তোমাদের খাবার পরবার জন্যই বাধ্য হয়ে চাকরী রক্ষা করতে এ করে থাকি

লতিফন সুর পঞ্চমে চড়াইয়া বলিল, –চাকরী করেন —কর্ত্তা চাকরী করেন,—আচ্ছা, এত দিন চাকরী করে কি করলে বল দেখি?

আবদুল করিম দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,— সত্যই লতিফন, আমি চাকরী করে কি করলুম, এ পোড়া পেটও ভরতে পারলুম না। ২২৲ টাকা মায়না দিয়ে এই কঠিন বাজারে সংসার চালাতে অন্ধকার দেখি। তারপর খাজানা ট্যাক্স বাজে খরচ আমি আর কোথা থেকে কি করি খোদা, আমার মরণ ভাল!

"ওগো", মায়াকান্না কাঁদলে চলবে না —উপরি পাওনা দিয়েও ত আমায় ২ ১ খানা কিছু দিতে পার? আসলে দেবে না, এই হ'লো কথা, যাক আমায় দেবে কেন? না দিলে— মুদীর দেনাটা শোধ করে দাও, সে আমি আনিয়েছি, কাজেই আমার কথা বলতে হয়।" বলিয়া ঘরের মধ্য হইতে দেনার ফর্দ্দটা ছুড়িয়া আবদুল কাদেরের গায়ের উপর ফেলিয়া দিল

আবদুল করিম ফর্দ্দটা কুড়াইয়া লইয়া ভাঁজ খুলিতে খুলিতে বলিলেন,— উপরি পাওনা?—মানে—ঘুষ, সেত হারাম, সে আমাদ্বারা হবে না; হালাল রুজী দিয়ে শাক খাব, ছালা পরব, কিন্তু হারাম দিয়ে পোলাও খাব না, শাল গায় দেব না, তাতে আমার কপালে যা ঘটে ঘটুক অঁ্যা—একি! ৪০৲ টাকা মুদীর দেনা! গত মাসের মায়না পেয়ে তোমার কাছেই ত দিয়েছি লতিফন!—আমি এ দেনা কোথা থেকে দি?

"তা হলে আমি দেই? বল আমি রোজগার করি? চাল ডাল

লাগলো তোমার সংসারে, এখন দেনা দেবে কি বাতাসে?" বলিয়া লতিফন এই রাগিয়' বিছানার উপর উঠিয়া বসিল

আবদুল করিম আর কোন কথা না বলিয়া শয্যা লইলেন বটে কিন্তু দেনার ভয়ে করুণাময়ী নিদ্রাও তাঁহাকে ক্রোড়ে লইতে পারিল না

পরদিন সকালে, নুরনের সঙ্গে লতিফনের যে আলাপ হইতেছিল তাহা আমরা শুনিতেছিলাম নুরন বলিল,—তোমার অশান্তি কিসের বোন্, তোমার অমন নেকবক্ত স্বামী—নিজে ছেঁড়া কাপড় পরে তোমাকে ভাল কাপড় পরতে দেন মিষ্ট কথা ভিন্ন কড়া কথা বল্‌তে, তাকে আমরা কোন দিন শুনি নাই আমার মনে হয় তোমার জন্য তিনি জানটাও দিতে পারেন অমন স্বামী কয়জনের ভাগ্যে যোটে? সেদিন দরবেশ সাহেবের কাছে তিনি বল্‌ছিলেন—"বর্ত্তমান চাকরীতে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত কিন্তু পাছে আমার স্ত্রীর কষ্ট হয় তাই চাকরী ছাড়তে পারছি না" এমন স্বামী যার তার আবার দুনিয়ায় অশান্তি কিসের? লতিফন বলিল,—আচ্ছা, তা মানলাম, কিন্তু মনে ভালবাসা থাকলে বাইরে তা প্রকাশ হয়ে থাকে। বিয়ে করা অবধি কোন একটী জিনিষ আমাকে দিল? ভালবাসা দেখান,—আমাকে চোখে চোখে রেখে! পরদার মধ্যে থাকতে রাত দিন হুকুম, এমন কি তোমাদের বাড়ী আসতেও নিষেধ মেয়ে মানুষ কি খাঁচার পাখী? সব সময় খাঁচার মধ্যে থাকলে যে মানসিক বৃত্তির স্ফূরণ হয় না, এ আর কর্ত্তা বোঝেন না। নির্ম্মল বাতাস শরীরের পক্ষে উপকারী, সংসারের দুই দশটা জিনিষ না দেখলে কি জ্ঞান হয়? আমরা মোসলমানের মেয়ে তাই আমাদের একটি স্বাধীনতা থাকতে নেই? আমরা কি কুয়োর ব্যাঙ্?

নুরন বলিল,—ভুল বুঝেছ লতিফন, তিনি পারেন না বলে, সংসারের জ্বালায় অস্থির হয়েই,—ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তোমার বিলাসিতায় কিছু জোগাতে পারেন না, কিন্তু তিনি যে শুধু তোমাকে চোখে রাখেন না, প্রাণের মধ্যেও রাখেন তা আমি জানি। আর তোমাকে যে পরদায় রাখেন সে তোমারই ভালর জন্য। মুসলমান সমাজের গৌরব করবার জিনিষের মধ্যে পরদা একটী প্রধান। অবাধ মিশ্রণের ফল অনেক সময় যে বিষময় হয় তা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। নির্ম্মল বাতাস কি তোমাদের এত বড় উঠানে যায় না?

কথা বলিতে বলিতে নুরন অজ্ঞাতসারে লতিফনের সহিত খিড়কীর দরজা দিয়া বাড়ীর পিছনে বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছিল এমন সময় একজন ভিক্ষুক ঐ পথ দিয়া তাহাদের বাড়ী আসিতেছে দেখিয়া নুরন বলিল,—লতিফন ঐ দেখ একটা মানুষ আসছে, বাড়ীর ভিতর চল লতিফন বলিল,—কৈ মানুষ, ওত একটা ফকির

"ফকির বুঝি মানুষ নয়?" বলিয়া নুরন লতিফনের হাত ধরিয়া হাসিতে হাসিতে বাড়ীর মধ্যে জোরে টানিয়া লইয়া গেল

এক গ্লাস পানি ও তরিতরকারী দিয়া এক রেকাবী ভাত ভিক্ষুকের জন্য বাহিরে পাঠাইয়া দিয়া নুরন লতিফনকে বলিল— দেখ, স্ত্রীলোকের স্বর অন্য লোকে শুনবে বলে নামাজের সময় চুপে চুপে কোরানের আয়াত পড়ার আদেশ হয়েছে। স্ত্রীলোকের, বিশেষতঃ যুবতীগণের অবাধ গমন, অবাধ মিশ্রণ আমার মতে, হয়ত বলিবে আমার কুটীল চোখে বড় পাপ ও দোষের গৃহের পরদায় থাকিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি করা যে অসম্ভব তা আমার মনে হয় না। একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে, প্রলোভন থেকে দূরে থাকলে প্রলোভন থেকে বাঁচা যায়। অবাধ

মিশ্রণ ও স্ত্রীস্বাধীনতাকে দূর থেকে নমস্কার করি আমাদের এ সুন্দর ব্যবস্থা গঞ্জিকা দেবীর ধ্যানে মগ্নাবস্থায় তৈরী হয় নাই ।

এদিকে ভিক্ষুক পরিতোষ সহকারে আহার করিয়া বলিল,—আল্লাগো, আজ দুদিন পরে জানটা ঠাণ্ডা হোল, আজ দুদিন ধরে দরজায় দরজায় দুটো ভাতের জন্যি হাঁক দেলাম কেউ একটা ভাতের উপর উঠল না আল্লা বেহেস্ত নছিব করুক গো, আল্লা বেহেস্ত নছিব করুক, সোনার সংসার বেড়ে উঠুক, সোনার দোয়াত কলম বজায় থাক কাল দুপুর বেলা ভাতের জ্বালায় জান ফাটে যাতি লাগলে, তাই জহিরদ্দি মিঞার বাড়ী গেলাম। বড় আশা করে গেলাম,—ওদের মোরগা ভরা ধান সুদের টাকার দালান দিছে, ওদের বাড়ী দুটো ভাত পাবই পাব কিন্তু হারে কপাল! বলব কি, ভাত দেওয়া ত দূরের কথা, ব্যাটা এক মুষ্টি চাল্‌ও দিল না খাসি জবাই করিছে, কুটুম আইচে, ঘটা ক'রে খাতিছে জহিরদ্দি বল্‌ল, কি! যেত ব্যাটা কাণা খোড়ার মরণ খাবার সময়! দূরহ ব্যাটা! আরও যে কত বল্‌ল—তা খোদাই জানেন আল্লা নয় আমাদের কাণ খোঁড়া করিছেন, তিনি সব করতে পারেন "তিনি রাজার রাজ্যি কেড়ে নিয়ে ফকির কর্‌তে পারেন, ফকিরকে রাজ্যি দিতে পারেন।" * আজ তার নয় সবই আছে, ধন আছে, দৌলত আছে, কাল আল্লা তাকে আমার মত করতে পারে।

বাড়ীর মধ্য হইতে কথাগুলি শুনিয়া সুরেনের অন্তঃস্থল আলোড়িত হইল

---

* কোরান।

পরিচ্ছেদ

(৩)

সিকদার সাহেব আজ কাচারী ঘরে বসিয়া আগামী এতকাফের জিনিষ পত্রের ফর্দ্দ করিতেছেন এবারকার আয়োজন কি ভাবে করা যাইবে, দরবেশ সাহেবের সহিত যুক্তি করিতেছেন, এমন সময় নুরনের কনিষ্ঠ সহোদর আবদুর রহিম আসিয়া বলিল,—বাপজান, সেদিন মামুসাহেবদের বাড়ী থেকে আসার পথে যে বাড়ীতে একদিন ছিলাম তাঁকে কিন্তু দাওয়াৎ করতে হবে তা বলে রাখছি সেকথা বুবু একবার থামিয়া ঢোক গিলিয়া কহিয়া বলিতে লাগিল—সেদিন তিনি আমাদের কত রকম খাবার দিলেন, কত আদর করলেন।

"আচ্ছা বাবা, তিনি ত আমাদের আত্মীয়, তাঁকে দাওয়াৎ করতে বাধা কি তুমি চিঠি লিখে আন আমি দস্তখত করে দিচ্ছি" বলিয়া সিকদার সাহেব পুত্রের মুখে চুম্বন করিলেন

"আচ্ছা বেশ, আমি লিখে আনছি' বলিয়া নাচিতে নাচিতে চিঠি লিখিবার জন্য আবদুর রহিম নুরনের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। দোয়াত কলম লইয়া বালক-সুলভ বড় বড় অক্ষরে লিখিল—ভাই সাহেব, বুবুর কথামত বাপজানের দিয়া আপনার দাওয়াৎ ——

"কি লিখছিস, দেখি', বলিয়া নুরন কাগজ খানা হাতে করিয়া পড়িয়া কৃত্রিম রাগের সহিত বলিল—সয়তান, এই বুঝি তোর চিঠি লেখা।

নুরনই আবদুর রহিমকে পিতার নিকট উকিল পাঠাইয়া এ দাওয়াতের ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল আবদুর রহিমের এই

অসম্পূর্ণ পত্র দেখিয়া এক কাল্পনিক চিন্তায় সুরেনের মন অস্থির হইয়া পড়িল তার পিতা যদি এই রকম পত্র দেখিতেন, বা তিনি এতটা না দেখিয়াই দস্তখত করিয়া পত্র পাঠাইয়া দিতেন আর এরকম পত্র আবদুল কাদেরের হাতে গিয়া উপস্থিত হইত তবে কি হইত—সংসারে মুখ দেখাইবার বুঝি স্থান থাকিত না, ইত্যাদি ভাবিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পর বলিল—লেখ, সয়তান, আমি বলে দি অনেক আত্মীয়তার কথা পাড়িয়া অনেক অনুরোধ মাথাইয়া পত্র লিখিত হইল ও পিতার দস্তখত দিয়া পত্র প্রেরিত হইল

সিকদার বাড়ী ৮ গম্বুজ-ধারী পাকা মস্‌জিদ মস্‌জিদের নিম্ন দিয়া ধীরগামী নদী বহিয়া যাইতেছে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সৈয়দ আবদুল-হোসেন সিকদার একজন ক্ষুদ্র জমিদার ধর্ম্মকার্য্যে তাঁহার হস্ত সর্ব্বদাই প্রসারিত ও মুক্ত রমজান মাসে প্রত্যহ তিনি গ্রামস্থ ইতর ভদ্রকে সন্ধ্যার সময় ডাকিয়া নানারূপ সুখাদ্য দ্বারা এফ্‌তার করাইয়া থাকেন, আর প্রত্যেক বৎসরই ২৭শে রমজান তারিখে তাঁহার বাড়ীতে মহা সমারোহ হয় সে দিন নানা প্রকার আহার্য্য দ্বারা সমাগত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে পরিতোষ সহকারে আহার করাইয়া থাকেন সেদিন মস্‌জিদে কোরাণ শরিফ পাঠ, মৌলুদ পাঠ, জেকের দরূদ পাঠ প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠান অতি ভক্তি সহকারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এবারও সে ব্যবস্থার কোনই ত্রুটি হয় নাই আজ অনেক রোজাদার উপাসক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন সূর্য্য সান্ধ্যগগনে রক্ত-কিরণ ছড়াইতে ছড়াইতে ডুবিতেছে। সে কিরণ মস্‌জিদের পিত্তল-নির্ম্মিত চূড়ার উপর পড়িয়া ফাটিয়া শত খণ্ড হইয়া উপাসকদিগের চক্ষু ঝলসিত করিয়া দিতেছে রোজাদারগণ ওজু করিতে করিতে কেহ নাকে পানি প্রক্ষেপ করিতেছেন, কেহ কুলি করিতেছেন,

কেহ বা কুলিকরিবার জন্য মুখে পানি লইয়া উপরের দিকে মুখ তুলিয়া গলার মধ্যে গড় গড় করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন, কেহ ছের ছোছেহ করিতেছেন, কেহ বা ওজু সারিয়া রুমালে হাত মুখ মুছিতেছেন বালকেরা এফতারের জন্য প্রস্তুত খাদ্যের ভাগ লইবার আশায় উঁকি ঝুঁকি করিতেছে নিকটে থাকিলে দয়া-পরবশ পিতা কিছু না কিছু হাতে তুলিয়া দিতেও পারে—এই বিরাট আশা লইয়া পিতার নিকটে নিকটে অনেক গুণধর পুত্র ঘুরিতেছে। বাড়ীর মধ্যে স্ত্রীলোকেরা অনেকে কোলের ছেলেকে রাখিয়া ওজু করিতে বসিয়াছেন অন্য পুত্র বাহাদুর নিজের দুঃখ হা করিয়া সান্ধ্য-গগনে সান্ধ্য বাতাসে জানাইতেছে খাদ্যের জন্য পুত্র কাঁদিতেছে দেখিয়া এই সমারোহ-উপলক্ষে-আনীতা কোন যুবতী লজ্জাবনতমুখে, তাঁহার এই লজ্জাদাতা অবুঝ বেহায়া পুত্রের পিঠের উপর বেশ পছন্দ-সই থাবার প্রদান করিতেছেন "এমন ছেলে লয়েও কি লোকে আত্মীয় বাড়ীতে আসে! হাজার খেলেও ছেলেদের পেট ভরে না! সমস্ত দিন রোজা থেকে সন্ধ্যার সময় একটু পানি মুখে দেওয়া দেখতেও এ ছেলেরা নারাজ! এমন রাক্ষসও পেটে ধরতে আছে? এদের পেট পশুর চেয়ে বড় বোধ হয় এ দুনিয়ার মাটি পানি আর গাছপালা এদের পেটের মধ্যে দিলেও পেট খালি থাকে", ইত্যাদি ইত্যাদি দার্শনিকতত্ত্ব উদর-তত্ত্ব ধাতুবিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্য, পশু-তত্ত্ব ভূতত্ত্ব প্রভৃতি নানা তত্ত্বের সহিত বালকতত্ত্ব ও তত্ত্ব উদর-তত্ত্বের সামঞ্জস্য আবিষ্কার করিয়া নাস্তজে বসিয়া পড়িলেন। এমন সময় আবদুল কাদের নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে সিকদার সাহেবের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আবদুর রহিম আসিয়া নুরনকে আবদুল কাদেরের আগমন সংবাদ দিল। নুরনের হৃদয়ের মধ্যে একটা ছোট ঢেউ আসিয়া থামিয়া থামিয়া

স্পর্শ দিতে লাগিল, সে ঢেউ মুখে আসিয়াও প্রতিঘাত করিতে লাগিল। লতিফন নিকটে বসিয়াছিল, সে সুরনের মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া মুচকিয়া হাসিয়া বলিল,—কিলো, একটা লোক আসার সংবাদে একেবারে অবাক হলি যে।—কথাটা সহজ করিয়া লতিফনকে বলিতে সুরনের মনের সঙ্গে আর মুখের সঙ্গে একটু যুদ্ধ করিতে হইল বটে কিন্তু জয়ী হইয়া বলিল,—বেশ তিনি এসেছেন, সুখী হলাম আবদুর রহিম! তুই তাঁকে খুব আদর করিস, তিনি বড় ভাল লোক, লতিফন!

আবদুর রহিম হাতে তালি দিতে দিতে বাহিরে আবদুল কাদেরের নিকট যাইয়া বলিল,—দেখুন ভাই সাব, বুবু আপনাকে খুব আদর করতে বল্লেন বলুন ত কেমন করে আদর করি তা শিখিয়ে দিন না তিনি আবদুর রহিমকে কোলে তুলিয়া লইয়া লজ্জাজড়িত হাসিমুখে কহিলেন,—বেশ আদর হয়েছে ভাই, সেজন্য তোমার ভাবনা নাই তোমরা সব ভাল আছ ত?

"হাঁ, আমরা খুব ভাল আছি। আচ্ছা, বুবুজান আপনাকে চিঠি লেখবার জন্য জেদ ধরলেন, সেইজন্য আমি যে পত্র বাপের সই দিয়ে পাঠিয়েছিলাম, তা পেয়েছেন?"

আবদুর রহিমের এই কথাগুলির মধ্যদিয়া একটা যেন কি ভাবের পরিচয় আপনি স্বচ্ছ হইয়া আবদুল কাদেরের মনের মধ্যে প্রকাশিত হইল তাঁহার মনটাও যেন অজ্ঞাতসারে এই নির্ব্বাক নিবেদনে সাড়া দিল মানুষ, চাওয় লয়েই তোমার জন্ম তুমি চাও ভূমিষ্ঠ হয়েই কিছু চাও, যৌবনে কিছু চাও, বৃদ্ধকালে কিছু চাও, এই চাওয়া চাওয়ির মধ্যেই সুখ দুঃখের দেখা পাও কিছু যদি না চাইতে কোন গোলমালই ছিল না। এই কিছু চাই—এই ব্যাপারটা এমনই অস্থি-মজ্জাগত করিয়া খোদা পাঠাইয়াছেন যে, একাল পরকাল কেবল

চাওয়ার বাজারেই ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। এ চাওয়ার জন্য সুরনকে আর আবদুল কাদেরকে যে দোষ দেয় দিক কিন্তু আমাদের বিবেক তাদের দোষ দেয় না। খাদ্য, অর্থ, যশ, মান, সৎনারী, বল, সৌন্দর্য্য এসকল ত লোকে চায়ই। তারপর মানুষ চায় অত বড় খোদাকে। তবে এই চাওয়ার বলে অসম্ভবকে করতলগত করে। এই চাওয়ার বলে অত বড় খোদাকে এতটুকু হৃদয়ের মধ্যস্থলে দেখা পায়।

আহার ও পরিবেশন হইয়া গেলে সুরন আজ লতিফনকে বলিল,—দেখ, তোমাকে শেষ রাত্রের আহারের জন্য আমাকে অনেক জিনিষ পত্র তৈয়ারী করতে হবে, তা তুমি যদি একটু আমায় সাহায্য করতে? লতিফন সমাগত স্ত্রীলোকগণের মধ্যে গর্ব্বিত স্বরে বলিল—ওসব আমি জানিও না, শিখিও নাই, আর ভালও লাগে না সুরন, আর আমার শাশুড়ী ওসব রাঁধা বাড়া করতে বলতেও সাহস পায় না। আমার কেরাণী বাবু যখন বাড়ী আসেন, তিনিই সব খাবার টাবার ঠিক করে রাখেন আর বলেন—সোনার মুখটী আমার খাটতে খাটতে আর এত পথ হাঁটতে হাঁটতে কালি হয়ে গেছে। তাঁর কাছে আমার কেরাণী বাবু যেন ননীর পুতুল! ৭৮ মাইল পথ হাঁটতে আর ঠাণ্ডায় বসে দুই এক কলম লিখতে যেন একেবারে গলে যান!

স্বামীর প্রতি এত স্নেহ দেখিয়া কোন যুবতী মুচকিয়া হাসিল, কেহবা লতিফনের সহিত সমবেদনা জানাইল। কাহারও বা কথাগুলি অসহ্য বোধ হওয়ায় স্থান পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া গেল।

লতিফন বলিতে লাগিল,—সুরন ত সব সময়েই বলে, আমার উপর তার খুব টান। টানের নমুনাটা এই রকম যে ছোট একখান বইতে পড়েছি কোন সহিস তার ঘোড়াকে না খেতে দিয়ে কেবল ব্রুশ আর কাকই দিয়ে পরিষ্কার ক'রত। কিছু দিন পরেই ঘোড়া পঞ্চত্ব পেলেন।

আমার কর্ত্তাও তেমনি এদিকে শুনুন কেরাণী বাবু চাকরী করেন —এপর্য্যন্ত কোন একটা জিনিষ মনের মত দেখলাম না,—যে তিনি টাকের জোরে কিনে দিলেন

লতিফনের গাত্রে গহনার প্রাচুর্য্য ছিল না কেন এ কৈফিয়ত স্বামীকে আসামী করিয়া বর্ণনা করিল

আবার বলিতে লাগিল,—যখন যা চা'ব তা যদি নাই পেলাম তবে সে স্বামী কিসের? সুখের জন্যই স্বামী সে যদি আমার সুখের দিকেই না চাইল তবে স্বামী কিসের?

লতিফন, তুমি বড়ই নির্ব্বোধ তিনি কোথা থেকে দিবেন তা তুমি একটু চিন্তা কর না তিনি যা মাহনা পান, এ বাজারে তা দিয়ে সংসার চলে না তোমার ফরমাইস তিনি কোথা থেকে সরবরাহ করবেন? যাক বোন, আশা করি তুমি আমার একটা অনুরোধ মানবে"— বলিয়া নুরন লতিফনের হাতের মধ্যে একটা সোণার বালা ও ৪০৲টা টাকা গুঁজিয়া দিয়া আবার বলিল,—আশা করি, তুমি আমায় ভালবাস বলে ভালবাসার উপঢৌকন স্বরূপ এ গ্রহণ করবে আর আমার অনুরোধ, এ সকল সামান্য জিনিষের জন্য তোমার বাড়ীতে অশান্তির সৃষ্টি করবে না শান্তিপূর্ণ সংসার—আর স্বামীর প্রাণভরা ভালবাসার কাছে কোটী কোটী টাকা, স্বর্ণালঙ্কার, এমন কি দুনিয়ার রাজত্বও কিছুই নয়

IMPERIAL LIBRARY

পরিচ্ছেদ

(৪)

পূর্ব্বে জহিরদ্দিন মিঞার কথা আমরা ফকিরের মুখে শুনিয়াছি জহিরদ্দিন-পুত্র রাহাজানের বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়াছে আমাদের পরিচিত জমিলার সহিত তাহার বিবাহ একদিন সকালে জহিরদ্দি স্ত্রীকে বলিল,—দেখ, এসময় বিয়েটা স্থগিত রেখে দিনটা পিছিয়ে না দিলে আমি পেরে উঠছি ন তাই মনে করেছি—আজই সিকদার বাড়ী লোক পাঠিয়ে দিন পিছিয়ে দেই স্ত্রী বিস্মিত স্বরে বলিলেন,—সেকি ? তা হতেই পারে না—ঐ দিনেই বিয়ে হোক।

জহিরদ্দিন গম্ভীর ভাবে বলিল,—দেখ, তুমি বোঝ না, এই কয়টা মাস সবুর কর, ফাল্গুন মাসটা আসতে দাও খাতকরা গুড় বিক্রী করলেই টাকা আসবে এখন সেই সময়ই বিয়ের দিন করা যাবে।

স্ত্রী বলিলেন,—তা হইতে পারে না—তোমাকে সুদের টাকা দিয়ে এবার বিয়ে দিতে দেব না আমার বাপ, ভাই আত্মীয় স্বজন, কেহই তোমার বাড়ী পাত পাড়েন না, তার একমাত্র কারণ—তুমি সুদ খাও আমি ত সোনায় ডুবে গেলাম তুমি যদি হালাল টাকা এ বিয়েতে খরচ করতে পার তা হলে বোধ হয় তাঁরা আসতে পারেন জহিরদ্দিন বলিল—থা, তোর ও সব মৌলবীগিরি রেখে দে। সুদের টাকা দিয়ে বিয়ে দেব না ত বিয়ে দেব কি চুরি করে ? তোর ভাই বাপ না এল ত আমার বাড়ীর বিয়ে পড়ে থাকবে—লোকের অভাব হবে। স্ত্রী বলিলেন,—না তোমাকে চুরি করতে হবে না, হালাল অর্থের দ্বারা যাতে রাহজানের বিয়ে হয় তার ব্যবস্থা আমি করব না হয় গরিবি অবস্থায়ই রাহজানের বিয়ে হবে।

"তোমার কাণ্ডজ্ঞান থাকলে কি আর ও কথা বলতে? আমি বুঝি নেহাৎ ও পাড়ার হাবু ফারাজীর মত পান সরবৎ ক'রে ছেলের বিয়ে দেব? তা হলে মানুষের কাছে মুখ দেখাব কি করে?"

স্ত্রী বলিল—মুখ না দেখিয়ে না হয় পিঠ দেখাইও এখন তুমি মানুষের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা বোধ করছ আর হাসরের মাঠে খোদাতালার কাছে মুখ দেখাবে কি করে? তোমার গুণের কথা বলব কত? তুমি একটা পশু! সেদিন তুমি নছিম সেখের বিধবা স্ত্রীর ভিটা বাড়িটা দেনায় নালিশ করে কিনে নিলে অনাথিনী ২ বৎসরের শিশু ছেলেটী কোলে করে পথে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে তার স্বামীর যা দেনা ছিল তা সে মরার পূর্ব্বেই তার সম্বল দুটো গরু বেচে সুদে আসলে শোধ দিল একটা টাকা সুদের মাপ চেয়েছিল তুমি অনেক না, না, করার পর বলেছিলে—আচ্ছা, না হয় না দিস। তবে এখন তার বাড়ী ঘর বিক্রী হ'ল কি করে?

জহিরদ্দিন বিদ্রূপের সহিত হাসিয়া বলিল,—হাঁ, সে দেনা শোধ করেছিল বটে, কিন্তু ও টাকাটা তখন নয় বলেছিলাম—না দিস, তাই বলে কি সত্যি মাপ করেছিলাম আর টাকাটা হজম হয়ে যাবে মনে কর? সে টাকাটা, আর এক তারিখে ৪ কাঠা ধান কর্জ্জ লয়েছিল—সে দেনা, আর দুই তারিখে ৩টা কাঁটাল বাকী লয়েছিল— এ সব দেনা ত কম নয়, এর সুদ তার সুদ এসব হিসাব করে নালিশ দেলাম রাহাতালিও বললে—ও বাড়ীটা বাড়ীর কাছে, ওটা আমাদের কলে ভাল হয়—এসব চিন্তা করে বাড়ীটা নিলামে কিনে নিলুম। আমার যা প্রাপ্য তা তোমার কথামত ছেড়ে দিলে আমাকে ভিক্ষে করে খেতে হয়।

রাগে এ কাঁধের গামছা একবার ও কাঁধে ও কাঁধ হইতে একবার এ কাঁধে ফেলিতে ফেলিতে খুরবিহীন এক জোড়া পুরাণ খড়ম পায়ে

ঠকাস ঠকাস করিতে করিতে জহিরদ্দিন কাছারী ঘরে আসিয়া পায়ের উপর পা তুলিয়া দিয়া বসিয়া মুহুরীকে বলিল, দেখ, বাড়ীর মধ্যে জেদ ধরেছে, বিয়ে এই তারিখেই দিতে হবে এখন সব বন্দোবস্ত কর। আর এক কথা, এ বিয়েতে এমন কিছু করা চাই, যাতে লোকে জানে বিয়ের মত একটা বিয়ে হচ্ছে! বিবেচনা করে পরামর্শ দাও একজন বলিল,—তার আর পরামর্শ কি? এমন একটা চোগ গোহরত দেন, যে মিঞা সাহেবের বাড়ী ফকির মিছকিন খাওয়ান হবে তা হলে দেখবেন এই দুর্ভিক্ষের দিনে গরীব দুঃখী পেটভরে খেয়ে আশীর্ব্বাদও করবে—নামও হবে

এ কথায় কর্ত্তার মুখ প্রসন্ন হইল না দেখিয়া এক খাতক কর্ত্তার মনোতুষ্টির জন্য এবং চক্রবৃদ্ধির সুদটা মাপ হইতে পারে আশায় বলিল—কর্ত্তা, ও সব বাজে খরচ না করে যদি বাড়ীর উপরে রাত্রি দিন নহবৎ বাজতে থাকে আর আতসবাজী ব্যাণ্ড ইত্যাদি আমোদ রাত্রি দিন চলতে থাকে তবে লোকে বলবে—হুঁ, মিঞা সাহেবের ছেলের বিয়ে হচ্ছে।

জহিরদ্দিন বলিল,—ঠিক বলেছ; একবার কয়টা ফকির খাওয়ায়ে দেখেছি ওদের কিছুতেই পেট ভরে না ভেবে দেখেছি, ওদের খাওয়ান আর ছাইতে ঘি ঢালা; কেবল নেহাৎ একটা বাজে খরচ, কোন নাম নাই, কেবল বেটাদের খাওয়াও আর বলে—পেলাম না।

জামাল মুহুরি নিকটে বসিয়াছিল, সে বলিল,—কর্ত্তা, তা নয়, ভিক্ষুকরা খেতে পেয়ে কখনই বলে না—পেলাম না অনেক বড় খানায় দেখেছি, যত ভাল জিনিষ সব বড় লোক আর কুটুমদের পাতে,—শেষ কালে যদি কিছু বাঁচে তবে ভিক্ষুকদের আর গরীবদের ভাগ্যে জোটে—নয় ত নয় ওরা কি, না খেয়ে বলবে খুব খেয়েছি?

জহিরদ্দিন সে কথায় কর্ণপাত করা দরকার বোধ করিল না

জহিরদ্দিনের একটী ভাল গুণ এই যে, তাহার নিকট হইতে কেহ টাকা কর্জ্জ লইলে তাহা চায় না। খাতক যখন সুদে সুদে ক্রমে আকর্ণ ডুবিয়া যায় তখন তাহার নামে নালিশ করিয়া সমস্ত জমা জমি নিলামে ক্রয় করিয়া লয় এইরূপে তাহার জমি প্রায় মাঠেই দেখা যাইত। দেশে তাহার টাক ধারিত না এমন লোক খুব বিরলই ছিল। জামাল মুছল্লিও খাতক খাতক হইয়া কর্ত্তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি এ কর্ত্তার অসহ্য হওয়ায় সে বাড়ীর মধ্যে উঠিয়া গেল

"কর্ত্তা, বাড়ীর মধ্যে আছেন? কর্ত্তা, বাড়ীর মধ্যে আছেন?" বলিয়া ছলিম সেখ দরজায় আসিয়া হাঁক দিল

"হাঁ, আছি, বাড়ীর মধ্যে যেতে না যেতেই বেটাদের পিছন থেকে ডাক। টাকা বুঝি খুলে রেখেছি—বেটারা টাকা টাকা করে আমায় খেয়ে ফেল্লে" আরও আনুসঙ্গিক কতকগুলি অসংযত ভাষা প্রয়োগ করিতে করিতে ৩০ ইঞ্চি বহরের একখানা ময়লা ছিন্ন কাপড় পরিয়া খড়ম পায়ে খটাস খটাস করিতে করিতে বিরক্ত মুখে আবার বাহির হইয়া আসিল

ছলিম হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—কর্ত্তা, আমি টাকার জন্য আসি নাই কর্ত্তা আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে—বলব কি? আপনার রাহজান, আমার বিধবা মেয়েকে কয়েকজন লোক সঙ্গে করে আজ হঠাৎ আমার বাড়ী থেকে চুরি করে লয়ে গেছে। কাল আমার মেয়ের নিকার দিন—খোদা, আমি করব কি। আমার জাত মান সব গেল।

জহিরদ্দিন রক্তবর্ণ চক্ষুতে ছলিমের প্রতি চাহিয়া বলিল,—ব্যাটার ত ভারি মান জাত, এমন কি হয়েছে? যাক, রাহজান বাড়ী আসুক তারপর—

ছলিম কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—এই আপনার বিচার, আমার মান ইজ্জত নাই? আমি গরীব বলে আমার মান ইজ্জত নাই? এ কথার বিচার সেই খোদা করবেন—যিনি আপনাকে লক্ষপতি করেছেন, আর আমাকে কড়ার ভিখারী করেছেন কিন্তু জানবেন, খোদার কাছে সকলের মান ইজ্জতই সমান। আপনার পায়ে পড়ি, আমার জাত মান বাঁচান।

"তা ত বটে, কথাটা যা বলছ তা নেহাৎ মিথ্যে নয়—আসুক রাহজান, আমি বা কি করব" বলিয়া জহিরদ্দিন মিঞা বাড়ীর মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিল

ছলিম হতাশ হইয়া থানায় খবর দিল। তাহার বিশ্বাস থানায় কনেষ্টবল, চৌকীদার, হেড কনেষ্টবল, দফাদার দারোগা এতগুলি লোক আছে, এরা অবশ্যই রাহজানকে ধরিতে পারিবে

পরিচ্ছেদ

(৫)

এদিকে রাহজান ছলিমের বিধবা কন্যাকে লইয়া নছিমের স্ত্রীর পরিত্যক্ত বাড়ীতে রাখিয়া তাহার সঙ্গীদের দ্বারা পাহারা দিতে লাগিল এবং নিজে ২১ বার আসিয়া 'প্রেম' জানাইয়া যাইতে লাগিল বড় একখানা ছুরিকা হস্তে রাহজানের এক সঙ্গী দ্বারে বসিয়া নিঃসহায় যুবতীকে ভীত প্রদর্শন করিতে লাগিল। থানায় খবর গিয়াছে শুনিয়া রাহজান একটু বিব্রত হইয়া পড়িল। তাহার সঙ্গী ফয়জদ্দী বলিল,—চিন্তা করছ কিহে ভাই। সে দিন ডাকাতির মকদ্দমায় পড়লাম—ধরাও পড়লাম—থানার পুলিশ কি দ'ড় দিল ওরা ত টাকার গোলাম ওদের মধ্যে অনেকে আমাদের চেয়ে বড় ডাকাত। ২।৪ টাকা ঘুষ করে দিতে পারলেই ফরশা।—বুঝলে কি না, এ কেসে না হয়, বুঝলে—কিছু মোটা টাকা লাগবে এই ত? আর দেখ কয়টা সাক্ষী ঠিক কর—তারা সাক্ষী দেবে আমরা যেন কাল বাড়ীই ছিলাম না বুঝতে পাল্লে? আর মিঞা সাহেবের কাছে এখন একবার যাওয়া দরকার

একজনকে পাহারায় রাখিয়া তাহারা আবদুল সামাদ মিঞার নিকট গিয়া আদাব ঠুকিল মির সাহেব এই গ্রামের একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক

মির সাহেব অবজ্ঞা মিশ্রিত স্বরে বলিলেন,—সব শুনেছি, তোমরা অত ব্যস্ত হয়েছ কেন বাপুসকল! কিছু মোটা টাকার জোগাড় কর আর আমি যা শিখিয়ে দেই এমন ভাবে কয়টী সাক্ষী ঠিক কর এখন

যে সঙ্গীকে উহারা পাহারায় রাখিয়া আসিল, সে ছলিমের কন্যার নিকট সরিয়া গিয়া কহিল,—দেখ প্রেয়সি, আজ তোমার কিসের অভাব? রাহজানের অতুল সম্পত্তি সে যে তোমাকে এনেছে এই তোমার

সৌভাগ্য মনে করতে হবে আমরা ত তোমার গোলাম হয়েই থাকব।
ছলিম-কন্যা মাটিতে শুইয়া কাঁদিতেছিল সে উঠিয়া বসিল তাহার চক্ষু দিয়া যেন কত বেদনার কথা আগুনের আকারে ঠিকরিয়া বাহির হইতে লাগিল সে বলিল,– দেখ সয়তানগণ! একজন খোদা আছেন এ গরীব নিঃসহায়ের সতীত্বে যদি তোরা কলঙ্ক দিস্ শত লক্ষ, শত গজবে তোরা পুড়ে ছারখার হবি পরকালে দোজখের আগুন তোদিগকে পুড়িয়ে কয়লা করবে তোদের পায়ে পড়ি, তোরা আমায় ছেড়ে দে দেখ খোদাতালা কেয়ামতের দিন তিল তিল করে এর বিচার করবেন; আমি সেদিন তোদের বিচার নেব তোর বাহজানের লক্ষ টাকা আমার কাছে শূকরের মাংস, তার দালান আমার কাছে দোজখ। আমি গরীবের মেয়ে হলেও জানিস্ আমার সতীত্ব তোদের কোটি কোটি টাকার চেয়ে এমন কি দুনিয়ার কোটী রাজ্য চেয়ে বড়! যে স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাই, সে কোটীপতি সম্রাট কন্যা হইলেও সে মুচিনী অপেক্ষা সহস্রগুণে অধম সয়তানগণ, এখনও বলছি, আমাকে ছেড়ে দে; নয় আমার মনের আগুনে পুড়ে ছাই হবি, একমাসের মধ্যে চোখ খাইবি

অনেক সময় দেখা যায়, নিতান্ত পাষণ্ড নারকীর মনেও সৎবুদ্ধির ক্ষণ বিকাশ হয় ছলিম-কন্যার এ কথাগুলি, তাহার হৃদয়ে ক্ষণেকের জন্য পরকালের একটা ভীষণ ছবি আঁকিয়া দিল সে সহসা ছলিম-কন্যাকে ছাড়িয়া দিল ছলিম কন্যা কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী গেল।

৭ ৮ ঘণ্টা পর দারোগা বাবু চৌকিদার ও দুইজন কনষ্টেবল সঙ্গে করিয়া ছলিমের বাড়ী উপস্থিত হইল ছলিমের বাড়ী মাত্র দুইখানা ছোট ঘর একখানি বাসের জন্য অপর খানি অর্দ্ধেকের মধ্যে রান্না হয় আর অর্দ্ধেকের মধ্যে একটা গরু থাকে ছলিম একটা ছিন্ন মাদুর আনিয়া বারান্দায়

পাতিয়া দিয়া দারোগা-পুঙ্গবকে বসিতে দিল দারোগা উপবেশনান্তর কহিল—শালা ছলিম, তোর মেয়ে কোথায় ?

"বাবু, সে বাড়ীতেই আছে "

তবেরে শালা, মিথ্যা মোকদ্দমা খাড়া করে হয়রান করছিস, কনষ্টেবল, বাঁধো শালাকে। মেয়েকে বাড়ী রেখে মোকদ্দমা সাজিয়েছে! চৌকিদার, শালাকে দুঘা কষে দেত, এখনই সত্যি কথা বলবে।

ছলিম আসন্ন বিপদে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। তাহার কন্যার নেকাহ দিবার জন্য যে পাঁচ টাকা—মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকিয়া জমা করিয়াছিল—আনিয়া দারোগা বাহাদুরের হাতে দিল দারোগা বাবু মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা করিয়া বলিল—ব্যাটা, একি পাঁচ টাকার কাজ! আর কিছু জোগাড় কর, নয় তোকে এখনই চালান দেব ছলিম কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—কর্ত্তা বাবু, আমার ঘরে আর একটা পয়সাও নাই আমি এখন কি করব; কোথায় টাকা পাব ? আজ ছলিম, দারোগার কাছে যেন পুরাতন চোর! দারোগা আবার গর্জ্জন করিয়া বলিল—বেটা তোর মেয়ে তোর বাড়ীতে থাকতে, মিথ্যা এজাহার দিস। আর তুই ডাকাতি করিস।

ছলিম বলিল—না বাবু, তা নয়, ওরা মেয়েকে লয়ে—

"চোপরাও ব্যাটা তোমার সব শয়তানি বুঝতে পেরেছি আর কোন কথা বলতে পারবি না " বলিয়া দারোগা তাহাকে জোরে টান দিল

"বাবু আমার কথাটা শুনুন।"

"ফের শালা—কথা বলিস্ "

ছলিম ও দারোগার মধ্যে যখন এইরূপ মিষ্ট বাক্যালাপ চলিতেছিল, আর বড় দারোগা বাহাদুর বড় লাট বাহাদুরের মত প্রতাপে মেদিনী বিকম্পিত করিতেছিল, ছলিম, কনেষ্টবলের সম্মুখে থর থর করিয়া

কাঁপিতেছিল, এমন সময় আমাদের পূর্ব্বকথিত আবদুল ছামাদ মিঞা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মীর সাহেবকে দেখিয়া, দারোগা হাসিমুখে কহিল,—আসুন মিঞা সাহেব, আপনি না হলে মোকদ্দমার গতিই ঠিক হয় না! চাষা বেটারা কিছু বোঝে না মকদ্দমা টকদ্দমা আপনি বেশ বুঝেন, হা, হা, হা!

মীর সাহেব আসিয়াই দারোগা বাবুকে একটু দূরে ডাকিয়া মুখ কাণের নিকট লইয়া বলিলেন,—দেখুন, দারোগা বাবু, ছলিম বেটা যে মকদ্দমা সাজিয়েছে ও সব মিথ্যে ও বেটা রাহজানদের কিছু টাকা ধারত, রাহজানরা সে টাকা আদায় করে লয়েছে বলে রাগ করে, এই মকদ্দমা সাজিয়েছে। আর দেখুন রাহজান আপনাকে তিন শত—।

দারোগা উৎফুল্ল মুখে বলিল,—সেজন্য কিছুই না মীর সাব, আপনি যখন এর মধ্যে আছেন তখন সেজন্য কিছুই না তবে দেখবেন, আর কিছু যদি উঠতে পারেন. মকদ্দমাটি যে সত্য তা কিন্তু আমি বুঝেছি।

মীর সাহেব বলিলেন, তা দেখা যাবে,—তবে ছলিম ব্যাটার কি?

"সেজন্য ব্যস্ত কি? সে ব্যবস্থা আমি করছি"—বলিয়া দারোগা মীর সাহেবকে সঙ্গে করিয়া আবার ছলিমের উঠানে মাদুরের উপর বসিল

পরস্পর খানিকটা ফিস ফিস করিবার পর দারোগা আরক্তলোচনে গর্জ্জন করিয়া কহিল,—আথ, ছলিম শালা, তুই যে মিথ্যা মকদ্দমা সৃষ্টি করে বিনা কারণে এক ভদ্র লোকের ছেলেকে--হায়রান করতে চেষ্টা করেছিস, আর ডাকাত বলিস, তার সাজা তোকে পেতে হবে; চৌকিদার, বাধ ব্যাটাকে—

চৌকিদার কনেষ্টবল ছলিমকে পিঠমোড়া করিয়া বাধিয়া লইয়া

চাপল দারোগা, আসামী বা ছলিমের কন্যাকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করিল না।

ছলিমের পরিবারবর্গ ভূলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহাদের ছিন্ন হৃদয়ের হাহা রব, পৃথিবী কাঁপাইয়া আকাশে উঠিতে লাগিল। তাহাদের অশ্রু-ধারায় বুঝি মেদিনী ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। তাহাদের হৃদয়ের তপ্ত শ্বাস নিখিল বিশ্বের লতায় লতায় পাতায় পাতায় আকাশে আকাশে আগুন ধরাইয়া দিল ছলিম পশ্চাতে এক একবার দৃষ্টি ফেলিয়া তাহার পরিবারবর্গের লুণ্ঠিত দেহগুলি দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল হায়রে দুনিয়া!

গভীর অন্ধকার রাত্রি ছলিম আজ হাজতে পৌষ মাসের ভীষণ শীতে বসুন্ধরা বক্ষ সিক্ত বৃক্ষগুলি মায়ের কোলে মুখ ঢাকিয়া চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে বিব্রত চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধকারের রাজত্ব ট্রেজারীর পাহারাওয়ালা নাগরা জুতা পায়ে দিয়া ঠকাস ঠকাস করিয়া পায়চারী করিতে নিযুক্ত রাত্রি ১১টা পহারাওয়ালা ঘণ্টা বাজাইল ছলিমের পরনে একটু ছিন্ন বস্ত্র গায়ে ১ ৩াত পানি গামছা সে শীতের প্রকোপে থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে এশার নামাজ পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,- দয়াবান্ খোদা, তুমি যা' কর তাতেই শোকর। তুমি যে দুঃখই দাও না কেন, আমি বুক পেতে যেন সইতে পারি—এই শক্তিটুকু কেবল তোমার কাছে ভিক্ষা চাই আমি জানি, তুমি যাকে ভালবাস প্রাণ ভরিয়া তাকে দুঃখ দাও। ছলিমের সহিষ্ণুতার বাঁধের নিয় দিয়া—তাহার অজ্ঞাতসারে পানি চোয়াইয়া একটু ছিদ্র করিয়াছিল। সে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল,— খোদা! আমার ত এই দশা,—আমার বাড়ীতে আমার শিশু ছেলেদের ভাতের কি হচ্ছে?

ছলিমকে দেখিয়া আমাদের কোন সন্দেহ থাকে না যে, নিশ্চয়ই এ পৃথিবী অপেক্ষা সুন্দরতর উজ্জ্বলতর আরও পৃথিবী আছে। যে পৃথিবী ছলিমকে অনবরত ডাকিতেছে। সক্রেটিস যখন হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে বিষপান করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দেন তখন তাঁহার বিশ্বাস ছিল, পর-জগৎ এজগৎ অপেক্ষা সুন্দরতর উজ্জ্বলতর। সে জগতে এ জগতের মানুষ অপেক্ষা উচ্চতর—হৃদয়বান্ সুন্দরতর জীব বাস করিয়া থাকে এবং হিংসা—অত্যাচার—অবিচার—ক্রোধ হইতে সেস্থান সম্পূর্ণ মুক্ত। তাই তিনি হাসিতে হাসিতে প্রাণ দিয়াছিলেন * পবিত্র কোরাণ-ও তাই বলিয়া দেন—পৃথিবীর সুখ স্থায়ী নয়, ধার্ম্মিকদের জন্য পরজগৎ উত্তম † পবিত্র হাদিস তাই বজ্রনির্ঘোষে বলেন—এ জগৎ পাপীর জন্য—স্বর্গ, ধার্ম্মিকদের জন্য নরক

দুই দিন পর ছলিমের বিচারের দিন। যে বিচার হইবে রাহজানের, সেই বিচার—আজ ছলিমের। ডেপুটী বাবু দারোগার রিপোর্ট দেখিয়া আর কয়টা সাক্ষী ও দারোগার বাচনিক সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া ছলিমের প্রতি কঠোর কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন। যে বিচারে রাহজান সেসনে সোপর্দ্দ হইবে, সেই বিচারে ছলিমের ২ বৎসর কঠোর কারাদণ্ড তবে ডেপুটী বাবু অনুগ্রহ করিয়া রায়ে প্রকাশ করিলেন যে, ছলিমের চেহারা দেখিয়া—সে যে এরূপ ষড়যন্ত্র করিয়াছে তাহা সন্দেহজনক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সাক্ষিগণ যে সাক্ষ্য দিল—আর তদন্তের যে রিপোর্ট পাওয়া গেল

---

* All discords, harmony, not understood,
All partial evil universal good.

—Pope.

† ছুরা মেছা—একাদশ—ভাবার্থ—(কোরান)

তাহা সকল বিবেচনা করিয়া কারাবাসের আদেশ দেওয়া গেল। ছলিম জেলে গেল, এ সংবাদ তাহার বাড়ীতে পৌছিলে তাহার বাড়ী এবং পরিবারবর্গ লইয়া যে দৃশ্যটা তাহা পাঠক-পাঠিকাগণ মনে আঁকিয়া দেখিবেন আমার তুলি এখানে অক্ষম

২য় প্রবাহ।

বঙ্গের দিকে।

পরিচ্ছেদ

(৬)

"বাস্তবিক ভাই আবদুল কাদের, তোমাকে দেখলে আমার বড় আনন্দ হয় এই ছাত্রজীবনে ধর্ম্মের প্রতি তোমার যেমন প্রগাঢ় ভক্তি এমন খুব কম ছাত্রেরই দেখা যায় তোমার নানা বিষয়ের জ্ঞান, বিশেষতঃ কোরানের যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা এবং পার্থিব ঘটনা দ্বারা তার প্রমাণ দিতে দেখে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে যাই।"

'রমেশ, ইসলাম, সত্যই যে কত জ্ঞানের আধার, কোরান শরিফ যে কত বিষয়ের জ্ঞানের ভাণ্ডার, তা' চিন্তা করতে গেলে আমি পাগল হয়ে যাই তা না হলে, কার্লাইল জোনসন—মনটেট, গিবন, হ্যালাম, লিউয়োনার্ড, আরনল্ড প্রভৃতি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লেখকগণ ইসলাম ও কোরানের এত প্রশংসা করতেন না"

কলেজ বোর্ডিংএর উপরতালার বারান্দার রেলিংএ ঠেস দিয়া কলিকাতার রাস্তার জনস্রোতের গমনাগমন দেখিতে দেখিতে আবদুল কাদের ও রমেশ এইরূপ আলাপ করিতেছিলেন

রমেশ এম্‌এ, পাশ করিয়া ইউনিভার্সিটী কলেজে ল' পড়িতেছে রমেশ ও আবদুল কাদেরের বন্ধুত্ব বাল্যকাল হইতে বাড়ী একই দেশে—একই জেলায় রমেশ বলিল,—দেখ আবদুল কাদের, আমরা হিন্দু-মুসলমান একই গ্রামে বাস করে আমাদের সত্যিকার প্রাণের মিলন হয়না কেন আমায় যদি বুঝিয়ে দিতে পার, তোমাকে এক সের রসগোল্লা খাওয়াব।

আবদুল কাদের হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—ঠিক খাওয়াবে ? ও জিনিষটা পেলে আমার খুব মুখ খোলে, তা' খেতেই খুলুক আর বলতেই খুলুক এই ধর আসল মিলনটা হয়—কুসংস্কার ত্যাগে আর আত্ম-ত্যাগে মুখের ত্যাগে নয়, বক্তৃতা মঞ্চের আত্মত্যাগে নয় · কলমের আত্মত্যাগে নয়– যে আত্মত্যাগে কথা ও কাজ দুইই আছে তাই ভারতের এক বর্ত্তমান কবি (১) বলেছেন "সকলে মিলে –আমরা পাব –এই হিসাবের উপর আমাদের পাকা মিলন হবে না, পরস্পর পরস্পরের জন্য দেব এই বেহিসাবী প্রেমের সম্বন্ধেই আমরা মিলতে পারব ।"

এই বেহিসাবী প্রেমের নদীটী একটু বহাইলেইত সকল জঞ্জাল ভেসে যায়—দেশ নির্ম্মল পবিত্র জলে ধুয়ে ওঠে আজ যদি আমরা প্রত্যেকের হৃদয় হ'তে একটু করে প্রেমের ঝরণা বহাতে পারি, কাল সে ঝরণা একত্র মিলে বিশ্বকে বিধৌত করে দিতে পারে না কি ?

আমাদের শেষ পয়গম্বর যে পথ দিয়ে মসজিদে যেতেন এক বিধর্ম্মী বুড়ী তাঁর সঙ্গে এত হিংসা রাখত যে, সে সেই পথে প্রত্যহ কাঁটা দিয়ে রাখত। রছুল সে কাঁটা সরিয়ে সরিয়ে মসজিদে যেতেন। সে পথে কয়দিন কাঁটা দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞাসায় জানিলেন যে, বুড়ীর অসুখ হয়েছে বলে কয়দিন পথে কাঁটা দিতে পারে না তিনি তৎক্ষণাৎ বুড়ীর বাড়ী গিয়া তাহাকে বলিলেন,—মা, তোমার অসুখ হয়েছে, আমি দেখতে এসেছি—তুমি এ কয়দিন পথে কাঁটা দাও না—খোদার কাছে মনাজাত করি তুমি শীঘ্র আরাম হয়ে আমার পথে আবার কাঁটা দাও। যে কয়দিন বৃদ্ধা নিরাময় না হইল প্রত্যহই তিনি তাহার বাড়ী গিয়া তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেন।

---

(১) রবীন্দ্রনাথ

ওহেদের যুদ্ধে যখন আমাদের মহাপুরুষের দাঁত শত্রুরা ভেঙ্গে দিয়াছিল তখন তিনি শত্রুগণকে কেবল বলেছিলেন,—"দয়াময়ের শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হউক " এর নামই বেহিসাবী প্রেম। রমেশ বলিল,—এ বেহিসাবী প্রেমে "তোমার" আর "আমার" এতেও ত কোন প্রভেদ দেখা যায় না ?

আবদুল কাদের বলিলেন—প্রভেদ আছে। তোমার ধর্ম্ম হিন্দু, আমার ধর্ম্ম ইসলাম তুমি শাক্ত বা বৈষ্ণব, আমি শিয়া বা সুন্নি, তোমার তীর্থ-স্থান—কাশীতে বা অন্য কোন দেবালয়ে, আমার তীর্থস্থান মক্কা শরিফে বা মদিনা শরিফে, কিন্তু যখন তোমার দেশ, আমার দেশ—তোমার জাতির দুঃখ, আমার দুঃখ—তোমার অভাব আমার অভাব—তোমার গ্রাম আমার গ্রাম—তখন তোমার আর আমার এতে প্রভেদ নাই যে দিন তোমার হৃদয়ের তপ্ত শ্বাস আমার হৃদয়কে উষ্ণ করবে, যে দিন আমার হৃদয়ের প্রাণ-মাতান আনন্দ তোমার হৃদয়ে হেসে উঠবে, যে দিন আমার ঘরে আগুন লা'গলে তোমার হৃদয়ের জল দিয়ে নিভাতে পারবে, সে দিন তোমায় আমায় প্রভেদ নাই। সে দিন মুসলমান হিঁদুর মুখে ভাত তুলে দেবে যে দিন হিন্দু মুসলমানের চখের জল মুছাবে, সে দিন প্রকৃত জাতীয় জীবনের সুখের দিন হবে। যে দিন কোন জাতি প্রবল হয়েও অপর গরীব জাতিকে ভাল-বাসবে যে দিন আমি তুমিতে মিশাতে পারব সে দিন প্রকৃত মিলন হবে।

তাঁহারা যখন নানা বিষয় লইয়া এইরূপ আলোচনা করিতেছিলেন এমন সময় নিম্নতলের দরজায় কে আঘাত দিয়া শিকল নাড়িয়া বলিল,—বাবু, তার আয়া রমেশ ব্যস্তভাবে দ্বারের নিকট গিয়া টেলিগ্রাম গ্রহণ করতঃ স্বীকার পত্রে দস্তখত দিয়া এনভেলপ ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে উপরে

উঠিয়া আসিল খুলিয়া পড়িয়া দেখে—রমেশের ভ্রাতা শিবপুরে মৃত্যু-শয্যায় শায়িত ইনি ইন্‌জিনিয়ারিং পড়েন

আবদুল কাদেরের পায়ে চটি ছিল মাত্র সেই অবস্থায় রমেশের সহিত নৌকাযোগে শিবপুরে উপস্থিত হইলেন রমেশের ভ্রাতার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন আবার খাটের পার্শ্বে নিম্নে হিন্দুস্থানী চাকরটা নিউমোনিয়া-গ্রস্থ। তাঁহারা উপস্থিত হইয়া পূর্ণ উদ্যমে উভয়ের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন—রাত্র দিন পর্য্যায়ক্রমে উভয়ে উভয় রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কাটাইতে লাগিলেন এ সময়ে রমেশ আবদুল কাদেরকে খোদার দান স্বরূপ পাইলেন (*) রমেশের ভ্রাতা ক্রমে নিরাময়ের পথে দাঁড়াইলেন—কিন্তু হিন্দুস্থানী চাকরটার অবস্থা অধিকতর কঠিন হইয়া উঠিল সে একদিন রাত্রি ২টার সময় পার্শ্বে উপবিষ্ট আবদুল কাদেরকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—বাবু, হামার এ দেশে কোই না আছে বাবু, হামি এই বিদেশে মরলাম, কারও সঙ্গে দেখা হইল না তাহার প্রাণের প্রকৃত বেদন অনুভব করিয়া দেশের স্মৃতি তার মনে এখন কেমন জাগিয়াছে বুঝিয়া আবদুল কাদেরের চক্ষু দিয়া অশ্রু গড়াইল

"তুমি সেরে উঠবে, তোমার কোন ভয় নাই, তুমি আবার দেশ দেখতে পাবে" বলিয়া তিনি তাহার বুকে অধিক মনোযোগের সহিত সেক দিতে লাগিলেন

---

* O friend, my bosom sa'd
Throug thee alone the sky is arched
Throug thee ose is red
All t ngs through t ee-ta e nob e form
Emerson,

সে আবার হিন্দি বাঙ্গালা মিশ্রিত ভাষায় বলিল,—বাবু, আপ এত্তা বড় মোছলমান হোকে মেরা মাফিক একটা ছোট্টা জাত হিন্দু নওকরকে লিয়ে জান দেকে তকলিফ ওঠাতেহেঁ মেরা আপনা কোই এয়ছা করতা নেই হামার মনে কছট থাকল বাবু, হামি বাঁচলাম না—হামি আপনার কিছু করতে পারলাম না আবদুল কাদের তাহার চোখের পানি মুছাইয়া দিয়া বলিলেন,—তোম খোদাকা পর ছবর কর, খোদা তোমারা আছান দেগা, মেরা কুছ তকলিফ নাহি হোতা

দুঃখের বিষয় রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই দেশের বাড়ীর কুঁড়ে ঘরখানিকে হৃদয়ের উপর টানিতে টানিতে সে চিরদিনের জন্য ঘুমাইয়া পড়িল

রমেশের ভ্রাতা এ ভীষণ শঙ্কটাবস্থা হইতে রক্ষা পাইলেন। ডাক্তারের উপদেশ অনুসারে তাঁহাকে লইয়া রমেশ ও আবদুল কাদের রমেশদের বাড়ী পৌঁছিলেন

কতক্ষণ পরে রমেশের মাতা কিছু আহার্য্য আনিয়া আবদুল কাদেরের সম্মুখে দিয়া আহার করিতে অনুরোধ করিলেন আবদুল কাদের বলিলেন,—মা, মাপ করবেন, আমি যদিও সত্যি খুব ক্ষুধার্ত্ত হয়েছি, কিন্তু আপনাদের হাতে খেতে পারব না।

রমেশের মা বলিলেন,—কেন বাবা, তোমরা শিক্ষিত ছেলে, তোমাদের মধ্যে এত সঙ্কীর্ণতা কেন?

আবদুল কাদের বলিলেন,—মা, শিক্ষাক্ষেত্রে আপনারা মুসলমান চেয়ে এগিয়ে গিয়েছেন, অথচ আপনাদের মধ্যে যে সঙ্কীর্ণতা কত —বেয়াদবি মাপ করবেন মা,—তা বলে শেষ করা দুষ্কর সত্য বলতে গেলে, আপনারাই আমাদিগকে সংকীর্ণতা শিক্ষা দিচ্ছেন। বাদশাহের আমলে আপনাদের এত শিক্ষা ছিল না, তখন মুসলমানের সঙ্গে

বৈবাহিক সম্বন্ধ পর্য্যন্ত করে সুখী হয়েছেন যাক প্রকৃত কথা বলি মা, যা আমাদের বৈধ খাদ্য তা আপনাদের হাতে খেতে আমার কোনই আপত্তি নাই, কিন্তু আপনাদের সঙ্কীর্ণ ব্যবহারের জন্য, আমাদের আত্মসম্মান বজায় রাখতে কোন মতেই আপনাদের হাতে পানি পর্য্যন্ত খাওয়া উচিত নয় বলে আমার মনে হয় আমরা মিলন চাই—হৃদয়ভরা মিলন চাই কিন্তু আত্মসম্মান নষ্ট করে—আপনাদের কৃপার পাত্র হয়ে মিলন চাই না,—আর সে মিলন প্রাণের মিলন, হয় না—সে মিলন, মৃত্যু। মিলন, প্রভু ভৃত্যে হয়, রাজায় প্রজায় হয়, বন্ধুতে বন্ধুতে হয়, ভাই ভাইতে হয় তাই মা, আমি নিজে বিশ্বাস করি এবং আমার মুসলমান ভাইদের সাবধান করে দেই যে, আমরা মিলতে গিয়ে যেন কোন জাতির কাছে হেয় হয়ে না পড়ি

হিন্দুরা বলেন,—আমরাও বলি,—আমরা হিঁদুর ভাই,—কিন্তু ভাইকে দেখে ভাই হুকার জল ফেলে দেয় কেমন করে? এমন ভাব জাগ্রত থাকতে মিলনকে আমরা দূর থেকে সালাম করি মিলন চাই—কিন্তু কণামাত্র আত্মসম্মান নষ্ট করে মিলন চাই না। যে নীচপ্রাণ হিন্দু বা যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউক—কোন মুসলমানের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেন—যদি সে মুসলমান হয় সে যেন সেরকম হিন্দুর ত্রিসীমানায় পা না দেয়।

রমেশের মাতা বলিলেন,—কেন বাবা, রমেশ ত তোমার সঙ্গে খায়

"হাঁ মা, সেও খায় আমিও খাই। কিন্তু আপনি বোধ হয় আমার ছোঁয়া জলটুকু দিয়ে কোন কাজ করবেননা অথচ আমি আপনার হাতে খাব—আমি কি এত নীচ? আমি দেখেছি—আমি অবশ্য সহরের কথা বা বড় বড় নামজাদা উচ্চ শিক্ষিত হিন্দু মুসলমানের কথা বলছি

মা, আমাদের বাসস্থান পাড়াগাঁয়ের কথা বলছি—কোন মুসলমান যদি এক চৌকিতে ব'সে থাকে তবে হিঁদু ভাই উঠে গিয়ে তামাক খাবেন, মনে হয় যেন ছুঁতটা দূরে উপবিষ্ট মুসলমানের গা থেকে বেরিয়ে চৌকি বয়ে বা বিছানার চাদর বয়ে ক্রমে ক্রমে হিঁদু ভাইয়ের গায়ের মধ্য দিয়া হাতে যায়, আর হাত থেকে বেঙের মত লাফ দিয়ে হুকার মধ্যে গিয়া পড়ে—অমনি হিঁদু ভাইয়ের প্রাণটা ছ্যাৎ করে ওঠে—সেই ভয়ে তিনি সরে পড়েন এমন ভাব রেখে তার সঙ্গে মিলন—তার নাম আমি বলি মৃত্যু কিন্তু প্রাণ থেকে বলছি মা, আমরা আপনাদের সঙ্গে প্রাণে প্রাণে মিশতে চাই। না মিশলে উভয়ের অমঙ্গল—ভারতে প্রকৃত শান্তি অসম্ভব

রমেশের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে সে সহসা বলিয়া উঠিল,—ঠিক কথাই ত মা, আমাদের মধ্যে অনেকগুলি লোক এমন কুসংস্কারে অন্ধ যে তারা কোন বিষয় চিন্তা করে লোকের সঙ্গে ব্যবহার করে না। সেদিন রমা চাটুয্যের বাবা স্নান করে ঘাট থেকে আসছে এমন সময় বুড়ো তছির সেই পথ দিয়ে যেতে, যেই তার ছায়া লেগেছে অমনি রমার বাবা কাঁধ থেকে জলত ফেলে দিলই—তা বাদে মুখে যা আসল তাই বলে গাল দিতে দিতে আবার ঘাটে ফিরে গেল। তছির রেগে উঠে বলল,—"কেন ঠাকুর, এত কেন? যখন জল দিয়ে ভাঁড় ধুয়ে সেই ভাঁড়ের মধ্যে তখনি দুধ দিয়ে তোমার বাড়ী এনে বিক্রী করি, আবার যেদিন সস্তা চাও সে দিন কিছু পানি ঢুকিয়ে দিয়েও দয়ে আসি, তা তোমার কোন্ পেটে সয়? আর যখন জল দিয়ে ধান সিদ্ধ করে চাল তৈরী করে তোমার বাড়ী বেচে যাই তা তোমার কোন্ মুখে যায়? খেজুরের রস, আখের রস জ্বালিয়ে গুড় ক'রে আনি তা তোমার কত ঠাকুরের ভোগে লাগে? সেই গুড়ের তৈরী

চিনির সন্দেশ আবার তোমাদের দেবতার ভোগ দিয়ে পূজো কর ” আর রমার বাবার মুখে কথা নেই বিড় বিড় ক'রতে ক'রতে আবার স্নান করে বাড়ী গেল কি ভুল ধারণা! বিড়াল পাতের কাছে বসে খেলে দোষ নাই, অথচ একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মুসলমান সে ঘরের ছায়া মাড়ালে জাত যায় এমন অন্ধ ধারণা লয়ে কি করে চলে? আর এতে প্রতিবেশী মুসলমানের সঙ্গে সদ্ভাব থাকে কি করে?”

রমেশের মাতা গম্ভীর হইয়া কথাগুলি শুনিতেছিলেন—কথাগুলি তাঁর গোড়ামীর পাহাড় বিস্ফোরক সংযোগে ভাঙ্গিয়া দিতেছিল।

রমেশের পিতা অন্য কামরায় বসিয়া শুনিতেছিলেন; তিনি বলিলেন —“শুনেছ ত? আমি ত তোমার জ্বালায় মোছলমান পাড়ার মধ্য দিয়া হাঁটতে পারি না। ও পাড়ার মধ্য দিয়ে এলে ওরা নাকি জাত কেড়ে রাখে এখন চুপ করে রইলে কেন?”

রমেশের মা বিরক্তি ও সন্তোষ মাখাইয়া আবদুল কাদেরকে বলিলেন —“বাপ, তোমাদের কথা শুনে আমার ভুল ধারণা ভেঙ্গেছে, এরূপ আচরণ কখনও শাস্ত্রের আদেশ হতে পারে না মানুষকে মানুষ ঘৃণা করবে এ যে শাস্ত্রে শিক্ষা দেয় সে শাস্ত্র মিথ্যা, সে শাস্ত্র জঞ্জাল এক জনকে ভালবাসলে সেও যে ভালবাসবে এও যেমন স্বাভাবিক, একজনকে ঘৃণা করলে সেও যে ঘৃণা করবে এও তেমন স্বাভাবিক কিন্তু আমি দোষ দেই তোমাদের; তোমাদের অনেকের আত্ম সম্মান বোধ একেবারে নাই, তাই হিন্দুরা এরূপ আচরণ করতে সাহস পায়। যদি তারা বুঝত যে মুসলমান কোন দিক দিয়াই অন্য জাতি অপেক্ষা ছোট নয় তবে এমনটি হতে পারত না আমি প্রার্থনা করি, এমন দিন নিকটে আসুক যখন কেউ কাউকে এমন ব্যবহার করতে পারবে না তখন মুসলমান হিন্দুকে প্রাণভরে ভালবাসবে।

আবতুল কাদের বলিলেন—আমিও ত তাই ব'ল ম,. যতদিন আমরা হিন্দু কি মুসলমান, বৌদ্ধ কি খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ কি জৈন—মানুষ হিসাবে এসব ভুলে যাব, আফ্রিকার উলঙ্গ নিগ্রো ফিজী দ্বীপের রাক্ষস মানুষকে বিশ্বসমাজে সম্ভব° র—"

"চল চল তোমার বৌদির হাতে খাবে ত চল এখন" বলিয়া রমেশ আবদুল কাদেরের হাত ধরিয়া উঠাইয়া লইয়া গেল

পরিচ্ছেদ

(৭)

আমাশা রোগের অব্যর্থ আক্রমণে আবদুল কাদেরের পিতা বেহেস্ত-বাসী হইয়াছেন তাঁহার সংসার-সমুদ্র তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছে বৈমাতৃক ভ্রাতাগণ নানা কূটজাল বিস্তার করিয়া পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। পিতার মৃত্যুর পরই ভ্রাতাগণ তাঁহাকে পৃথকান্ন করিয়া দিয়াছেন ভ্রাতাদের অর্থের অভাব ছিল না কেননা তাঁহারা সকলেই উপার্জ্জনক্ষম আবদুল কাদেরের পাঠ্যাবস্থা শেষ হয় নাই, তিনি এম-এ ও ল এক সঙ্গে পড়িতে ছিলেন। এখন পড়া ত দূরের কথা, উদরান্নের জন্য তাঁহাকে উদগ্রীব হইতে হইল উত্তমর্ণদের দেনা পরিশোধের জন্য চাপ, উদরান্নের চিন্তা, ভ্রাতাদের নিষ্পেষণ তাঁহার জীবন-পথ মহা বিভীষিকা ময় করিয়া দিল

একদিন দিবাবসানে একটী কুরসী লইয়া নদীতীরে বসিয়া আবদুল কাদের নানা বিষয় চিন্তা করিতেছেন। নদীর উপর দিয়া কত তরণী কর্ম্মের ব্যাকুলতা লইয়া ছুটিয়াছে। কত তরণী কর্ম্ম সম্পাদনান্তর গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতেছে কেহ উজানে নৌকা ধরিয়াছে কেহ ভাটার স্রোতে নৌকা ভাসাইয়াছে সকল নৌকাই চলিতেছে তবে কোনটী উজানে কোনটী ভাটিতে বিশ্বভুবনের কর্ম্মোন্মাদনা লইয়া সকলেই ছুটিয়াছে! আবদুল কাদের ভাবিলেন বিশ্বের বুকে এমন করিয়াই সকল জীব কর্ম্মের দ্যোতনায় অবিরাম ঘুরিতেছে ফিরিতেছে। আমাকেও বসিয়া থাকিবার উপায় নাই, চলিতেই হইবে। বিশ্ব-স্রোতে

ডুবিবার ভয় আমার পদে পদে এত বিপদ সম্মুখে রাখিয়াও আমাকে স্রোতের মুখে যুঝিতেই হইবে।

তিনি যখন এসকল বিষয় ভাবিতেছিলেন এমন সময় একটী শীর্ণকায় বালক আসিয়া ভিক্ষা চাহিল ও তাহার জঠর জ্বালার কথা জ্ঞাপন করিল। আবদুল কাদের ভিক্ষুক বালকের খাদ্য ও ভিক্ষা দিতে, ভৃত্যকে আদেশ দিয়া, একখানা পুস্তক লইয়া পাঠ করিতে মনোনিবেশ করিলেন বালক আহার করিতে করিতে বলিতে লাগিল, বাবাগো, আমার বাপজান জেলে যাওয়ার পর আর আমাদের পেটে ভাত নাই দুই দিন ধরে ভিক্ষে করে একসের চাল লয়ে কাল বাড়ী গেলাম তা ছোট ভাই দুটো, মা, আর বুনকে লয়ে কোন মতে জান বাঁচিয়েছি, আজ এপর্য্যন্ত আধসের চালও হয় নাই তা বাড়ী যাব কি লয়ে? আজ আর তাদের খাওয়া হবে না।

আবদুল কাদের বই হইতে মুখ তুলিয়া কহিলেন—তোর বাপ জেলে গেল কি করে? বোধ হয় চুরি করেছিল বেটারা খেতে না পেলেই চুরি করতে যায় তা উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে।

বালক বলিল—না, বাবা, আমার বাপ জান, চুরি করে জেলে-যায় নাই গাঁয়ের কয়টা লোক আমার বাপকে জেলে দিয়েছে বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল চক্ষুর পানি মুছিতে গামছা উঠাইয়া দেখে কপালের কি দোষ, এক ব্যক্তি তাহাকে ২টা পয়সা ভিক্ষা দিয়াছিল তাহা আঁচলে বাঁধা ছিল, কোথায় পড়িয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া ছলিম পুত্র আরও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল আবদুল কাদের বই বন্ধ করিয়া বলিলেন—বাবা, তুমি কেঁদ না, তোমাকে আমি পয়সা দেব এখন বালক কতকটা শান্ত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার নির্দ্দোষিতা প্রমাণের জন্য পুত্রের প্রাণের ব্যথা মাখাইয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা যথাযথ বিবৃত করিল।

বালকের মুখে এ ঘটনা শুনিয়া আবদুল কাদেরের হৃদয়-তন্ত্রীতে ভীষণ বেদনা ঝঙ্কার দিল তিনি তখনই একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া ছমিস পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের গ্রামাভিমুখে অগ্রসর হইলেন গ্রামে উপনীত হইয় এক বৃদ্ধার নিকট প্রথমে এ ঘটনার সত্যতা জানিতে চাহিলেন বিধবা বৃদ্ধা বলিল, বাবা! সমস্ত কথা আমি বলতে পারি, কিন্তু আমার কথা যদি জহিরদ্দি মিঞার ছেলে জানতে পারে তবে কোন দিন আমার এই কুঁড়ে ঘরটুকু আগুনের মুখে উড়ে যাবে. আবদুল কাদের বলিলেন, মা! তোমার কোন ভয় নাই আমি শপথ করে বলছি, আমি স্বপ্নেও তোমার কথা মুখে আনব না। বৃদ্ধা অভয়বাণী শুনিয়া এবং যুবকের মুখে সৎগুণের পরিচয় পাইয়া সমস্ত কথা অকপটে বলিল আরও যতদূর পারিলেন গ্রামের দুই একটী লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া সত্যতা নির্দ্ধারণ করিয়া আবদুল কাদের গৃহে ফিরিলেন আহারান্তে নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন বটে কিন্তু নিদ্রা তাঁহার উপর প্রসন্ন হইল না তিনি ভাবিতে লাগিলেন, খোদাতালা! তোমার রাজ্যে একি অত্যাচার. পিশাচের খেলা. আমি এর কি করতে পারি? কিন্তু এত অসহ্য আমি গরীব—আমি ক্ষুদ্র আমি একাকী বটে কিন্তু তোমাকে যদি হৃদয়ের মধ্যে রাখতে পারি, তাহলে আমি গরীব নই, আমি ক্ষুদ্র নই, আমি একাকী নই তুমি যদি হৃদয়-দুয়ারে বসে পাহারা দাও, আমি ছলিমকে রক্ষা করতে পারবই।

রাত্রি প্রভাতে তিনি ছলিমের মকদ্দমার আপীল করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন কিন্তু বাক্স খুলিয়া দেখেন মাত্র ১টা টাকা আছে। তাহাতে ত নৌকা ভাড়াও হইবে না উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি নিজের গায়ের একখানা শীতবস্ত্র হাতে লইয়া নিকটবর্ত্তী এক হিন্দু ভদ্রলোকের নিকট যাইয় বন্ধকে দশটা টাকা ধার চাহিলেন ভদ্রলোক

টাকা থাকিতেই নাই বলিয়া ফেরৎ দিলেন ভদ্রলোকের দশবৎসর বয়স্ক পুত্র বলিল —কেন বাবা, মিথ্যা কথা বলছেন ? আপনার বাক্সে ত অনেক টাকা আমি সকালেও দেখেছি ভদ্রলোক দায় ঠেকে এসেছেন,—১০টা টাকা দেন না ?

পিতা লজ্জায় প্রথমে কথা বলিতে পারিলেন না—ক্ষণিক পর বলিলেন—তা কিছু টাকা আছে বটে—কিন্তু আজ কাল টাকা দিচ্ছি—এখন এক টাক নিলে এক মাস পর ভাদ্র মাসে দেড় টাকা দিতে হয় এই ভাবে যদি নিতে পারেন তবে দেখুন মশায় তা আপনি যখন এসেছেন—

বালক বলিল—না বাবা, সব সময়ই আপনার এক রকম ব্যবহার। ভদ্রলোক দায় ঠেকে এসেছেন আর আপনি—থাক আপনার টাকা দিতে হবে না যে আজ্ঞা আমাকে ২৫টা টাকা দিয়েছিলেন তা থেকে ১০৲ টাকা ওঁকে দেই। মৌলবী সাব আপনি টাকা লয়ে যান, বন্ধক দরকার নাই, যখন ইচ্ছে দেবেন। আবদুলকাদের টাকা লইলেন বটে কিন্তু বিনা বন্ধকে টাক লইয়া গেলে পিতার নিকট পুত্রকে লাঞ্ছিত হইতে হইবে ভাবিয়া কাপড় খানা জোর করিয়া বালকের হাতে দিয়া তিনি বাড়ী আসিলেন

আহারান্তে অপরাহ্নে নৌকাযোগে আবদুলকাদের জেলাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। নৌকা চলিতে লাগিল। তাঁহার মানসিক চিন্তার নৌকাও আজ অধিক বেগে ঢেউ তুলিয়া বহিতে লাগিল সংসারের নানা দিকটা তাঁহার মনের উপর আজ বড় আঘাত করিতে লাগিল। কতক্ষণ পর সন্ধ্যাকে জগতে স্থান দিবার জন্য সূর্য্য গা লুকাইয়া সরিয়া পড়িতে লাগিল সুন্দরী রমণী তাহার প্রেমিককে দেখিয়া উদ্যানের ঝোপের মধ্যে লুকাইলে যেমন তার সৌন্দর্য্য লতা-বিতানের ফাঁক দিয়া

আসিয়া প্রেমিকের চখে সুধা ঢালিয়া দেয়, আজকার সূর্য্যও তীরস্থ ঝোপের মধ্য দিয়া—আসিয়া তেমনি আবদুলকাদেরের চক্ষু চুম্বন করিয়া তাঁহার ভাঙ্গা হৃদয়ের উপর একটু প্রলেপ দিতে লাগিল। অধিকক্ষণ লুকাইয়া থাকিলে যুবক অসন্তুষ্ট হইতে পারে ভাবিয়া রমণী যেমন আড়াল ছাড়িয়া উন্মুক্ত স্থানে আসিয়া দেখা দেয় ও বাক্যালাপ করিয়া সেদিনকার মত বিদায় লয়, তেমনি সূর্য্যও তীরস্থিত ঝোপ ছাড়াইয়া নৌকার গতির সঙ্গে উন্মুক্ত মাঠে আসিয়া তাহার ভুবনমোহন রূপ দেখাইয়া সেদিনকার মত বিদায় লইতে বসিল।

সবুজ ঘাসের উপর দিয়া চলিতে চলিতে বা শস্যভরা মাঠের আইলের উপর দিয়া বাড়ী যাইতে যাইতে গরীব কৃষকেরা প্রত্যহই এমন অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় কিন্তু রাইটার্স বিল্ডিংএর মোটা বেতনভোগী বাবুদের ভাগ্যে অনেক রবিবারেও ইহা ঘটে না।

খোদার এ অনুপম দান উপভোগ করিতে করিতে উচ্ছ্বসিত প্রাণের আবেগের সহিত গগন পবন মোহিত করিয়া আবদুলকাদের গাহিলেন—

তেরে জাত পাক হ্যায় আয় খোদা

তেরে শান জাল্লা জালালাহু

তেরে নাম হ্যায় মালেকে কিবরিয়া,

তেরে শান জাল্লা জালালাহু

কোই শাহ্ কোই আমীর হ্যায়, কোই বেনওয়া আওর ফকির হ্যায়

জেছে চাহা জ্যায়ছা বানা দিয়া তু তেরে শান জাল্লা জালালাহু

মোরদাহ্‌রা জেন্দা ওঠায়ে তু

জেন্দারা মোরদাহ্ বানায়ে তু।

তেরে হাত মে হ্যায় ফানা বাকা

তেরে শান জাল্লা জালালাহু।

প্রাণের আবেগ দ্বারা যে গানের সুর বাঁধা হয়, খোদার প্রতি ভালবাসা দিয়া যে গানের তান লয় ঠিক করা হয়, সে গান না শুনিয়া থাকিতে পারে এমন লোক জগতে কম আছে * নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে আগতা পল্লীবালাগণ জলের কলস ভরিতে যাইয়া পানির মধ্যে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সে গান শুনিতে লাগিল নদীতীরে সন্ধ্যা ভ্রমণকারী ভদ্রলোকগণ কাণ ফেলিয়া সে গান উপভোগ করিতে লাগিলেন।

রাত্রি এক প্রহরের সময় নৌকা মহকুমা ঘাটে পৌছিল পরদিন মহকুমা কোর্ট হইতে রায়ের নকল লইয়া তিনি জেলায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার পরিচিত এক উকিল নিযুক্ত করিলেন

উকীল বলিলেন—মৌলবী সাব আপনি যখন এ মকর্দ্দমার তদ্বির করছেন, তখন আগে টাকার দরকার কি? পরে দিলেই হবে।

আবদুল কাদের বলিলেন—না মশায় উকীল বাবুরা টাকা না পেলে যে কথাটী বলতে চান না তা আমি জানি অনেক গরীব টাকা সংগ্রহ করতে পারে না বলে নিজের ক্ষতি হলেও মকর্দ্দমা করা দূরে থাকুক উকীলদের বৈঠকখানা ঘেসতেও ভয় পায় মকর্দ্দমা বড় লোকের জন্য। তাহারা হত্যা করিয়াও টাকার জোরে উকীল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করে বেকসুর খালাস পায় আর গরীবরা টাকা না থাকার অপরাধে বিনা দোষেও জেলে যায় বা ফাঁসীতে প্রাণ দেয় উকীল বাবু হাসিয়া টাকা

---

* The man that hath no music in himself,
Nor is moved with the concord of sweet sound,
Is fit for treason, stratagem and spoils
His spirits are dull as night

*   *   *

Let not such man be trusted.
—Shakespeare.

লইলেন। পরদিন আপীল মঞ্জুর হইল। ছলিমকে জামিনে খালাস দিবার হুকুম হইল। আবদুলকাদের তৎক্ষণাৎ জেলের মধ্যে ছলিমের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—ছলিম তুমি বের হয়ে এস

ছলিম ভয় জড়িত কণ্ঠে বলিল—আমাকে কষ্ট দিয়ে তোমাদের প্রাণ ঠাণ্ডা হয় নাই? এই জেলের মধ্যেও আমাকে পোড়াতে এসেছ? এস বুকে ছুরি দিয়ে সব নিভিয়ে দাও

আবদুলকাদের স্নেহ বিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন—আমি তোমাকে কষ্ট দিতে আসি নাই তুমি স্থির হও, কেঁদ না,—ছলিম, বের হয়ে এস। তিনি ছলিমের হাত ধরিয়া বাহিরে লইয়া আসিলেন এই কয়দিনের খাটুনিতে ছলিমের দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—সেত জেল দারোগার টাকা যোগাইতে পারে নাই যে তাহার খাটুনীর লাঘব হইবে?

ছলিম বাহির হইয়া বলিল—আমি জানতুম না,—বাবা, আমাকে একটু মিষ্টি কথা বলবার লোক দুনিয়ায় আছে, আমি ঠিক করে রেখেছি জগতের মানুষের মধ্যে দয়া নাই, বিচার নাই! আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশী কেহই আমার বুকে ছুরি দিতে চেষ্টার ত্রুটী করে নাই এখন বুঝলাম, এ জানোয়ার-ভরা দুনিয়ায় দুই একটি মানুষও আছে আমি না জেনে বাবা, আপনাকে শত্রু মনে করে, অমন কথা বলেছিলাম ভেবেছিলাম আমার শত্রুর কোন গুপ্তচরই আমাকে অধিক বিপদগ্রস্ত করবার জন্য এখানে এসেছে বাবা, কেন আপনি আমার মত অধমের জন্য এত কষ্ট করছেন? আমার মত লোকের দিকে চায় এমন লোক কি দুনিয়ায় আছে? বোধ হয় আপনি জানেন না আমার পক্ষে দাঁড়ান আর যম নিয়ে খেলা করা সমান কেন বাবা, আপনি আমার জন্য বিপদে পড়তে চান?

আবদুলকাদের বলিলেন—আমি সব জানি আমার জন্য তোমার চিন্তা নাই। তুমি এখন বাড়ী চল

ছলিম বলিল—আমার বাড়ী! জেলই আমার উপযুক্ত স্থান! জেলের বাইরের দুনিয়াটা কি জেলের চেয়ে কঠিন নয়, বাবা? জেলের বাইরে লোকে সহজেই লোকের গলায় ছুরি দিতে পারে। কিন্তু জেলের মধ্যে পাহারা থাকে বলে সহজে তা পারে না। আমার পক্ষে জেল ভাল। ছলিম বাড়ী গেল।

কয়েক দিন পর আপীলের মকর্দ্দমা আবদুলকাদের জানিতেন, যে কোন সময় তাঁর জীবন বিপন্ন হইতে পারে; কিন্তু তিনি সে চিন্তা দূরে রাখিলেন কেবল খোদার নিকট ছলিমের মুক্তির জন্য প্রাণ ভরিয়া প্রার্থনা করিলেন। খোদা প্রার্থনা শুনিলেন। জজের বিচারে ছলিম নির্দ্দোষ খালাস পাইল বিচারক রায়ে, ছলিমের নির্দ্দোষীতা, রাহাজান ও দারোগার ষড়যন্ত্র এবং অর্থলোভে বশীভূত সাক্ষীদের কথা—সমস্ত বিষয়ই উল্লেখ করিলেন

বিচারক দারোগাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—তুমি মানুষ না পশু না তুমি পশু হতেও অধম এমন নিরাপরাধ নিরীহ লোককে জেল দিতে যে চেষ্টা করে, তার মত অত্যাচারী জগতে কে আছে! মানুষ কুলে তোমাদের জন্ম কিন্তু বাঘ, সিংহ অপেক্ষাও তোমরা হিংস্র। ভাল্লুকের সামনে মানুষ পড়লে সে যদি মরার মত হয়ে পড়ে থাকে তবে ভালুক তাকে আক্রমণ করে না কিন্তু তোমার লোলুপ জিহ্বা বরং অসহায় নিরপরাধ অনাহার ক্লিষ্ট—মৃতবৎ লোকের উপরই অধিক অগ্রসর হয়

পরিচ্ছেদ।

(৮)

আবদুলকাদের একদিন বৈঠকখানার গৃহে বসিয়া আছেন অনতি দূরে একটা গাছের উপর একস্থানে গায়ে গায়ে মিশিয়া কতকগুলি পাখী তাহাদের সঙ্গীত-সুর বাতাসে মিশাইতেছে ছোট ছোট শাখাগুলি বিনা বাক্য ব্যয়ে বায়ু-হিল্লোলের সহিত নাচিয়া নাচিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিতেছে এ সকল দেখিতে দেখিতে আবদুলকাদেরের মনে হইতেছে—খোদাতালা সংসারকে শান্তি দিয়েই সৃষ্টি করেছেন কিন্তু মানুষ সে শান্তি নষ্ট করে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দুনিয়াটা পোড়াচ্ছে। খোদাতালার সৃষ্টরাজ্যে ভাঙ্গা-গড়া, সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়, স্বচ্ছলতা-অনাটন, পাপ পুণ্য, রাত্রি-দিন এত গোলমালের মধ্যেও একটা বিরাট সামঞ্জস্য বিরাজ করছে আর সেই 'প্রথম-মহা-কারণ"* বা মহাশক্তির অস্তিত্বের বারতা হৃদয়ে ২ বয়ে আনছে কিন্তু মানুষ এত ক্ষুদ্র হয়েও এই সামঞ্জস্য ভাঙ্‌বার জন্য নিয়ত চেষ্টা করছে মানুষ এত ক্ষুদ্র এই কোটী কোটী সূর্য্যের কোটী কোটী দুনিয়ায় আমি কত ক্ষুদ্র এই অনন্ত বিশ্বে আমি কে? আমি কি? আমি কোথায়? আমি কতটুকু? খোদা আমাকে তুমি দেখে থাক? এ বিশাল বিশ্বের এক স্থানে যে আমি আছি তা কি তুমি জান? জান বই কি! তুমি যখন গড়েছ, তখন জান বই কি! বিশাল সমুদ্রের বেলা ভূমিতে যে ক্ষুদ্র বালিকণা জ্বলে তাও নাকি তোমার দৃষ্টির অন্তরালে নয়! ক্ষুদ্র তৃণের পল্লব যখন বৃন্তচ্যুত হয় তাও তোমার জ্ঞানের অগোচরে নয়। তাই ভরসা হয়

* The Great first Cause

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীবের আমি একজন, আমি তোমার সৃষ্টির বাইরে নই।

তিনি যখন মনে মনে আত্মাকে সেই মহান খোদাতালার নিকট এমন করিয়া কোরবাণী করিতেছিলেন এমন সময় দরবেশ সাহেব "আচ্ছালাম আলায় কোম" বলিয়া উপস্থিত হইলেন "ওয়া আলায় কোম চ্ছালাম" বলিয়া আবদুলকাদের দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে বসিতে দিলেন

দরবেশ সাহেব বসিয়াই বলিলেন—আমি শুনতে পেলাম—আপনি নানা দিক দিয়ে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছেন তা আমি একটা কথা মনে করেই গুরুনের মামুদের বাড়ী গিয়েছিলাম। আব্দুলকাদের বলিলেন —জি হাঁ' আমি নানা দিক দিয়া বড় বিব্রত হ'য়ে পড়েছি. ভাইরা সব পৃথক করে দিয়েছেন। বাপের দেনা ঘাড়ে। আরও নানা বিষয় লয়ে বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, এখন খোদা ভিন্ন উপায় নাই।

দরবেশ সাহেব বলিলেন—আমি তা সব শুনেছি। আমার মনে হয় এসময় আপনার বিবাহ হ'লে একটু স্থির হ'তে পারেন।

আব্দুলকাদের ভৃত্যকে ওজু করিবার পানি আনিতে আদেশ দিয়া বলিলেন—জোনাব, বিয়ে সম্বন্ধে আমি এখনও কিছু স্থির করি নাই কেউ আমাকে সাহায্য করবে এ আশাও আমি করি না, সুতরাং সে বিবাহে স্থির না হ'য়ে অস্থির হতে হবে নিজে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে না পারা পর্য্যন্ত আমার মতে বিয়ে করাটা সঙ্গত বোধ হয় না। কোন এক ভদ্রলোক আমার পিতাকে খুব প্রলোভন দিলেন যে তাঁ'র ভগ্নির সঙ্গে আমার বিয়ে দিলে তিনি আমার লেখা পড়ার সমস্ত ভার গ্রহণ করবেন। আর আমার পিতা ঘরে বসে বিনা খরচে শিক্ষিত ছেলে পাবেন। আমার পিতা মাতা সে প্রলোভনে ভুলে গেলেন, আমাকে বিয়ের শিকলে বাঁধতে

চেষ্টা করলেন আমি অনেক অনুনয় বিনয় ক'র্‌লুম যাতে এসময় আমার বিয়ে না দেন কিন্তু আমার সে আবেদন অরণ্যে রোদন হ'ল বিমাতা দেখলেন এ বিবাহ হলে সংসার হতে পড়ার খরচটা বেঁচে যাবে। তিনি পিতাকে বার বার বলতে লাগলেন—আমি যদি এ বিবাহ না করি তবে আমার পড়ার খরচ বন্ধ করে দেওয়া হউক আর আমি বাড়ীতে যেন না উঠতে পারি কিন্তু আমি তাও স্বীকার করলুম তবু সে বিয়ে স্বীকার ক'রলাম না। বিবাহ হলনা কিন্তু সেই ভদ্রলোক অন্য এক ছাত্রের ব্যয় বহন ক'রবেন এই প্রলোভনে মুগ্ধ করে বিবাহ দিলেন বিবাহের দুই মাস পরেই পড়ার খরচ দেওয়া দূরে থাকুক কলেজের ৫৲ টাকা মায়নাও আর দিলেন না। এক বৎসর পরেই ছাত্রটীও পড়ার দায় এড়াইয়া শ্রীমতিকে লইয়া স্বশরীরে স্বর্গ পাইলেন, পড়ার ভার ত তা'রা নিলেনই, অধিকন্তু আর একটা ভার ছাত্রটীর ঘাড়ের উপর পড়ে তা'র ঘাড় ভেঙ্গে যেতে লাগল; এইত প্রতারণা

অনেক পিতা মাতা তাঁদের পুত্র কন্যাগণকে গরু ছাগলের মতই ধারণা করেন তাদের যে একটা বিবেচনা শক্তি আছে এ তাঁরা মনেই করেন না আমার মনে হয় বিবাহ কার্য্যে,– জীবনের সব চেয়ে বড় বিবেচনার দরকার যে কাজে,—তাতে তাদের মত লওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। মনে করুন, অনেক বৃদ্ধ পিতামাতা,—যাঁদের বার্দ্ধক্য হেতু দুনিয়ার ভাল মন্দ বিচারের শক্তি হ্রাস হয়ে গেছে, তাঁদের ইচ্ছামত ছেলে মেয়ের বিবাহ দিলেন তাঁরা হয়ত আর ২ ১ বৎসরের মধ্যেই দুনিয়ার মায়া কাটাইয়া বেহেস্তে গেলেন—কিন্তু পুত্রের বা কন্যার অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকলো স্ত্রী বা স্বামীর সঙ্গে; তাঁরাই এ নিয়ে হয় চিরসুখী বা চিরদুঃখী হবে। তবে আমি একথা বলিনা যে তারা পিতামাতাকে কোন কথা না জানিয়ে নিজের ইচ্ছামত বিবাহ করুক তবে পিতামাতা

বা অভিভাবক যে গরুর মত গলায় দড়ি দিয়ে লয়ে আর একটা অমিল গরুর সঙ্গে জুড়ে দিলেন এটা বড়ই অন্যায়। এতে অনেক সংসারে অশান্তির আগুন জ্বলে থাকে অনেক জীবন দোজখে পরিণত হয় আমি এ ব্যবস্থার ঘোর প্রতিবাদ করি

দরবেশ সাহেব নাস্তা খাইতে খাইতে ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বিরক্ত মুখে বলিলেন—কিন্তু মৌলবী সাব একেবারে আজকালকার পাশ্চাত্য অনুকরণে বিয়ে দেওয়ার ফলটা যে কত খারাপ তা বোধ হয় আপনি ভেবে দেখেন নি ?

আব্দুলকাদের আর একটু ফিরনী রেকাবীর উপর উঠাইয়া দিতে দিতে বলিলেন—জোনাব আমি এ খুব ভেবেছি। আমি তা একশবার স্বীকার করি যে, ঐরূপ যুবক-যুবতীকে এক স্থানে উশৃঙ্খল ভাবে রেখে কোর্টশিপ করে বিযে দেওয়া কোন মতেই সঙ্গত নয়। তার ফল অনেক সময় খুবই বিষময় হয়। আমি এরূপ বিবাহের সম্পূর্ণ বিরোধী কিন্তু আমি বলি যে মানুষকে মানুষ হিসাবে ধ'রে জীবনের সুখ দুঃখের আকর বিবাহটা বেশ চিন্তা করে দেওয়া উচিত ছেলে মেয়েকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করে বা তাদের বিবেচনা ক'রবার সুযোগ ন দিয়ে, নিজের ইচ্ছামত গলায় দড়ি দিয়ে বিক্রী করা উচিৎ নয় মানুষকে মানুষের হিসাবে হিসাব করা উচিৎ ছেলেগুলি সব বাকহীন পশু নয়, মেয়েগুলিও সব গরু নয়।

দরবেশ সাহেব সন্তুষ্ট মুখে বলিলেন—আপনার একথার সঙ্গে আমি এক মত ; আমাদের শাস্ত্রে এ কথা আছে, কিন্তু তার ব্যবহার মুসলমান সমাজে একেবারেই নাই এ অন্যায়ের বিষবাণ যে আমাদের বুকে এসেই পড়ছে মৌলবি সাব !

'সে আবার কি দরবেশ সাব ?'

দরবেশ সাহেব বলিলেন—আপনার প্রতি হচ্চে কিনা জানি না কিন্তু আমার এবং নুরনের প্রতি যে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে তা বড় মর্ম্মান্তিক। খোদার উপর নির্ভর করে আছি দেখি কি হয়

আব্দুলকাদের —অনুগ্রহ করে খুলেই বলুন না নুরন ত আমার পর নয়?

দরবেশ সাহেব —পর নয় বলেইত' বলতে বেধে আসছে আমি জানি আপনি নুরনের পর নন যদিও জানতে পারি নাই নুরন আপনার পর কি আপন। আমাকে লোকে দরবেশ সাহেব বলে ডেকে আমাকে অপমান করে কেন জানি না। আমি একজন ঘোর সংসারী তবে সংসারে থেকে, সংসারের কাজ কর্ম্ম করে দরবেশ নাম লওয়া যদি সম্ভব হয় তবে আমি সে নাম বহন করতে লজ্জিত নই। কেননা আমার মনে হয়, দুনিয়ায় থেকে দরবেশ হওয়া অধিক গৌরবের, যদিও ধরে নিন আমি থিঁচুড়ি দরবেশ। নুরনের সঙ্গে আপনার বিবাহ হয় এ আমার ইচ্ছা নুরনেরও ঐকান্তিক কামনা, কিন্তু—

আবদুলকাদের যদিও কখনও প্রকাশ্যভাবে নুরনকে পত্নীরূপে মনের উপর অঙ্কিত করে নাই কিন্তু মনের উপর ছবিটী অজ্ঞাতসারে এতখানি আঁকা হইয়া গিয়াছিল যে আজ দরবেশ সাহেবের "কিন্তু" রূপতুলি তাহা সম্পূর্ণ করিয়া দিয়া তীরের মত যাইয়া বুকে বিঁধিল

এমন সময় তাজেম মণ্ডল আসিয়া লাঠিখানা ফেলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে মাটিতে বসিয়া পড়িল তাহার কোটরাগত চক্ষু দিয় অবিরাম অশ্রুধারা গড়াইতেছে হৃদপিণ্ড ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছে, মাংসহীন শুষ্ক পিঞ্জরের মধ্য দিয়া সে স্পন্দন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে আবদুলকাদের উৎসুক নয়নে, ব্যস্ত-হৃদয়ে তাজেমকে তাহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সহানুভূতির বায়ুতে ধুমায়িত ক্রন্দন জ্বলিয়া

উঠিল সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—হুজুর একবার চলুন,—দেখুন আজ আমার কি দশা। আজ ৩ দিন অনাহারে আছি তাতে দুঃখ নাই—কিন্তু একবার যেয়ে দেখুন আমার একটী ছেলে আমাদিগকে ছেড়ে চিরদিনের মত ঘুমুচ্ছে। তাকে ঘরের মধ্যে ছালা দিয়ে ঢেকে রেখেছি আমার মেয়ের বিয়েতে গ্রামের লোকেদের খেতে দিতে পারি নাই বলে তারা কবর দিচ্ছে না আবার ছোট ছেলেটীও বোধ হয় এতক্ষণে আমাদের ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে গেছে তার ধাত পড়ে গেছে আমি দেখে এসেছি। হাতে এমন একটা পয়সা নাই যা দিয়ে তাকে ওষুধ খাওয়াই অনেকের কাছেই হাত পেতেছি—আমি দিতে পারব না বলে, চার আনার পয়সাও কেউ ধার দিল না পয়সা অভাবে ছেলেটার কাফনের কাপড়ের ব্যবস্থা করতে পারলুম না তারপর গ্রামের লোকেও মাটী দেবেনা

চল যাই বলিয়া দোয়াত কলম লইয়া আবদুলকাদের লিখলেন—"মহাশয়, আমি মৃত্যুশয্যায়, পত্র পাঠ কালবিলম্ব না করিয়া আসিলে চিরবাধিত হইব" পত্রখানা চাকর দ্বারা ডাক্তারের নিকট পাঠাইয়া দিয়া তিনি দ্রুতপদে তাজেমের গৃহাভিমুখে ছুটিলেন। দরবেশ সাহেব দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার সঙ্গ লইলেন যাইয়া দেখেন—হায়, কি দৃশ্য! পাঠক পাঠিকা ঐ দেখুন কাপড় অভাবে অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় গৃহমধ্যে রোরুদ্যমানা মাতা মাটির উপর গড়াগড়ি যাইতেছে, আবার উঠিয়া পীড়িত পুত্রের মুখে পানি দিতেছে পুত্র বিকার অবস্থায় বলিতেছে,—মা ওষুধ দাও এই ওষুধ লও বলিয়া মাতা পুত্রের মুখে একটু পানি ঢালিয়া দিতেছে বাড়ীতে একখানা মাত্র ঘর তাহাও এত ক্ষুদ্র যে মৃত পুত্রকে একটু দূরে রাখিবার ও স্থান নাই মৃত এবং অর্দ্ধমৃত উভয় পুত্র একই শয্যায় শায়িত। বৃষ্টি পড়িতেছিল গৃহের অনেক স্থলে

খড় পচিয়া গিয়াছিল। মাঝে মাঝে যখন বৃষ্টির পসলা আসিতেছিল ঝপ্‌ঝপ্‌ করিয়া বৃষ্টির পানি পড়িয়া পুত্রদ্বয়ের গাত্র সিক্ত করিয়া দিতেছিল।

তাঁহারা উপস্থিত হইলেন বটে কিন্তু হঠাৎ গৃহমধ্যে যাইবার উপায় নাই। মাতার পরিধানে এমন কাপড় নাই যাহা পরিয়া সে তাঁহাদের সম্মুখে থাকিতে পারে তাঁহারা একটু দূরে আড়ালে গিয়া দাঁড়াইলে— তাজেমের স্ত্রী বাহির হইয়া ঘরের পিছনে কলা গাছের ঝোপের মধ্যে গিয়া বুক কুটিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাঁহারা গৃহমধ্যে যাইয়া দেখেন— জীবিত পুত্রেরও অন্তিমকাল উপস্থিত হস্তপদ শীতল দরবেশ সাহেব রোগীর মস্তক কোলে উঠাইয়া লইয়া বসিলেন। উভয়ে সেই অগতির গতি বিপদবারণ খোদাতালাকে কায়মনবাক্যে ডাকিলেন— এয়া দাফেওল বালাইয়াতে। এয়া শাফি ল—আম্‌রাজে (১) তুমি কোরানে বলেছ—তুমি মৃতকে জীবিত করতে পার—তুমি তোমার এই ক্ষুদ্র নগণ্য বান্দার আবেদন শুনে একে বাঁচিয়ে এই বৃদ্ধ বৃদ্ধার প্রাণে শান্তি দাও খোদা! খোদা বুঝি সে প্রার্থনা শুনিলেন বৃদ্ধ বৃদ্ধার নিরাশা তিমিরাচ্ছন্ন ভগ্ন কুটীরে ক্ষীণ আশার আলোক জ্বলিল (২) নিমজ্জমান জীবন তরণী হঠাৎ কোন একটা ঝড়ের ঝাপ্‌টা আসিয়া নদীর চড়ায় ফেলিয়া দিয়া গেল নাড়ীর ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল—আবার নাড়ী খেলিতে লাগিল জীবনের আশঙ্কাজনক লক্ষণ সকল কোথায় চলিয়া গেল

---

(১) সর্ব্বরোগ-সন্তাপ-হারক

(২) Mo e things are wrought by pray:rs than th's wo.ld dreams of.—Tennyson.

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার উপস্থিত হইয়া বলিলেন—সাহেব আগে যদি জানতুম, আপনার পীড়া নয়, তা হলে এখন কিছুতেই আসতুম না এরা আমার ভিজিট দেবে কোথা থেকে

আবদুল কাদের —হাঁ মশায় আমারই ত পীড়া, ঐ ঘরের মধ্যে দেখুন আমারই ত ব্যারাম হয়েছে আমি মানুষ তাজেমের পুত্র কি মানুষ নয়? যতদিন তাজেমের ছেলে আরোগ্য না হবে ততদিন আমার পীড়া সারবে না "আমি" আর "সে" এতে প্রভেদ কি মশায় যেদিন 'আমি' আর 'সে' এ প্রভেদ মানুষ ভুলে যাবে সেদিন এ পৃথিবী বেহেস্ত হবে ডাক্তার আর কোন কথা না বলিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—আশাপ্রদ এখন জীবনের আশঙ্কা নাই

ডাক্তারকে ভিজিটের টাকা দিবার জন্য আবদুলকাদের পূর্ব্বেই তাঁহার একটা অঙ্গুরী বন্ধক রাখিয়া টাকা আনিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা ডাক্তারকে দিলে ডাক্তার সন্তুষ্ট মুখে টাকা গ্রহণ করিয়া ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন

তাঁহারা কোদলী লইয়া মৃত পুত্রটীকে সমাহিত করিবার জন্য কবর প্রস্তুত করিলেন। বৃদ্ধ পিতা মাতার বিদীর্ণ বক্ষ খণ্ডিত করিয়া, শোকের প্রবল-অশনিপাতে হৃদয় দুখানি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ভীষণ শোকতরঙ্গের উপর তাহাদের জীর্ণশীর্ণ-অনাহারক্লিষ্ট-অর্দ্ধনগ্ন দেহ দুখানি জোরে নিক্ষেপ করিয়া আবদুলকাদেরও দরবেশ সাহেব মৃত পুত্রটীকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া গোছল দিলেন তাহাদের হাহাকারে মেদিনীর নির্ম্মম বক্ষ বুঝি কাঁপিতে লাগিল গ্রামের লোকের দয়াবান হৃদয়গুলি একটুও টলিল না। তাহারা কেহই বাড়ীর আঙ্গিনায় পদক্ষেপ করিল না। আবদুলকাদের বাড়ী হইতে একটা পরিষ্কার চাদর আনিয়া কাফনের ব্যবস্থা করিলেন। কাপড়ের কিঞ্চিৎ অভাব হওয়ায় দরবেশ সাহেব

নিজের পাগড়ি ছিঁড়িয়া সে অভাব পূর্ণ করিলেন তাজেমপুত্র কবরস্থ হইল পাড়ার লোকে বলিতে লাগিল—দেখ আব্দুলকাদের মিয়ার কি প্রবৃত্তি! যে তাজেমকে তিনি চাকর রাখেন না, তার ছেলেকে নিজে ঘরের মধ্যে থেকে বের করে এনে নিজ হাতে গোছল দিয়ে; নিজে কবর খুঁড়ে মাটি দিলেন এক প্রতিবেশী বলিল—আমারও ইচ্ছে হ'ল আমি যেয়ে সাহায্য করি, কিন্তু তোমাদের ভয়ে তা' পারলাম না। আমার মনে দুঃখ হচ্ছে কেন আমি যাই নাই তোমাদের সমাজকে আজ যদি পদাঘাত করে যেতে পারতাম তা হলে বোধ হয় একটা কাজ করতাম

পরিচ্ছেদ

(৯)

আহারান্তে দরবেশ সাহেব নৌকাযোগে চলিয়া গেলে আব্দুলকাদের এশার নামাজ অন্তে শয্যায় স্থান লইয়া ভাবিতে লাগিলেন---দুনিয়ার একি অবস্থা! মানুষের মনুষ্যত্ব কোথায়? গরীবের দিকে কেহ ফিরিয়াও চায় না বরং তাদিগকে নানা নিপ্পেষণে নিষ্পেষিত করিতে পারিলে মানুষের আনন্দ হয় এর নাম সমাজ "নিজেকে বাঁচাও পুত্র কন্যা ভাই ভগ্নিকে রক্ষা কর, নিজে জ্ঞান লাভ কর, অন্যকে জ্ঞান দাও, পরের জন্য বিপদে ঝাপ দিয়ে পড়; এর নাম সমাজ" (১) মুসলমান এগুলিকে বহুদিন পূর্ব্বে যেমন আকড়াইয়া ধরিয়াছিল—আজ সেই সমাজ বৃদ্ধ তাসমের কন্যা বিবাহে চুব্য চুষ্য আহার করিতে পায় নাই বলিয়া তাহার পুত্রকে কবরে ও দিল না; ধিক এ সমাজের!—

তিনি ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রাভিভূত হইলেন কয়েক জন দুর্ব্বৃত্ত এই সময়ে সিঁদ কাটিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজার খিল খুলিয়া দিল। রাহাজান ও তাহার সঙ্গীগণ আবদুলকাদেরের দিকে অগ্রসর হয় আবার ফিরিয়া আসে রাহাজান চুপে চুপে বলিল—ফিরে যাই পারব না,—না ফিরব না, ঐ ত ঘুমুচ্চে, কছির তুমি দাও লও, আমি গলা চেপে ধরব, দুই তিনবার আঘাত দিলেই ত কাজ ফরসা! ছগিরের পক্ষে দাড়িয়ে আমাদের জেলে দিতে চেষ্টা করার প্রতিশোধ। খলিল গৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল তাহার মনে হইল কে যেন ঝোপের মধ্য হইতে এ সকল দেখিতেছে। ঐ ত ঝোপটা নড়িল। ঝোপের মধ্যে যেন একটা শব্দ হইল খলিল ভাবিল—কেউ আমাদের অনুসরণ করেছে, আর কেন!

---

(1) Encycto-Britanica—Page—619.

নিজের প্রাণটা লয়ে সরে পড়া যাক সে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল তাহার মনে হইল তখনও কে যেন তাহার অনুসরণ করিতেছে সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাড়ী পৌছিল যখন বিছনায় শুইল তখনও তাহার যেন মনে হইল কে গৃহ কোণে দাঁড়াইয়া আছে

সহসা আবদুলকাদেরের গল দেশে চাপ লাগিয়া তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল চাহিয়া দেখিলেন—কৃতান্ত যমদূত স্বরূপ ৪ ৫ জন লোক সম্মুখে দণ্ডায়মান সকলের মুখই বস্ত্র দ্বারা আবৃত কাহারও হস্তে লাঠি, কাহারও হস্তে দা, কাহারও হস্তে ছুরিকা তিনি একবার মাত্র চীৎকার করিয়া উঠিলেন সকলে আসিয়া দেখিলেন;—কি সর্ব্বনাশ! আবদুলকাদের শয্যার উপর লুণ্ঠিত অবস্থায় পড়িয়া আছেন। বাহুমূল দিয়া অবিরাম রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে; উরুদেশ দিয়া রক্ত বহিয়া শয্যায় উপর ঢেউ খেলিতেছে। আবদুলকাদের বলিলেন—ভাইগণ, এই আমার অন্তিমকাল, আমি এরূপ আশাও করেছিলাম একবার সুরন এসে যদি আমাকে শেষ খোদার নাম শুনাত তবে আমি সুখে মরতে পারতাম এরজন্য হয়ত আমাকে কেহ কটাক্ষ করবেন কিন্তু সে জন্য আমি দুঃখিত নই, কেননা খোদার নিকট আমি এর জন্য দোষী নই সুরুনকে এখন লইয়া আসা সম্ভব নয়। সুতরাং সে কথায় আর দরকার নাই কোনও পৃথিবীতে তার সঙ্গে দেখা হতে পারে খোদা,—রছুলের শাফায়ৎ—। যেন— অধিক রক্তস্রাব জন্য ক্রমে ক্রমে তাঁহার জ্ঞান বিলুপ্ত হইল আর কথা বলিতে পারিবেন না অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হওয়ায় পরদিন কলিকাতা মেডিকেল কলেজে তাঁহাকে প্রেরণ করা হইল

বিদ্যুৎ-আলোক-উদ্ভাসিত বাগাখানা, তবু যেন শ্মশান! দাস দাসী পরিপূর্ণ প্রকোষ্ঠ, তবু যেন শ্মশান। দুগ্ধ ফেন-নিভ শয্যা তবু যেন কণ্টক!

অপ্সরা-বিনিন্দিত শুশ্রূষাকারিণী তবু সব অধীর এমন আলোকিত,—দাস দাসী,—শুশ্রূষা-কারিণী-পরিপূর্ণ শ্মশানে এমন কঠিন-কোমল কণ্টক-পুষ্প শয্যায় আবদুলকাদের আজ শায়িত

যেখানে কর্ম্ম জীবনের আশার ক্ষীণ প্রদীপ কখনও বা প্রজ্বলিত কখনও বা ধূমায়িত কখনও বা নির্ব্বাপিত, যেখানে জীবন বীণার সুর কখনও বা লুপ্ত কখনও বা জাগ্রত কখনও বা নিদ্রিত কর্ম্মক্লান্ত দেহ গুলি যেখানে রোগের নিষ্পেষণে প্রপীড়িত, আজরাইল ফেরেস্তা যেখানে অধিক কর্ম্মে ক্লান্ত, যেখানে রোগিগণের আত্মীয় স্বজন আসিয়া কি যেন দেখি এমন চিন্তায় বিব্রত, এমন প্রকোষ্ঠে আবদুলকাদের আজ নিদ্রিত।

রাত্রি ১টা নিকটে শুশ্রূষাকারিণী ভিন্ন কেহ নাই আবদুলকাদের আজ ২ দিন পর আবার চক্ষু মেলিলেন। দেখিলেন—পাশের শয্যা সমূহে কেহ ক্রন্দন করিতেছে, কেহ কাতর শব্দ করিতেছে; কেহ আসন্ন মৃত্যু জানিয়া প্রাণ ভরিয়া খোদাকে ডাকিতেছে পার্শ্বের এক শয্যায় এক ব্যক্তির প্রাণ বায়ু উড়িল, বাহকগণ তাহাকে ফেলিয়া দিবার জন্য খাটুলি আনিল, শব লইয়া প্রস্থান করিল তিনি দেখিলেন তাঁহার ক্ষত স্থানে কে এক রমণী বসিয়া ঔষধ প্রক্ষেপ করিতেছে তাঁহার জ্ঞানের সঞ্চার হওয়ায় পূর্ব্ব ঘটনার সমস্ত স্মৃতি আসিয়া তাঁহার মস্তিষ্কে আলোড়ন দিল,—তিনি আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

পরদিন যখন উষা-সমাগম-সূচক-শীতল-বায়ু জানালার মধ্য দিয়া আসিয়া তাঁহার পীড়িত শরীরে ঔষধবৎ এক একবার স্পর্শ দিতেছিল—তখন আবার তাঁহার জ্ঞান সঞ্চার হইল বেলা ৮ টার সময় দরবেশ সাহেব আসিয়া দেখা দিলেন।

(১০)

নুরন্নেহারের কর্ণে এ ভয়াবহ সংবাদ পৌঁছিলে নুরনের মানসিক অবস্থা বুঝিতে পাঠক পাঠিকার কোন আয়াস করিতে হইবে না। সুতরাং তাহা বাদ দিলাম।

নুরন্নেহারের বিবাহ জোনাব আলীর সহিত প্রায় স্থির হইয়াছে। আবদুলকাদেরের সঙ্গে নুরনকে বিবাহ দিবার প্রবল ইচ্ছা থাকিলেও সিকদার সাহেবের জ্ঞানবুদ্ধি নুরনের মাতুলের প্ররোচনায় এবং রৌপ্য নির্ম্মিত গোলাকার পদার্থের আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে লোপ পাইল জোনাবালীর অবস্থা ভাল, আত্মীয় স্বজন দূর সম্পর্কীয় হইলেও তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের মত লওয়া হইল কিন্তু যে বিবাহ করিবে অর্থাৎ নুরনকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করা কেহই দরকার বোধ করিলেন না।

বিবাহের জিনিষ পত্র কিনিবার অভিপ্রায়েও আবদুলকাদরকে দেখিবার জন্য সিকদার সাহেব কলিকাতায় যাইবেন, স্থির করিলেন রাত্রিতে নুরন আবদুররহিমকে কলিকাত যাইবার জন্য খোঁচাইয়া তুলিল এবং আবদুলকাদের মিঞাকে দিবার জন্য ১০০ এক শত টাকার একখানা নোট তাহার বুকের পকেটে শেলাই করিয়া দিল কি ভাবে তাহাকে দিতে হইবে সে সকল উপদেশ দিতে ত্রুটি হইল না। পিতার অসাক্ষাতে টাকা কয়টি যাহাতে আবদুলকাদের মিঞাকে দেওয়া হয় এরূপ আদেশ দেওয়া হইল। আবদুররহিম নুরনের বড়ই স্নেহের ভাই। মাতার মৃত্যুর পর নুরনই তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিতেছে আবদুর রহিম কলিকাতা যাওয়ার কথাটি অতি কষ্টে ভুলিয়া রাত্রে নিদ্রা গিয়াছিল পরদিন অতি সকালে পিতা যখন নামাজ পড়িবার জন্য ওজু করিতেছিলেন—

বুদ্ধিমান পুত্রটী পিতার নিকট কলিকাতা যাইবার প্রস্তাব করিল। পিতা যখন বুঝাইলেন যে,—সে ছেলেমানুষ, তাহার কলিকাতা যাইবার দরকার নাই,—তখন তাহার ক্রন্দন শুনিয়া পশুপক্ষীও বুঝি কাঁদিতে লাগিল। পিতা অগত্যা তাহাকে লইয়া যাওয়াই স্থির করিলেন।

সকাল ট্রেণ ধরিবার জন্য ভজন সিং ও জিতু মের্দ্ধা বরকন্দাজদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া রওয়ানা হইলেন

এক মাইল পথ অতিক্রান্ত হয় নাই,—আবদুর রহিম আরম্ভ করিল—বাপজান, কলিকাতায় কি কি আছে? সেখানে অনেক মিষ্টি খেতে পাওয়া যায় কেমন?

নুরন যে টাকা দিয়াছিল এ কথা তাহার পেটের মধ্যে ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতেছিল। সে বলিল—বাপজান, বুবু— ও, না—বল্‌ব না—। নুরনের নিষেধাজ্ঞা একবার তাহার মনে পড়িল কিন্তু পরক্ষণেই তাহা উড়িয়া গেল সে বলিতে লাগিল—না বলি না বলবই না,—একটা জিনিষ—তাই সেলাই করে—না কিছুতেই বলব না—আমার পকেটে—আবদুল কাদের মিঞা।

সিকদার সাহেব সে কথায় কর্ণপাত করিতে অবসর পাইলেন না। তাঁহারা ষ্টেশনে পৌঁছিলেন। গাড়ীও আসিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। তাড়াতাড়ি টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। গাড়ী, সুখ দুঃখ পরিপূর্ণ মানব হৃদয়গুলি উদরের মধ্যে পুরিয়া কলিকাতা অভিমুখে দৌড়াইল।

সিকদার সাহেব কলিকাতা পৌঁছিয়া আবদুলকাদেরের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে অনেক আশা ভরসা দিলেন। আবদুর রহিমের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে আবদুলকাদেরের পীড়িত দেহ ক্লান্ত হইয়া পড়িল।

মনোবিজ্ঞানে যে বয়সকে কৌতূহল জীবন (১) বলে, আবদুর রহিম সেই বয়সে পৌঁছিয়াছে সংসারের সকলই তাহার নিকট নূতন। দুনিয়ার বিশেষ কিছু সে জানে না,—সব জানিতে চায়, কিছুই দেখে নাই,—সব দেখিতে চায়,—কিছুই বোঝে না, সব বুঝিতে চায়।

একদিন পর আবদুর রহিম পিতার আদেশানুযায়ী ভজন সিংকে সঙ্গে করিয়া আবদুল কাদেরকে দেখিতে গিয়া নুরনের প্রদত্ত ১০০৲ একশত টাকার নোটখানি তাঁহার হাতে দিল এবং তাঁহারই জন্য তাহার বুবু যে ইহা দিয়াছে তাহাও বলিল। আবদুল কাদের কিছুতেই সে টাকা লইলেন না আবদুর রহিম টাকা লইবার জন্য তাঁহাকে বক্তৃতাহত করিতে লাগিল, কিন্তু সে বক্তৃতায় যখন দেশও জাগিল না, তিনিও সাড়া দিলেন না, তখন অগত্যা "বুবু আমাকে গালি দিবেন" বলিয়া টাকা পকেটে রাখিয়া এবং ভজন সিংএর হাত ধরিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

এই কঠোর হাসপাতালে কি এক অব্যক্ত মধুর প্রবাহ আসিয়া আবদুল কাদেরের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে স্পর্শ দিল কি এক ভাষাহীন ভাব তাঁহার মনের উপর ঢেউ খেলিতে লাগিল। কোন দিন যে তাড়িৎপ্রবাহে আঘাত পড়িয়াছিল, আজ সেই প্রবাহে যেন স্পষ্টবার্ত্তা আসিল তিনি ভাবিলেন—এ কঠিন দুনিয়ায় এ আবার কি কোমল হস্তের স্পর্শ। খোদার এ ভীষণ দুনিয়ায় তাঁর আবার একি পরম স্নেহের দান এ ঘোর অন্ধকারময় আমার জীবনে এই ব্যাকুলতার মধ্য দিয়া কি স্নিগ্ধ আশার কিরণ। খোদার এ যে অপার্থিব দান! এ-হস্তের স্পর্শে আবার বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়!

(১) Period of curiosity

আবার ভাবিলেন—এ যে নুরনের ভালবাসার টান—তাই বা দিবা করিয়া কে বলিল ? হইতে পারে, সাধারণ উপকারের প্রেরণায় আমার এই বিপদের কথা শুনিয়া টাকা পাঠাইয়া থাকিবে আর সত্যই যদি সে ভালবাসিয়া থাকে তবে সে বড়ই ভুল করিয়াছে আমি নিঃসহায় অর্থহীন। সে বড় লোকের কন্যা। একজন পথের কাঙ্গালকে যদি কোন বাদসাহ কন্যা ভালবাসে তবে তার মত মূর্খ আর কে আছে ? এ জগৎটা বাস্তবতাহীন, উপন্যাসের রাজ্য নহে এ বাস্তব-জীবনের নাট্যশালা বড় নির্ম্মম। সত্য, জীবন্তও মানুষ আমরা, সম্ভব অসম্ভব বলিয়া দুনিয়ার যে সত্যকার কথাটা আছে তাহা পদদলিত করিয়া চলা আমাদের পক্ষে বড়ই কঠিন বা অনেক সময় অসম্ভব। নেপোলিয়ন বলিতে পারিতেন অসম্ভব বলিয়া দুনিয়ায় কিছু নাই, কিন্তু সেণ্টহেলেনা দ্বীপে তিনিও অনেক অসম্ভবের হাত এড়াইতে পারেন নাই তবে মনের বিকারজ অসম্ভবগুলি সম্বন্ধে পৃথক্ কথা।

পরদিন সিকদার সাহেব আবদুল কাদেরকে দেখিতে আসিলেন অন্যান্য কথার পর তিনি বলিলেন,—বাবা তুমি বোধ হয় শুনেছ যে আমি আমার শ্যালকদের কথা মত নুরনকে এক পশুর হাতে দিতে যাচ্ছি। আমার মন বড় দুর্ব্বল, তাই তাদের কথ মত নিজের বিবেককে বিকিয়ে দিচ্ছি বাবা, এখনও যদি একটা ভাল ছেলে পাই, তবে এ জঞ্জাল ঝেড়ে ফেলি।—এই দুই দিনের মধ্যে আশা ও নিরাশা আবদুল-কাদেরের হৃদয়খানিকে গড়িতেছিল, ভাঙ্গিতেছিল

সিকদার সাহেবের মন আবদুল কাদেরকে বলিতে বলে—আবদুল-কাদের এ বিবাহ করিতে এখন সম্মত কি না, কিন্তু লজ্জা আসিয়া উভয়ের মনোগত ভাব বাহির হইতে দিল না।

আমাদের দেশে কি এক অন্যায়ের ঢেউ সমাজে বহিতেছে, যাহার ফলে ভীষণ অনর্থ ঘটিতেছে পার্থিব জীবনের—ধরিতে গেলে পারলৌকিক জীবনেরও যাহা একটি বড় সত্য, বড় জিনিষ তাহাতে লুকাইবার বা লজ্জা করিবার প্রয়োজন কি আছে? আর ইহা কি জ্ঞান-সঙ্গত না ধর্ম্ম-সঙ্গত

অন্য লোকের বা কাণ্ডজ্ঞানহীন ঘটকের সাহায্য না লইলে আমাদের দেশে পুত্র কন্যাগণের বিবাহ হয় না এই অন্য লোকের অজ্ঞানতা, চতুরতা বা ইচ্ছানুযায়ী কথা বলিবার বা শয়তানীর জন্য অনেক পিতামাতার সাধ, অতল জলধি তলে ডুবিয়া যায় অনেক পুত্র কন্যার হৃদয় ভাঙ্গিয়া মুচড়িয়া যায়।

আমি বলিব—আপনার কন্যাকে আমি বিবাহ করিতে চাই বা চাই না। তিনি বলিলেন—আমার কন্যাকে আপনার সহিত বিবাহ দিতে চাই বা চাই না ইহাতে লজ্জা করিবার কি আছে? সিকদার সাহেবের কথায়—আবদুল কাদের একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া রাখিয়া বলিলেন—আপনি যদি বলেন আমি নুরনের জন্য আমার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে একটা ভাল ছেলে দেখব। হৃদয়খানি ছিন্ন হইয়া কথাটা বাহির হইল

সিকদার সাহেব বরকন্দাজগণসহ বাহির হইয়া ফুটপাথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে এক বরকন্দাজ "বাঘ! বাঘ! ওরে বাবা বাঘ মলামরে" বলিয় চীৎকার করিয়া এক লাফে সিকদার সাহেবের গায়ের উপর আসিয়া পড়িল এমন সময় একখানা ব্যাঘ্র-শকবাহী মটরগাড়ী ধার দিয়া চলিয়া গেল। এই বীর বরকন্দাজকে উঠাইয়া লইয়া ভাড়াটীয়া গাড়ীতে তাঁহারা বাসায় পৌঁছিলেন।

অপরাহ্নে রফিকল এসলাম ও রমেশ, আবদুল কাদেরকে দেখিতে

আসিল। রফিক ও রমেশ সহপাঠী উভয়েই এম-এ পাশ করিয়া আইন পড়িতেছে। আবদুল কাদের রফিককে তৈয়ম করিবার জন্য একটু মাটি আনিতে অনুরোধ করিলেন রফিক বলিল,—এত অসুস্থ শরীরে তোমার আবার নামাজের দরকার কি? নামাজ, রোজা সুস্থশরীরের কাজ আবদুল কাদের অনেক দিন হইতে রফিকের মধ্যে ধর্ম্মহীনতা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি বলিলেন,—ভাই রফিক, তোমাদের সঙ্গে কথা বল্‌তে এত সময় কাটাচ্ছি; আর নামাজ পড়াটাই আমার এত কষ্ট হল। বর্ত্তমান শিক্ষা আর ধর্ম্মহীনতা বড় দুস্তি এটে বসেছে ইউনিভার্সিটীর এক একটা পাশ করে ফেলে মনে করোনা বেহেস্তের দরজা তোমাদের জন্য খুলে গেছে জীবনের ওপারের দেশটা ইউনিভার্সিটীর শাখা নয় সিনেট হাউসের বড় দরজাগুলি তোমাদের জন্য খোলা হলেই শান্তির দরজা তোমাদের জন্য খোলা হল না—যাক ভাই মেহেরবানী করে তুমি একটু মাটি এনে দাও আমার নামাজের ওয়াক্ত যাচ্ছে।

কল্‌কাতা সহরে এত সহজে মাটী পাওয়া যাবে কোথায়? বলিয়া রফিক তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল এখানে এত সহজে যে মাটি পাওয়া যায় না তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আবদুলকাদেরও এ ভুল অনুরোধের জন্য লজ্জিত হইয়া একটু হাসিয়া উঠিলেন, এবং পূর্ব্ব সংগৃহীত মাটির অতি সামান্য অংশ টুলের উপর ছিল তাহাতে তৈয়ম করিয়া আছরের নামাজ আদায় করিলেন কয়েকবার কলেমা ও দরুদ তেলাওত করিয়া বলিলেন—রফিক, তুমি বোধ হয় ইতিহাসে দেখেছো মুসলমান সৈন্যগণ মিশর জয় করতে গিয়েছিলেন।—নামাজের সময় সমাগত দেখে তাঁহারা ভীষণ যুদ্ধের কলরব থামিয়ে অস্ত্র কোষবদ্ধ করে, আল্লাহো আকবার বলে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। এদিকে শত্রুগণ

সুযোগ বুঝে কলাগাছের মত মুসলমানদের মাথা একে একে ভূমিতে পাড়িতে লাগল কিন্তু যতক্ষণ নামাজ শেষ না হল একটী মোসলেম সন্তানও নড়ল না এটা গল্প নয়, এটা অতি সত্য ইতিহাস। তাঁরা এমন মোছলমান ছিলেন বলে—এসলামের সত্য আলোক তাঁদের সামনে এসে দেখা দিয়েছিল। অতি পূর্ব্ব কাল হতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত ইতিহাস দেখ এর ভূরি ভূরি প্রমাণ পাবে শারীরিক দৌর্ব্বল্য হেতু আবদুল-কাদেরের কথার মধ্যে জড়তা আসিলেও তিনি বলিতে লাগিলেন—রফিক, এসলামেররূপ কঠোরতার মধ্য দিয়াই প্রকাশ পেয়েছে আমাদের পয়গম্বরের মৃত্যুর কিছু পূর্বেও তিনি অতি দুর্ব্বল শরীর লয়ে আছহাবদের কাঁধে ভর করে মছজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করেছেন ভীষণ কারবালা প্রান্তরে যেদিন হজরত এমাম হোছেনের বুকের উপর সীমার অসি হস্তে দণ্ডায়মান—সে সময়ও তিনি নামাজের কথা ভুলেন নাই তখনও তিনি বলেছিলেন—দেখ ভাই সীমার, আমি জানি তোমার হাতেই আজ আমার জীবন প্রদীপ নিভে যাবে, এই অস্ত্র ত্যাগ করলুম—তুমি আমায় নামাজ পড়বার জন্য একটু সময় দাও ভাই।

(১১)

লতিফন বলিল অচ্ছা নুরন—তুই আজকাল আমার সঙ্গে বড় কথা বলিস না এর মানে কি ?

নুরন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—বোন্ তোমার পর আমার একটা বড় ঘৃণা হ'য়েছে। পবিত্রতা সন্তোষ এবং শান্তি এ তোমার মধ্যে দেখ্‌তে পাই না। তোমার বাড়ীটা যেন একটা দোজখ! তোমার স্বামী সেই দোজখে পুড়ে পুড়ে মরছে ? আর তুমি যেন তাই দেখে দেখে হাসছ। তুমি কিছুতেই সুখী নও, তুমি এর থেকে সুখ চাও, তোমার প্রত্যেক কথায় এ ফুটে উঠে যে স্বামী, তোমার জীবনী-শক্তি, তোমার প্রাণের ধন, বেহেস্তের দুয়ার, দুনিয়ার শান্তি, আখেরের পথ, দেহের কান্তি, নিরাশ হৃদয়ের আশার আলোক, প্রেমের তৃপ্তি, গানের সুর, শোকের ক্রন্দন, ক্রন্দনের অশ্রু, নীরবতার গান, অসীম আকাশতলে প্রভাতের কাকলী, সন্ধ্যার সূর্য্য, মধ্যাহ্নের শীতলতা, দুনিয়ার এমন জিনিষ-টাকে, এমন ভাবে দলিয়া পিশিয়া, তার হৃদয়টাকে চুর্ণ কর, এর পরিণাম জান ?

লতিফন ব্যঙ্গ হাসির সঙ্গে বলিল—আরও কিছু বল,—শীতের ঠাণ্ডা গ্রীষ্মের গরম, আর'ও কিছু—আর'ও কিছু—

"হাঁ দুনিয়ায় আরও যদি কিছু আওরতের থাকে তবে সে স্বামী,—"

"তোর ত বিয়ে শীগ্‌গিরই হ'বে, তুই বৈশাখ মাসে পানি খাস না। আর তোর ত স্ফূর্ত্তি, গয়না দিয়ে গা জড়িয়ে ফেলবি, টাকার ত সে কুমীর এমন একটা পেতে যাচ্ছিস্ কি না—তাই তোর অত ভাষার জোর।"

নুরন বিদ্রূপ কটাক্ষ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—তুই আমার এই বড় লোকটা নে না কেন ?

লতিফন তাহার গা টিপিয়া দিয়া চুপ করিয়া রহিল ।

সত্য বলছি—লতিফন, আমাকে এরা দোজখে ফেলে দিচ্ছে । এরা তার টাকা আর গহনা দেখে ভুলে গিয়ে আমার সর্ব্বনাশ করার জন্য তলোয়ার ধার দিচ্ছে এমন অত্যাচারী, খোদার বিদ্রোহীর বালাখানা আমার কাছে দোজখ ! আমি, খোদা পোরস্ত, সৎলোকের করে, দেহ মন সঁপে যদি কুটীরেও বাস করি সেও আমার বেহেস্ত কি করব বোন্,—এই বিয়েই আমাকে করতে হবে ; উপায় নাই ! আমাদের সমাজে কয়জন পুত্র কন্যার অন্তরের দিকে তাকায় ? কয়জন তা'দিগকে জিজ্ঞাসা করে ? খাড়ে পড়ে য'র বোঝা,—সেই বে'ঝে স'জ' ! অনেক 'পিত' মাত' অর্থ লোভে এমন কাজ করে ফেলেন যে তার পুত্রকন্যার পক্ষে তাহা জাহন্নাম হয়ে ওঠে ছেলে মেয়েদের বিয়ের কথাটা সমাজে যেন ভয়ানক লজ্জার কথা হয়ে পড়েছে বিয়ে ; য খোদার অভিপেত, রছুলের উপদেশ বা ছোন্নত শরিয়তের য' আইন ;—দুনিয়ার মানুষ জীবনের যা' একটা প্রধান কাজ, তাতে লজ্জা করবার কি আছে ? লোকে কত গর্হিত কাজ ক'রে পিতামাতার কাছে একটুও লজ্জ বোধ করে না—কিন্তু বিয়ের কথাটা হলে লজ্জা হওয়া চাই,—বিয়ের কথায় লজ্জা ক'রে কথা না বলা যেন ফরজ ! এ সম্বন্ধে কোন কথা বললেই এরা বেহায়া আর মহাপাপী। বিবি খদিজা (রাঃ) নিজেই হজরতকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করেছিলেন রছুল নিজেই বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির করেছিলেন । এরূপ ভুরি ভুরি প্রমাণ আমাদের শাস্ত্রে আছে (১) কিন্তু বোন আমারত' কথা

(১) তুমি স্ত্রীলোকদের মধ্যে ভাল দেখিয় বিবাহ কর —ছুর নেছা—কোরান

বল্‌বার যো নাই—এ বিয়ে আমার হবেই – আমরা যেন বোবা! কিন্তু বোন, পিতামাতার দোষেই হউক বা নিজের বিবেচনা ও নির্ব্বাচনের দোষেই হউক, যদি অনুপযুক্তের হাতেই পড়তে হয়,—কিন্তু যাকে স্বামিত্বে বা স্ত্রীত্বে বরণ করা যায় তার মনে কষ্ট দেওয়া কোন মতেই সঙ্গত নয়। যাকে স্বামী বলে গ্রহণ করা গেল, সে মূর্খ হউক, অন্ধ হউক, খোঁড়া হউক, মাতাল হউক অজ্ঞান হউক, পাগল হউক,—তার সেবা করতেই হবে। নারীর যে এ একটা বড় ধর্ম্ম।

লতিফন বলিল—তবে আর তোমার বিবেচনা করে ভাল বর জুটানর মানে কি? আর যুবকদের ভাল অর্দ্ধাঙ্গিনী বাছবার দরকার কি?

তোমার কথা এই, 'যা পাও তাই খাও তাই লয়ে ঘরে যাও!" এইত?

সুরন বলিল—তোমার প্রশ্নের উত্তরে হাঁ-না দুই-ই বলা যেতে পারে খোদা মানুষের বিবেচনা শক্তি দিয়েছেন, ভাল মন্দ বিচারের ও নির্ব্বাচনের ক্ষমতা মানুষের আছে, তুমি তার সদ্ব্যবহার কর,—কিন্তু ভাই তোমার পায়ে পড়ি, এই উপযুক্ত নির্ব্বাচনটা শুধু গহনা আর অর্থের উপর দিয়া করো না,—আর তোমার অমন নেকবক্ত স্বামীর দেলটা পুড়িয়ে ছারখার করো না যদি কপালের লিখনে, সিদ্ধান্তের দোষে বা নির্ব্বাচনের ভুলে—অনুপযুক্ত স্বামীর হাতেই পড়তে হয় তবে খোদার উপর নির্ভর করে তাকেই প্রাণ-মন সমর্পণ করে সেবা করবে—তাতেই তুমি সুখ পাবে।

সিকদার সাহেব কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিলেন। লতিফন উঠিয়া বাড়ী চলিয়া গেল সুরন পিতার নিকটে গিয়া তাঁহার মুখে দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার হৃদয়ের মধ্যে প্রবল ঝড় বহিতেছিল, হৃদপিণ্ড

সবেগে স্পন্দিত হইতেছিল আবদুল কাদেরের সংবাদ জানিবার জন্য মন শত কর্ণের সৃষ্টি করিতেছিল। যুগপৎ আশা ও নিরাশায় বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল, কেবল অন্তর্যামীই এ সব বুঝিলেন যিনি ধীর শান্ত সাগরবক্ষ পর্ব্বত প্রমাণ তরঙ্গাঘাতে আলোড়িত করেন।

সিকদার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—মা নুরন, তুমি আবদুর রহিমের নিকট টাকা দিয়াছিলে—কি জিনিষ কিনতে হবে তা' বল নাই তা' কি করে আনি? আমারও ভুল মা, তোমারই বিয়ে—তোমাকে অবশ্য জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল—কি কি জিনিষ আনতে হবে।

সিকদার সাহেব সামান্য জিনিষ ক্রয় করিবার জন্য কন্যাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই বলিয়া দুঃখিত হইতেছেন, কিন্তু চির জীবনের জন্য যে জিনিষ,—স্বামী, কিনিয়া দিতেছেন শাস্ত্রের আদেশ থাকা সত্ত্বেও তাহা জিজ্ঞাসা করেন নাই তার জন্য একটুও দুঃখিত হইলেন না।

আবদুল কাদেরের পীড়ার সংবাদ জানিবার জন্য যে ঝড় নুরনের বুকের মধ্যে বহিতেছিল তাহা না থামিতেই আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইল,—বজ্র পড়িল। সে আঘাত সামলাইয়া লইয়া সহজ ভাবে বলিল,—আমি কোন জিনিষ আনবার জন্য টাকা দিই নাই, আবদুল কাদের মিঞার বিপদে একটু সাহায্য হবে তাই তাঁকে দিতে দিয়েছিলাম

বলিতে বলিতে তাহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিল। সকল শক্তি জাগ্রত করিয়া নবারুণ-প্রফুল্ল—পুষ্পতুল্য মুখ-খানি পিতার মুখের উপর রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বাপজান তিনি এখন কেমন আছেন?

"খোদার মরজী অনেকটা সুস্থ হয়েছেন, তাঁর জীবনের এখন আশঙ্কা নাই" নুরনের বুকের উপর হইতে ভীষণ অন্ধকারাচ্ছন্ন, ঝটিকা প্রপীড়িত হিমালয় যেন নামিয়া গিয়া সহসা আশার আলোক জ্বলিয়া উঠিল সে খোদার মহা-সিংহাসনতলে কৃতজ্ঞতাসহ সকল নিবেদন,

সকল বেদনা জানাইল। সন্ধ্যার পর যখন নুরন টেবলস্থিত পুস্তকে চক্ষু রাখিয়া পুস্তক বাদে বাহিরের জগতের অনেক কিছু পড়িতেছিল—এমন সময় আবদুর রহিম অপরাধী চোরের মত বিষণ্ণমুখে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, নুরন মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আরে শয়তান, আমার টাকাগুলি কি করলি ?

আবদুর রহিম সজলনয়নে বুবুর দিকে চাহিয়া রহিল। আশা ছিল এই কৃতকার্য্যতার জন্য শীঘ্রই পিঠের উপর বিরাশি ওজনের বখ্‌শিশ পড়িবে। কতকক্ষণ এই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে আস্তে আস্তে বিছানায় যাইয়া শুইয়া পড়িল। নুরন ভাবিল এটা তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যই হইয়াছে। এত সামান্য টাকা তাঁহার বিপদ কালে দেওয়া হইয়াছে তাই তিনি ঘৃণা করিয়া লন নাই সে বইর উপর হইতে চক্ষু উঠাইয়া ছাদের দিকে তাকাইয়া অনেক ক্ষণ চিন্তা করিল, চিন্তা ফুরাইল না, উঠিয়া জানালার নিকটে গিয়া গভীর আঁধারের দিকে চাহিল অন্ধকার অর্দ্ধনিদ্রিত চক্ষু ফিরাইয়া, সৌন্দর্য্য দেখাইয়া,—রাগ করিয়া চাহিয়া রহিল তাহার নিকট কোন সিদ্ধান্ত না পাইয়া নুরমোহার শয্যার উপর শুইয়া পড়িল

আবদুর রহিম ইহার মধ্যে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে হাত দিয়া ঝাঁকাইয়া উঠাইয়া বলিল—তুই, মৌলবী সাবকে কেমন দেখলি ? তাঁর কোথায় কেটেছে ? তিনি কি খান ? টাকা দেবার সময় তুই কি বললি, তিনি কি বললেন ?

"কি আর বলবেন—টাকা নিলেন না, বললেন, টাকা তোমার বুবু সওদা করতে দিয়েছেন—আমি বাপের কাছে টাকা দিলাম আমার দোষ কি ?"

"তিনি কি আমার কথা আর কিছু জিজ্ঞাসা করলেন ?"

আবদুর রহিম নিদ্রার আকর্ষণে ও প্রশ্নের তাড়নায় অস্থির হইয়া বলিল—তিনি কি তোর সোয়ামী হন যে অত আলাপ! আমার ঘুম পাচ্ছে—আমি আর কথা কইতে পারব না নুরন আবদুর রহিমের মুখ টিপিয়া দিয়া বলিল—শয়তান, বলিস কি, তিনি পরপুরুষ, ও কথা বলতে আছে? আবদুর রহিম অত ধর্ম্ম বিজ্ঞান, ভালবাসার দর্শনশাস্ত্র পড়ে নাই সে কাঁদিয়া ফেলিল

সিকদার সাহেব পাশের কামরায় শুইয়া ছিলেন—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কি হ'লরে, কাঁদছিস্ কেন?

আবদুর রহিম কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—আমার ঘুম আসছে, বুবু কেবলই মৌলবী সাবের কথা জিজ্ঞাস করে—তিনি কি বল্লেন, আমি কি বল্লাম, তিনি বুবুর কথা জিজ্ঞাসা করলেন কি না আরও আমায় মারছে—উঁ—উঁ—উঁ অ্যাঁ—অ্যাঁ—অঁ —। নুরনের গৃহের মধ্যে যেন কেয়ামত হইয়া গেল

সিকদার সাহেবের নিকট নুরনের মনের কথা যেন অনেক স্বচ্ছ হইয়া দেখা দিল। তিনি ভাবিলেন আবদুলকাদেরই নুরনের উপযুক্ত। সে গরীব হলেও সে মহীয়ান সম্রাট অর্থাভাব তার কাছে কিছুই নয় সে যেন দারিদ্র্যকে বরণ করে নিতে চায় তার শান্তি, তার সত্য, তার পবিত্র মূর্ত্তি, তার জীবনকে আলোকিত করেছে, রোগ-শয্যায়ও তার মুখখানিতে, যেন চাঁদের কিরণ ছড়াচ্ছে খোদার প্রতি অটল বিশ্বাস, যেন সমস্ত তাপ জ্বালা থেকে দূরে, কোল দিয়ে ঢেকে রেখেছে, কিন্তু এমন ছেলের হাতে আজ নুরনকে সমর্পণ করতে পারলাম না—সবই বুঝতে পাচ্চি, অথচ আমি স্পষ্ট করে, বুঝে কাজ করতে পারছি না, খোদা আমার একি দুর্ব্বলতা!

দরবেশ সাহেব সিকদার সাহেবকে এ লাগায়েত বুঝাইতেছেন যে

সুরনের প্রতি সুবিচার করিতে হইলে আবদুলকাদেরের সঙ্গেই তার বিবাহ দেওয়া উচিত, কিন্তু গৃহে অশান্তির ভয়ে সিকদার সাহেব কিছুতেই তাহা করিতে পারিতেছেন না তিনি বুঝিতেন এ বিবাহ দিলে তাঁহার স্ত্রী ও আত্মীয়স্বজন গৃহে আগুন জ্বালাইবে

আবদুলকাদেরের একটা সত্যকার ধারণা ছিল যে, অনেক লোকে শিক্ষার্থী পুত্রকে বিবাহ দিয়া ছেলের পড়ার খরচটা শ্বশুরের উপর দিয়া যাইবে ভাবিয়া সোণার চাঁদ পুত্রবধূর মুখ দেখেন—এদিকে রূপার চাঁদ ছেলেটী সোণার চাঁদ লইয়াই ব্যস্ত থাকেন, কালো কালিতে লেখা বইগুলি দেখিতে বড় সময় পান না কিন্তু যে সকল পুত্রগণকে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহারা পঙ্কিলময় পথে নামিয়া পড়িতেছে, তাহাকে বিবাহ দিয়া রক্ষা করা উচিত। কেননা, চরিত্র-বল শিক্ষা-বল হইতে নিম্নে নয় কিন্তু যে সকল যুবক বুঝিতে পারেন যে ইন্দ্রিয়-সংযম করিয়া শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন, তাঁহারা যেন ছাত্র-জীবনে কখনও বিবাহ না করেন এটি যেন তাঁরা মনে রাখেন ; চরিত্র-শক্তি শিক্ষা শক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ

বিবাহের অন্যান্য জিনিষপত্র ক্রয় করিবার জন্য সিকদার সাহেব আবার কলিকাতা গেলেন। এবার সুরন নিজ হস্তে কতকগুলি খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আবদুলকাদেরকে দিবার জন্য, তাঁহার সঙ্গে দিল খাদ্যগুলি কিরূপে সুস্বাদু হইবে, ভালবাসা তাহা বেশ করিয়া শিখাইয়া দিয়াছিল প্রাণের টান যেখানে মসলা, প্রেম যেখানে ঘৃত বিচ্ছেদ যার অগ্নি, নিরাশা যেখানে চুল্লি, সে খাদ্য অবশ্য ভিন্ন রকমে প্রস্তুত হইয়াছিল।

পরিচ্ছেদ

(১২)

দেখ কেরাণী বাবু, নুরনের বিবাহ নিকটে। কাপড়-চোপড় জিনিষ-পত্তর কিছু জোগাড় করে এলে, না, কর্ত্তা কেবল লেখনী পিষে, জীবনটা অতিবাহিত করবেন

লতিফন অনেক সময় বিদূষিতা প্রমাণের জন্য কথিত ভাষা ছাড়িয়া লিখিত শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে কেরাণী বাবুর নিকটই বিদ্যার জাহিরটা বেশী হয়

আবদুল করিম আপিস হইতে আসিয়া ছিন্ন জামাটা খুলিয়া রাখিয়া বারান্দায় একটা মাদুরের উপর উপবেশনান্তর বলিলেন,—লতিফন আমায় একটু জিরোতে' দাও। মাড়োয়ারী বাবুর আপিসের কয়েকটা খাতা লেখা বাকী ছিল বলে—তাঁর কাছ থেকে খুব গরম শুদ্ধ হিন্দি শুনে এসেছি। এখন আর আমাকে তোমার শুদ্ধ বাঙ্গালা দিয়ে জ্বালিও না। বাজারে এক পাঞ্জাবীর দোকান থেকে তোমার জন্য ৫৲ টাকা দিয়া এক খানা কাপড় এনেছিলাম, তার দাম এ পর্য্যন্ত দিতে পারি নাই বলে তার কাছ থেকে খুব সাচ্চ উর্দ্দু শুনে এসেছি—এখন আমায় মাপ কর—আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে—আমায় এক গ্লাস পানি দাও আমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

"এক গ্লাস খাবার পানি কেন তোমার মত স্বামীর জন্য একসমুদ্র সরাবন তহুরা এনে দেব এখন, আর পা ধুইয়ে দেব"—বলিয়া লতিফন বেগে ঘরের মধ্যে যাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল

—দেখ, তুমি আজ আমাকে যেরূপ বিদ্রূপ করলে, এর প্রতিকার যদি আমি না করি তবে আমার নাম লতিফনই না

আবদুল করিমের ক্লান্তদেহে আর এ সময়ের কথার ঘা সহ্য হইল না। তিনি দুঃখজড়িতস্বরে বলিলেন—"লতিফন, তুই কি কাল—সর্পিণী তোকে, বিয়ে করা অবধি আমার প্রাণে এক মুহূর্ত্তও শান্তি পেলাম না, খোদা আমাকে কি দোজখেই ফেলেছেন।

লতিফন গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল—আমি বুঝি ভিখারীর মেয়ে যে তোমার বাড়ীতে চাকরী করে ভাত রেঁধে খেতে এসেছি? আমি যে কেমন কালসর্পিণী, তা' আজকে থেকে তোমাকে দংশন করে ক্ষত বিক্ষত করে দেখাব—এ তুমি জেনে রেখ

আবদুল করিম রাগান্বিত হইয়া বলিলেন—লতিফন, তোমাকে যদি কোন দিন ত্যাগ করতে পারি তবেই আমার শান্তি, নচেৎ আমার জীবনে এ দুঃখের শেষ হবে না

"আচ্ছা কেরাণী বাবু, থামো, আমাকে আর দূর করতে হবে না — আমি নিজেই দূর হবার ব্যবস্থা করছি।

পরদিন লতিফন তাহার পিতাকে পত্র লিখিল, "পিতা, আপনি যদি আমার মুখ দর্শন করতে চান, তবে, পত্রপাঠ আমাকে এখান হইতে লইয়া যাইবেন—আপনার জামাতা এতদিন আমাকে দাসীর মত করিয়াই রাখিয়াছিল,—এখন তাহাও রাখিবে না।'

আবদুল করিম আপিষে গেলে, পত্রখানি ডাক ঘরে পাঠাইয়া দিয়া লতিফন নূরনকে যাইয়া বলিল—দেখ বোন, তোমার বিয়ে দেখবার আমার বড়ই সাধ ছিল, কিন্তু আমার কেরাণী বাবুর জন্য তা ঘটল না, এ পর্য্যন্ত এমন একটা জিনিষ এনে দিল না যা' পরে বা গায়ে দিয়ে তোমার বিবাহে আসি। তা বাদে আজ আমাকে বাড়ী হতেও দূর করে দিচ্ছে

বাপজানকে চিঠি লিখে দিয়েছি, কালকেই চলে যাব সুরন বলিল—তুই কি পাগল, দূর করে দিলেই কি যেতে আছে? পায়ের চামড়া যেমন ধুতে গেলেও পা ছাড়ে না, স্ত্রীকেও তেমনি স্বামীর পায়ে লেগে থাকতে হয়। গহনা কাপড়ের জন্য তোর ভাবনা নাই—আমার কাছে সোনা আছে এই নয়ে স্যাকরা বাড়ী পাঠিয়ে দে, মজুরীর টাকা আমি কালকে দেবো

ক্ষণিক চুপ করিয়া থাকিয়া ঈষৎ হাসিমুখে সুরন বলিল—না হয় আমার বিয়ের গয়নাগুলি তোর গায়ে লাগিয়ে দেবো, না হয় আমার বড় লোক স্বামীটাও তোকে দেবো, তা' হলে' ত থাকবি?

লতিফন—"তোমার ত পোয়া বারো, তাই ঠাট্টা,—হাজার হাজার টাকার গহনা পাচ্ছ, তাই আমি তোমার সোনা কি ক'রব? আমাকে তুমি এত নীচ মনে কর?"

"সত্যি ব'লছি লতিফন, গহনায় আমার স্পৃহা নাই—গহনা আর টাকাই যদি স্ত্রীলোককে সুখ দিতে পারত, তা হ'লে রাজা বাদশার মেয়েরা কখনও অসুখী হ'ত না।

এ বিবাহ-ব্যাপারে যদিও সুরনের অন্তর-রাজ্যে প্রবল বাত্যা উঠিয়াছে, তবুও লতিফনকে উপস্থিত থাকিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল। এই পৃথিবীর কত হা হা-হুতাশ বুকে চাপিয়া রাখিয়া—লোকে কত কঠোর অপ্রিয় কর্ম্মকে আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হয়

সুরমেহার বুকে দাবানল চাপিয়া রাখিয়া, হাসিমুখে বলিল—লতিফন, তোমার কেরাণী বাবুকে আমি কিন্তু বড় ভালবাসি তাঁর মত সৎস্বভাব, খোদাপোরস্ত লোক খুব কমই দেখা যায় তোকে তিনি যেরূপ প্রাণ ভরে ভালবাসেন তাতে আমার ঈর্ষ্যা হয় যে আমার কপালে এমন ভালবাসা ঘটবে না।

"তবে আমার নেকবক্তটাকে কি তুই নিতে চাস্?"

"তবে আমার বড় লোকটাকে কি তুই নিয়ে বদলা-বদলি করবি?"

"আমার যেমন তেমনটা নিয়ে তুই কি করবি?"

"তাইত, আবার কেরাণী বাবু কাছে এলেই, তোর গা যায় জ্বলে, আমি যে তা হলে পুড়ে ছাই হয়ে যাব!"

"তুই পুড়বি কেন, তুই যে তাকে ভালবেসে ফেলেছিস, তোর কাছে ত সে ফেরেস্ত, তবে ফেরেস্তারা আগুনের তৈরী—তাই কেরাণী বাবুর গায়ের আঁচে যদি তোর ফোস্কা পড়ে, তাই ভয়

নুরন গম্ভীরমুখে বলিল—লতিফন, তুই মোসলেম কন্য হয়ে, কোন মুখে যে স্বামীকে 'যেমন তেমন' বলিস্ তাই আমি ভাবছি! তিনি যদি গোবাখাল হতেন তাও তোর স্বামী, নিরক্ষর চাষা হতেন, তাও তোর স্বামী, তিনি যদি রাজা হতেন তাও তোর স্বামী, পথের ভিক্ষুক হতেন, তাও তোর স্বামী,—স্বামী, সে স্বামী সে আবার 'যেমন তেমন' হয় কি করে?

লতিফন কোন উত্তর না দিয়া বিষণ্ণ মুখে চলিয়া গেল।

পরিচ্ছেদ

(১৩)

মানুষ না পশু।

যদিও ছলিম সেথ মোকদ্দমা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে কিন্তু রাহজানদের কোনরূপ শাস্তি প্রদত্ত হয় নাই। তাহাদের দুর্দ্দমনীয় কাম লিপ্সায় ঘৃতাহুতি পড়িয়াছে পাপের ঘৃণ্য চিত্র তাহাদের সম্মুখে পৃথিবীকে স্বর্গ করিয়া দিয়াছে, চতুর্দ্দিকের কৃতকার্য্যতা তাহাদের হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় সুখের মদিরা ঢালিয়া দিতেছে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সুখের নূতন নূতন ছবি কল্পনা-রাজ্যে ভাসিয়া উঠিতেছে।

ছায়মদ্দি বলিল,—দেখ ভাই, কেমন সুন্দর দুনিয়া! আমরা যা চাই তাই পাই, লোকে বলে "যে যা চায়, তাই পায়, বিধি কারো বাম নয়" একথা একেবারে ঠিক! কোন্ ব্যাটার সাধ্যি, আমাদের কাজে বাধা দেয়? চৌকীদার, কনেষ্টবল, জমাদার, দারোগা, এরা ত' আমাদেরই! একটা টাকা হাতের মধ্যে দিলেই অমনি হয়ে গেল আর আমার হাতে যদি একখানা লাঠি থাকে, তবে ত দশ শালাকে কেয়ারই করি না তারপর আমাদের কামধেনু মীর সাহেব কি খাসা লোক গো, কি খাস' কেক! যেন দয়া'র ভাঁড় যখনি যাও তখনি সংযুক্তি। তখনি সংযুক্তি। মাথা কি! যদি মাথাটা বিক্রী হয় তবে আমি হাজার টাকা ডাকি

বলিতে বলিতে গঞ্জিকা-দেবীর শেষ নিশ্বাসের সেবাটা সজোরে সম্পাদন করিয়া, উপরের দিকে ধূম ত্যাগ করতঃ একটা ঢোক গিলিল।

আমিনদ্দি, দেবীর আসন দুই হাতে ধারণ করিয়া স্বীয় ওষ্ঠাধরে

চুম্বন করিয়া বলিল—তুই মাথা কিনে কি করবি, তোর না আছে বিদ্যা, না আছে বুদ্ধি, কেবল আছে গায়ের জোর, আর সেই গায়ের জোর দিয়েই বা কি করতে পাল্লি! ছাবের মণ্ডল আমাদের বিপক্ষে সাক্ষি দেয়, আর ব্যাটা বলে সে সত্যি কথা বলবে,—এ পর্য্যন্ত তার ত কিছুই করতে পারলি না।

ছায়মদ্দি হাতের উপর হাত ঠুকিয়া বলিল –কি, পারি না? ব্যাটার সত্যি কথা বের করে দিচ্ছি, কালকেই বুঝলে কি না একখানা ছালা তারপর গঙ্গা সই ও ব্যাটা যেমন সত্য কথা বলে, তেমন সত্যি ক'রে একবার গাঙ্গে সাঁতার খেলুক খলিল, তুমি কেবল সঙ্গে থাকবে, কাজ ফরশা ক'রব আমি আর রাহাজান

খলিল বলিল—না ভাই, তোমরা দিন দিন সংসারে যে ভীষণ কাজ ক'রছ, এ দেখে পশু পক্ষীও বোধ হয় কাঁদছে, তোমরা কি পাষাণ, তোমরা লোকের বুকে ছুরি দাও আর আনন্দে নৃত্য কর। খোদা আছেন, গোনা আছে, দোজখ আছে, বেহেস্ত আছে, মিজান আছে, পোল-ছেরাত আছে, কেয়ামত আছে, তোমরা সবই ভুলেছ,—আমিও ভুলেছি সে দিন আমার একমাত্র পুত্র আমার সামনে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল, আর আমার মরণই যে এখন না হতে পারে তা নয় আর না ভাই, আমায় ছাড়।

রাহাজান বলিল—তোকে আজরাইল ফেরেস্ত ছাড়তে পারেন কিন্তু আমরা ছাড়তে পারি না কাজে কামে তোর মাথাটা যেমন খোলে এমন কাউরি ন, কি বল হে ছায়মদ্দি;—যেন যাঁতাকল!

কছির কহিল—না ভাই আমিও তোমাদের সঙ্গে আর যাব না, তোমরা বড় নেমকহারাম সেদিনকার টাকাটার ভাগ একবারেই দিলে না। হাজার টাকার, হাজারটা পয়সাও দিলে না

রাহাজান ক্রোধান্বিত হইয়া বলিল,—ওরে ব্যাটা পাজি, আমরা নেমকহারাম? ব্যাটাকে টাকার হিসেব নিকেশ করে, ভাগ করে দিতে হবে, ব্যাটা যেন সহধর্মীর স্ত্রী!

ছায়মদ্দি হাসিতে হাসিতে বলিল—মিল করছো ত ভাল হে রাহাজান, ও যে পুরুষ!

"মিল অমিল বুঝি না, ও ব্যাটা বেরুক এখান থেকে"

কছির তাচ্ছিল্যের সহিত ক্রোধ মিশাইয়া ঈষৎ হাসিমুখে বলিল—ওরে আমার সোণার চাঁদ, আমি বেরুবো? তোমার গলায় যে দিন দড়ি ঝুলবে, সে দিন বেরুবো, আজ নয় তোর এত বড় কথা, কাফের, ঘুঁড়োখোর, উল্লুক, জাহান্নামের পোকা

তোর গলায় আজই দড়ি দেব—বলিয়া রাহাজান কছিরকে আক্রমণ করিবার জন্য আস্তিন গুটাইল

কছিরও আস্তিন গুটাইয়া, সন্ধ্যাকালীন বরাহের ন্যায় আক্রমণ করিয়া রাহাজানকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া, গলা চাপিয়া ধরিল। রাহাজান নীচে পড়িয়া গোঁ-গাঁ করিতে লাগিল। আর সকলে নির্ব্বাক, নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল দেখিয়া রাহাজান বলিল—ওঁ—ওঁ—রে বা—অ—টারা আঁ—আঁ মার, জা—আন গে, যা—আয় রে, বা—আ—বা। সঙ্গীরা অনেকক্ষণ তামাসা দেখিবার পর আসিয়া বহু কষ্টে দুইজনকে পৃথক করিয়া দিয়া মনে মনে কহিল—বেশ হয়েছে শালার,-আমাদেরও টাকার ভাগ দিতে যেমন শয়তানী করে—

রাহাজান উঠিয়া গায়ের ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল—"কছির, আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম, তুমি না বুঝে আমার জান্‌টা, বের করে ফেলেছিলে আর কি বাবা, তোমায় ভাগ দেব বই কি, নিশ্চয়ই দেব। যাক—একটা হাসি ঠাট্টা হয়ে গেল।"

রাহাজান জানিত কছির দলের সংশ্রব ত্যাগ করিলে, দলের বিশেষ অঙ্গহানি হইবে

তারপর সকলে বসিয়া গ্রাম্য-সুরাদেবীর পাদমূলে আত্ম-বিক্রয় করিতে করিতে স্থির করিল যে, পরদিন রাত্রে ছাবের মণ্ডলের বাড়ীতে তাহাকে আহত করিয়া যাহা পায় লুণ্ঠন করিবে, আবশ্যক হইলে হত্যা করিতেও ত্রুটী করিবে না।

শীতকাল, রাত্রি দুইটা। জ্যোৎস্নার আলোক প্রায় শেষ রশ্মি ছড়াইতেছে ঈষৎ আলোক ঈষৎ অন্ধকারের সহিত নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য যুদ্ধ করিতেছে সকলই নিস্তব্ধ বিরাট শান্তি পৃথিবীকে জড়াইয় বুকে করিয়া রাখিয়াছে আকাশ হইতে পাতাল পর্য্যন্ত কি এক গভীর সুষুপ্তির ঢেউ খেলিয়া খেলিয়া নামিয়া আসিতেছে,—ছাবের মণ্ডল তাহাজ্জোদ নামাজ পড়িবার জন্য বারান্দার এক কোণে ওজু করিতেছে, আর শীতে কাঁপিতেছে ছাবের পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, কয়েকটি লোক গৃহকোণে দাঁড়াইয়া চুপে চুপে কি বলিতেছে

"তোরা কে রে বেল্লাল ওঠত,"—বলিয়া ছাবের চীৎকার করিয়া উঠিল

দুর্বৃত্তগণ অমনি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল দৌড়াইতে দৌড়াইতে ছাবেরের বাড়ীর নিকটে যে একটি গভীর পাতকুয়া অকর্ম্মণ্য ও অর্দ্ধশুষ্ক অবস্থায় পড়িয়াছিল, তাহার মধ্যে ছায়মদ্দি হঠাৎ পড়িয়া গেল।

ওরে রাহাজান, ওরে নাছির, আজ একেবারেই মলামরে বাবা,—তোরা সব চলে গেলিরে শালারা—আজ আমি একবারেই গেছিরে. বাবা—আমার উপর কি তোদের একটু দয়াও নাইরে—আজ এমন করেই অকালে জানডা গেল—বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল

ছাবের একটা আলো লইয়া তাহার পুত্র বেল্লালকে সঙ্গে লইয়া কূপের নিকট যাইয়া বলিল,—কেরে তুই ?

ছায়মদ্দি হাউ মাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—আমি না গো, আমি কেউ না বাবা

ইতিমধ্যে ছায়মদ্দি ভয়ে স্বভাবের আজ্ঞা পালন করিয়া ফেলিয়াছিল

পাছে দীপালোকে মুখ দেখিতে পাওয়া যায় ভাবিয়া সে পানি ও কর্দ্দমপূর্ণ ভাঙ্গা কলসী যাহার মধ্যে প্রকৃতির আজ্ঞা পালনের ফল ও অনেকটা পড়িয়াছিল—উঠাইয়া মাথার উপরে দিল সেই পানি ও কাদার ঝরণ শতধারে পড়িয়া তাহাকে বাঁদর বানাইয়া দিল

স্বর শুনিয়া চিনিতে পারিয়া ছাবের বলিল—ছায়মদ্দি, তোমার এই কাজ।

ছায়মদ্দি চক্ষু হইতে কাদা মুছিতে মুছিতে বলিল—ও চাচা, তুমি যে—তুমি যে আমার চাচা গো ওই শালারা আমাকে এনেছে আমি কিছুই জানিনে চাচা !

মনে মনে বলিল- ওরে শালা রাতাজান কছির, যার সঙ্গে ঘৃণা করে কোন দিন কথা বলিনে তাকেও চাচা বলালিরে শালারা

তাজেম পুত্র বেল্লাল হুঙ্কার দিয়া বলিল -ওরে শালা ছায়মদ্দি আজ পেয়েছি তোমায় বল, তুই কি ছায়মদ্দি ?

"ও চাচা আমি না চাচা, আমায় কিছু বোল না চাচা !"

"আমিও চাচা আমার বাপও চাচা, আর তুই কেমন দেখা যাবে। এই দড়ি ধরে উঠে আয়।"

একটা মোটা দড়ি নামাইয়া দিয়া পিতা পুত্রে ধরিয়া রাখিল—ছায়মদ্দি কাঁপিতে কাঁপিতে উপরে উঠিয়া আসিল। ছাবের তাহাকে সম্পূর্ণ চিনিতে পারিয়া বলিল - ছায়মদ্দি, তোমার এই কাজ। তুমি কাজেম মিঞার ছেলে তোমার বাপ রাতদিন তছবি পড়ে, খোদার জেকের

ক'রে দিন কাটান, আর তাঁর ঔরসে তুমি এমন শয়তান জন্মেছ! তোমার বাপ সত্যি আমার একজন দোস্ত আমরা এক পীরের মুরিদ। তোমাকে ছেড়ে দিলাম কিন্তু তোমার বাপের মুখ হাসাইও না, জানিও খোদা আছেন, পাপ জিনিষটা তুষের আগুনের মত আস্তে আস্তে পোড়ায়, একবারে দাউ দাউ করে জ্ব'লে উঠে না। কিন্তু মানুষকে পোড়ায়ে কয়লা করে।

বাবা, এ ধাক্কা ত বাঁচলাম ভাবিয়া ছায়মদ্দি কিম্ভুত কিমাকার চেহারা লইয়া সোজা রাহাজানের বাড়ী উপস্থিত হইয়া বলিল—ওরে শালারা, আমি যে আজ গেছলামরে বাবা, আমি কুয়োয় পড়ে এত চেঁচালাম তোদের কানে একটুও গেল না? তোরা মানুষ না পশু? তোরা ত পরের সর্ব্বনাশ করিস্—আবার যখন নিজের লোকের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, তখন তোরা তাকে ফেলে রেখে জান লয়ে পালাস্। ঐ ছাবের মণ্ডল আজ আমার বাবার কাজ করেছে সে যদি আজ ছেড়ে না দিত তবে আমাদের নাম ত দাগী আছেই; কিছুদিনের জন্য বালাখানায় ব'সে জামাইদেবের মত তৈরী ভাত খেতে হ'ত।

রাহাজান কৃত্রিম দুঃখের সহিত বলিল,—চল ভাই ছায়মদ্দি, যা হবার তা' হয়েছে আর এ রকম হবে না।

'তার মানে যখন ছাবের তাড়িয়ে আসবে, আর যদি কোথাও এই রকম পড়ে যাই তুমি স্ত্রীর মত কাছে বসে বাতাস দেবে, মাথা টিপে দিবে, আর বলবে—"সোণার চাঁদ, মাথায় কি ব্যথা হয়েছে একটু সরবৎ দেব?" কেমন? ওসব চালাকি রাখ আজ হতে আমি বিদায়

রাহাজান ও সঙ্গীরা ছায়মদ্দির চেহারা দেখিয়া মুচকিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল।

রাহাজান গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। অমিলা তাহার আহার্য্য ও

বসিবার স্থান দিয়া মুখের দিকে চাহিল তাহার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া তরকারীর পাত্রটা নামাইতে নামাইতে বলিল—দেখ তুমি যা করছ সব আমি জানি তুমি আমার মাথায় রাখবার জিনিষ আমার বুক দিয়ে তোমার সেবা করা আমার ধর্ম্ম কিন্তু তুমি মোছলমান হয়ে, মোসলেম্য সমাজে যে কলঙ্ক দিচ্ছ, রাতদিন গোনার মধ্যে যেমন ডুবে আছ তাতে আমার প্রাণে এক মুহূর্ত্তও শান্তি নাই। জান, খোদা আছেন, চন্দ্র সূর্য বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি তোমাকেও সৃষ্টি করেছেন, ছাবেরকেও সৃষ্টি করেছেন। সে তোমার মোছলমান ভাই, সে তোমার কি করেছে যে তুমি অমন মুছাল্লী মোত্তাকী লোকটার সর্ব্বনাশ করার জন্য এত ষড়যন্ত্র ক'রছ? জানিও কোরাণের কথা—"মহাপ্রলয়ে একদিন দুনিয়াটা ভেঙ্গে যাবে। বালির ঢিবির মত পাহাড় গুলা ভেঙ্গে উড়তে থাকবে"—তারপর আবার একদিন তোমাকে আমাকে ছাবেরকে এক মহা বিচারের সম্মুখে দাঁড় হ'তে হবে ভীষণ উত্তাপে মাথাগুলি টগ মগ করতে থাকবে,—সেই মহা বিচারের দিনে ছাবেরের কথা জিজ্ঞাসা করলে তুমি কি উত্তর দিবে?

"রাখ, রাখ, তুমি যে একেবারে মৌলবী হয়ে গেলে? তোমার টগ মগ, বক-বক রেখে দাও, ওসব ওয়াজ ছোট লোক—যারা খেতে পায় না—তাদের কাছে ক'রো আমি ওসব শুনতে চাই না।

জমিলা বাষ্পাকুল-লোচনে দুঃখ-ভারাক্রান্ত-হৃদয়ে রাহাজানের পায়ের উপর হাত রাখিয়া বলিল—দেখ তোমার পায়ে পড়ি আর ওমুখো যেও না খোদা অত গোনা সইবে না

তাহার উষ্ণ অশ্রু রাহাজানের পায়ের উপর পড়িতে লাগিল।

রাহাজান অর্দ্ধ শয়নাবস্থায় বলিল—ছাথ আবার তোর ওয়াজ, আমি তোর কাছে মুরিদ হতে আসি নাই, আমি চল্লুম তোর কাছ থেকে।

সে যশোহর হইতে ছলে বলে যে এক কুলটা রমণীকে লইয়া আসিয়াছিল তাহার নিকট উঠিয়া গেল

জমিলা শয্যার উপর মাথা রাখিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে স্বামীর সুপথে আসিবার জন্য খোদার নিকট মাথা কুটিতে লাগিল

নুরন্নেহার ও জমিলা পরস্পর চাচাত ভগ্নী তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জমিলার পিতা টাকার লোভে জমিলার অমতে সুদখোর পুত্র রাহজানের সহিত বিবাহ দিয়াছেন

পরিচ্ছেদ

(১৪)

পরদিন রাত্রি ১০টার সময় রাহুজান সঙ্গীগণকে লইয়া মীর সাহেবের বাড়ীতে গিয়া সসম্মানে আদাব ঠুকিল মীর সাহেবের নিকট সে সময় আরও কয়জন শিষ্য, শিষ্যত্বের দুরতিক্রম্য বিষয়গুলির গভীর আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরাইয়া মীর সাহেব বলিলেন, এস বাবা সকল এস, বেঁচে থাক, বাবা সকল এস, দেখ আমি রাত দিন ধর্ম্ম আলোচনায় ডুবে থাকি তোমাদের খোঁজ লতে পারি না তবে খোদা দয়াময় তিনি তোমাদিগকে অবশ্য দেখেন—আর দেখ, খোদা যা করেন জীবের মঙ্গলের জন্যই করেন আমরা তাঁর মরজী বুঝতে পারিনে। তাই আমরা ভেবে সারা হই

মুরিদগণ। ঠিক কথা, হজরত, ছোবহানাল্লা তিনি য করেন, ভালই করেন। আর আপনি দূরে থাকলেও ভিতরের চোখ দিয়ে অবশ্য আমাদের দেখতে পান

মীর সাহেব হিমালয় তুল্য, আলকাতরার উপরে এক পোঁচ দেওয়া —দেহখানি ঈষৎ আন্দোলিত করিয় গম্ভীরভাবে, মাথায় টুপিটা ভাল করিয়া দিতে দিতে, বলিলেন—দেখ বাবা সকল, খোদার বিনা হুকুমে গাছের পাতা নড়ে ন, বালি যে মরুভূমির মধ্যে চক্‌চক্ করে সেও খোদার হুকুমে করে

নিকটে একটা মোরগ চরিতেছিল, তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, ঐ দেখ বাবাসকল, ঐ মোরগ ফড়িং টাকে ধরে খেয়ে

ফেলছে, এও খোদার ইচ্ছা সবল দুর্ব্বলকে গ্রাস করবে, এটা খোদার হুকুম, তা না হলে, কেন পতঙ্গটাকে ধরে খেল ?

মুরিদগণ—ছোবহানাল্লা, ঠিক কথা হজরত, খোদার ইচ্ছা না হলে, আমরাই কি এসব করতে পারি ? এসব নিশ্চয়ই খোদা যে আমাদিগকে করাচ্ছেন, তাতে কি আর সন্দেহ থাকতে পারে ?

রাহাজান —আহা কি গম্ভীর কথা, মীর সাহেব যে একজন দরবেশ রে !

নছির ভার আর কথা কি ? অর্থাৎ এমন লোক পাবারই যো নাই অর্থাৎ একজন ফেরেস্তা বললে অথচ ঠিক হয় অথচ উনি ম'লে অর্থাৎ দেশটা আঁধার হয়ে যাবে।

রাহাজান —রেখে দে তোর অর্থাৎ, অথচ— কথাটা ঠিক কিনা বল ?

নাছির – অর্থাৎ খুব ঠিক, খুব ঠিক অথচ তাতে আর অর্থাৎ সন্দেহ কি ?

মীর সাহেব — দেখ বাবাসকল, দুনিয়াটা হচ্ছে পরকালের খুঁটি একথা আমার ওয়াজে তোমরা অনেক বার শুনতে থাকবে নাছির বলিল —খুঁটি না হজরত অথচ একেবারে দালান

মীরসাহেব পায়ের উপর পা তুলিয়া কৃত্রিম ধমক দিয়া বলিলেন দূর ব্যাট আহাম্মক বলি কি আর বুঝিস্ কি !

মীর সাহেবের উপর দিয়া কথা বলিয়াছে এজন্য সে ব্যস্ত হইয়া বলিল—তাহলে অথচ খুঁটি হজরত অর্থাৎ খুঁটিই।

মীর সাহেব দুইহাতে টুপিটা নাড়িয়া, আবার সোজা করিয়া মাথায় দিয়া বলিলেন, বুঝতে পারছনা বাবা, কথা হচ্ছে—এ দুনিয়ায় যা করা যাবে,—পরকালে তার ফল ভোগ করতে হবে, ছোবহানাল্লা।

মুরিদগণ —ছোব্‌হানাল্লা, ছোব্‌হানাল্লা

মীর সাহেব —দেখ বাবা সকল, সুদটা যেমন হারাম হচ্চে, ঘুসটাও মতলেকান, ঐ রকমই হচ্ছে কোরানে আল্লা ফরমাইয়াছেন—

নছির —আর বল্‌বেন না হজরত, অর্থাৎ মনে হচ্ছে আপনার ওয়াজ শুনে অথচ চেঁচিয়ে কেঁদে উঠি

মীর সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় অশ্রু ঝরাইবার মহীয়সী ক্ষমতার প্রশংসায় গলিয়া গিয়া নিজেও দুই ফোঁটা অশ্রু ত্যাগ করিলেন।

নছির বলিল —দেখ রাহাজান, হজরতের অর্থাৎ এখন ভাব আস্‌ছে অথচ বুঝলে কি না, চল এখন আমরা যাই।

মীরসাহেব চক্ষু মুছিয়া বলিলেন—না বাবা, বস, কথাবার্ত্তা শেষ হলে খেয়ে দেয়ে যেয়ো এখন। তোমরা আমার মুরিদ। ছেলের মত তোমরা না খেয়ে গেলে আমার মনটা কি বলে বল দেখি? আর ইস্‌লামের এক আদর্শ হচ্চে অতিথি-সেবা।

বলা বাহুল্য মীর সাহেবের বাড়ীতে কোন অতিথি কোন দিন পাত পাড়িয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই।

চাঁদের দিকে তাকাইয়া মীরসাহেব আবার বলিতে লাগিলেন—ঐ দেখ বাবাসকল, চাঁদ আর তারা সকল ওরা বেহেস্তের নুর হচ্চে, ওরা খোদার হুকুমের নুর। ঐ নুর হতে আলো পয়দা হয়, আর সেই আলোতে সারা দুনিয়াটা রওশন হয়ে যায়।

এক দায়ে-পড়ে শিষ্য মনে মনে বলিল—তোমার শয়তানি থেকে রেয়াকারী,—রেয়াকারী থেকে বেইমানী আর তার দ্বারা জগৎটা অন্ধকার করে দেয়।

রাহাজান কুড়ি টাকার দুইখানি নোট মীর সাহেবের হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া বিদায় লইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

মীর সাহেব কৃত্রিম অস্থিরতার সহিত বলিলেন—কি কর বাবা? একি! আমি ত এ কখন লই না!

সেইস্থানে এই দল ছাড়া আরও কয়েকজন শিষ্য বসিয়াছিল মীর সাহেব চক্ষু ঘুরাইয়া তাহাদিগকে দেখিয়া লইলেন এবং তারা যে এখনও কেন অযথা বসিয়া আছে এরূপ দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিলেন তাহারা ভাবগতিক বুঝিয়া আদাব দিয়া সরিয়া পড়িল .

মীর সাহেব যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—বাবাসকল বস আর কিছু ভাল কথা শোন

মছলা অনেক রকম আছে। ঘুস হারাম্ তবে যদি লোকের উপকার করে দায় ঠেকে লওয়া যায়, তাহলে সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে অর্থাৎ তাহা হলে বিশেষ—

নছির চাপাহাসি লুকাইয়া বলিল অর্থাৎ হজরত, তালওয়া বিশেষ দোষ নাই অর্থাৎ লওয়া যায়।

মীর সাহেব —তাইত বাবা' তুমি সব সময়েই অর্থাৎ ব্যবহার কর, ঠিক এই রকম জায়গায় অর্থাৎ ব্যবহার কর্‌তে হয়

সকলে হাসিয়া উঠিল

রাহাজান ঈষৎ হাসির বেগ থাকিতে থাকিতে বলিল—হজরত, এওত আপনি আমাদের উপকার করেই নিচ্ছেন সুতরাং এওত আপনি ল'তে পারেন। আর দেখুন আপনি যে রকম লোকের উপকার করেন তাতে এতো আপনার ন্যায্য প্রাপ্য লোকের, বিশেষতঃ আমাদের একটু কৃতজ্ঞতাও ত চাই। হজরত আপনি না হলে আমাদের 'তদিন কুপোকাত হত জেল, ঘানির শব্দে অস্থির হত, তা থেকে আপনি বাঁচাচ্ছেন একি সোজা উপকার! মীর সাহেব ওজু করিতে করিতে বলিলেন—তাইত বাবা বল্‌ছিলাম, ও সম্বন্ধে মছলার মতভেদ আছে

রাহাজান হাত বাড়াইয়া নোট দুইখানা আবার মীর সাহেবের হাতে দিল মীর সাহেবের হস্ত অজ্ঞাতসারে প্রসারিত হইল মীর সাহেবকে না বলিয়াই বেইমান হস্ত লম্বা পীরহানের পকেটে গমন করিল। সকলে সসম্মানে আদাব জানাইয়া সেদিনকার মত প্রস্থান করিল

পরিচ্ছেদ

(১৫)

আবদুল কাদের খোদার অনুগ্রহে সুস্থ হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন। আজ দুনিয়া আবার তাঁহার সম্মুখে হাস্য করিতেছে আহত অবস্থায় যে সূর্য্য, চক্ষুতে আগুন ঢালিয়া দিত, যে জ্যোৎস্না দুনিয়ায় আঁধার আঁকিয়া দিত, যে নদীর মৃদু-কল্লোল কর্ণে ক্রন্দনের সুর তুলিয়াছিল যে বিহগকূজন কর্ণে বিষ ঢালিত, যে কৌমুদী-প্রফুল্ল-প্রকৃতি নিরাশার ছবি আঁকিত, যে প্রথম-প্রভাত-রাগ বিকশিত পুষ্প-গুলি প্রাণের উপর বিষাদের স্পর্শ দিত, যে প্রদোষ-বায়ু সন্তাড়িত সপ্তস্বর সংমিলিত প্রভাত-কাকলী ডাক্তারের অস্ত্রের শব্দ বহন করিয়া আনিত, সেই সূর্য্য হাসির ফোয়ারা ছুটাইল, সেই চাঁদের হাসির-সুধা ঢালিল, নদীর সেই কল্লোল আনন্দের তান ধরিয়া হৃদয়ে ঝঙ্কার দিল, সেই বিহগ-কূজন স্বর্গের সুর মর্ত্ত্যে গাহিল, সেই প্রভাত-কাকলী হৃদয় দুয়ারে আশার ঢেউ বহিয়া আনিল

পাঠক, যদি কখনও ভীষণ রোগের কবলে পড়িয়া গৃহমধ্যে কিছুদিন আবদ্ধ থাকিবার পর নিরাময় হইয়া মুক্তবাতাসে, মুক্তপথে, মুক্তনদীতীরে মুক্ত চাঁদের আলোতলে, মুক্তপ্রান্তরে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, তবে বুঝিবেন আবদুল কাদেরের নিরাময়ের পর সেই সূর্য্য, সেই চন্দ্র, সেই নক্ষত্র, সেই আলোক, সেই নদী সেই সব আজ তাঁহার নিকট কেমন লাগিল।

মানুষ দুনিয়াকে ঘৃণা করে, দুনিয়াও মানুষকে কষ্ট দেয়; কিন্তু মানুষ পৃথিবীকে ছাড়িতে চায় না। যে বৃক্ষ-লতা-পাতা-পরিশোভিত,

নদী-পর্ব্বত-কন্দর-পরিপূর্ণ প্রান্তর-মরুভূমি সাগর-সমাকীর্ণ পৃথিবীতে কেবল আঁধারেরই তাণ্ডব-লীলা। দুঃখেরই বিকটমূর্ত্তি। সেই পৃথিবীতে আবার কত আশার মোহনছবি আঁকিতে আঁকিতে সূর্য্য উঠে। সুখের হস্তস্পর্শে কত শুষ্ক হৃদয় সরস করে, কত দিনকার সঞ্চিত শোকের বেদনা কোন অদৃশ্য হস্তের কোমলস্পর্শে মুছিয়া যায়, তাই মানুষ বাঁচিতে চায়

এই ত পৃথিবী। এত কষ্টের পৃথিবী। তবুও মানুষ বাঁচিতে চায় কেন? নিরাশার প্রবল বাত্যা আসিয়া হৃদয়কে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ছারখার করে, রোগের ভীষণ উর্ম্মি দেহের পাড়িগুলি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দেয়; শোকের ভীষণ অগ্নি লোলজিহ্ব বিস্তার করিয়া হৃদয়টা জ্বালাইয়া পোড়াইয়া ভস্মীভূত করে বন্ধুবিচ্ছেদের ছুরিকা মনটাকে কাটিয়া কাটিয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। তবুও মানুষ বাঁচিতে চায়

কাহারও বা ভয় হয় মৃত্যুর ওপারে সব অন্ধকার কোথায় যাইব, কি করিব, সকলই যে সন্দেহ-ময় তাই মানুষ মরিতে চায় না। আবার যাহারা জানে যে মৃত্যু একটী সুখের নিদ্রা তাহারাও পাপ-তাপ-ক্লিষ্ট পার্থিব জীবন ধূলায় লুটাইয়া দিতে চায় না কেন? কেননা তাহারা জানে এ দুনিয়ায় কত নিরাশার আঁধার আশার আলোকে সরিয়া যায় রোগের তাড়না যাইয়া নিরাময়ের মূর্চ্ছা না আসে, বহুদিনের বিচ্ছেদের পর বন্ধু আসিয়া আলিঙ্গন করে, তাই তাহারা মরিতে চায় না। লীলাময়ের রাজ্যে সকলই সম্ভব

ঘোর অন্ধকার রাত্রি শেষে যখন দিনের আলো ফুটিয়া উঠে, ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন রজনী ভেদ করিয়া যখন চাঁদ হাসে, শুষ্ক নদী দেখিতে দেখিতে বন্যার জলে ভরিয়া উঠে, ভীষণ ঝটিকার মহা কোলাহল থামিয়া গিয়া যখন মৃদুমন্দ-পবন-হিল্লোল আসিয়া কত দিনকার পুরাতন বন্ধুর মত হাত বুলাইয়া স্পর্শ দেয়, তখন মানুষ মরিতে চাইবে কেন?

খোদাতালার দয়া মানুষের জীবনকে কখন কোন আঁধারের পথে চালাইয়া এ জীবনে বা পরজীবনে কোন্ আলোকের পথে লইয়া যায় তাহা কে জানে ?

দুঃখই যাহার জীবনের অলঙ্কার, বড় দুঃখ সহিয়া গেলে ছোট দুঃখের মধ্যেও সে আনন্দ পায়।

টাইফয়েড জ্বরই ভীষণ। তাহার উপর নিউমোনিয়া কি ভয়ানক। কিন্তু জ্বরের আক্রমণ না গেলেও নিউমোনিয়া সারিয়া গেলে রোগীর প্রাণে আনন্দের ঢেউ খেলিতে থাকে

আবদুল কাদের নিরাময় হইবার পর বাড়ী ফিরিয়া সংসারের ভীষণ অভাবের মধ্যে পড়িলেও গৃহখানি তাঁহার সম্মুখে এক আনন্দের ছবি আঁকিল

আবদুল কাদের কাছারী ঘরে বসিয়া আছেন এমন সময় রফিক আসিয়া বলিল, কাদু ভায়া, আমাকে ছাপিয়ে আর কি হবে। এই দেখ আমি যে তোমার বিয়ের প্রীতি-উপহার লিখে ফেলেছি।

আবদুল কাদের বল্‌ছ কি হে, ব্যাপার কি ? কোথায় বিয়েটা আগে বল তারপর 'প্রতি অপচার' লিখ এখন

"আহা! উনি যেন আকাশ থেকে প'লেন। তোমার সুরনকে ত আমরা নিচ্ছি না। তাতে নিশ্চিন্ত থাক। আমার ছোট ভাই সে দিন কোন কারণ বশতঃ সুরনদের বাড়ী গিয়াছিল, সে শুনে এসেছে তুমি আরাম হয়ে এলেই সুরনের সঙ্গে তোমার বিবাহ হবে। তোমার শোকে সুরন যে পাগল হে!"

"তুমিই পাগল রফিক। আমার মত পথের ভিখারীকে বিবাহ করবার জন্য সুরন কখনও প্রস্তুত হতে পারে না জানি না আমার উপর সত্যি তার প্রাণের টান আছে কি না। আবার যেন স্পষ্ট বুঝতে

পারি তার হৃদয়ের একটা অব্যক্ত অপার্থিব ধ্বনি আমার হৃদয়ে ঝঙ্কার দেয়। কিন্তু সে না বুঝে যদি ভুল করে থাকে—আমি কখনই নুরনকে বিবাহ করতে পারি না। তাকে বিবাহ করলে তার উপর ভীষণ অন্যায় করা হবে এও আমি আজ তোমার কাছে স্বীকার করছি, রফিক! আমি নুরনকে প্রাণের মধ্যে বড় গভীর ক'রে এঁকে নিয়েছি। সে ছবি মুছে ফেলতে আমার জান ছিঁড়ে যাবে সত্য কিন্তু তাই বলে আমি তার উপর অন্যায় করতে পারি না আচ্ছা রফিক, নুরন সত্যই কি আমায় ভালবাসে? কি করব ভাই, খোদা আমায় কেন গরীব করেছিলেন!

রফিক বলিল—তুমি গরীব কিন্তু তোমার মধ্যে যে বড়লোক বাস করে তাকেই নুরন ভালবাসে আমিও ভালবাসি।

রফিক চলিয়া গেলে ছলিম সেখ আসিয়া আবদুল কাদেরকে পায়ে হাত দিয়া ছালাম করিয়া নিকটস্থ ছালার উপর বসিল।

আবদুল কাদের বলিলেন—ভাল আছ ত ছলিম?

"হাঁ হুজুর খোদায় ভালই রেখেছেন—কিন্তু খোদা আমায় এমন শক্তি দেন নাই যে কলকাতা যেয়ে আপনাকে চোখের দেখা দেখে আসি।"

"সে জন্য কিছু না, তোমার কি রকম চলছে?

"ভালই চলছে হুজুর—"

"না ছলিম তোমার মনের মধ্যে কি যেন বেদনা লুকান আছে আমি বুঝতে পারছি।"

"না হুজুর, আমার কোন বেদনা নাই।"

"সত্য কথা বল ছলিম—আমি যদি কিছু করতে পারি।"

ছলিম বলিল—না হুজুর—আমার জন্য আপনাকে আর কিছু করতে:

দেব না আমি যদি পথে দাঁড়াই সেও ভাল আর ৩ দিন পর এদেশের মায়া ত্যাগ করব।

"বল ছলিম, খুলে বল, না বললে আমি মনে বড় ব্যথা পাব"

ছলিম, চক্ষুর পানিটা আবদুল কাদের না দেখিতে পান এমন ভাবে মুছিয়া ফেলিয়া বলিল—জোনাব, এমন কিছুই নয়, তবে রাহাজান মিথ্যে বাকী খাজনার ও একখানা জাল দলিল করে নালিষ দিয়ে বাড়ী ঘর ক্রোক করেছে আর তিন দিন পরে নীলাম হলেই জন্মভিটে ছেড়ে পথে দাঁড়াতে হবে।

আবদুল কাদের চেয়ার ছাড়িয়া ছলিমের বসিবার ছালার এক প্রান্তে বসিয়া, তাহার চক্ষু নিজের আঁচল দিয়া মুছাইয়া বলিলেন—ছলিম, তুমি ভেব না, কত টাকার ডিক্রী? পরশু আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে দাখিল করে দিও

ছলিম অধিক বেগে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—মা, আপনার কাছ থেকে আমি আর টাকা লব না আমি বাল কাদের নিয়ে পথে দাঁড়াই সেও স্বীকার আপনি আমার জন্য যে কষ্ট ভোগ করেছেন এর গোনা খোদা আমায় মাপ করবেন কি না সন্দেহ।

"বাজে কথা রেখে দাও ছলিম, আমার কাছ থেকে টাকা লয়ে দাখিল করে দিও, ল্যাঠা চুকে যাবে এ যদি তুমি না কর তবে জানব তুমি আমার অবাধ্য"

ছলিম এই কঠোর কোমল আদেশ স্বীকার করিয়া বাড়ী গেল

পরদিন সকালে বিমাতার নিকট যাইয়া আবদুল কাদের বলিলেন—মা, বাপজান মৃত্যুকালে যে টাকা গুলি রেখে গিয়েছিলেন সে কয়টা এখন অংশ করে দিলে আমার বিশেষ উপকার হ'ত। আমার বড় অভাব এই দেখ পরনের কাপড়খানাও একেবারে ছিঁড়ে গেছে

মাতা কৃত্রিমতার সহিত শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন—কি বল বাবা, সে কি! টাকা এল কোথা থেকে? মরণের সময় যা বলেছিলেন, ওটা বিকার মাত্র, বরং তিনি আমার বাপের কাছে যা দেনা করে গিয়েছেন তার জন্য বাড়ী ঘর এস্তেকাল ক্রোক হয়ে গেছে

"ও তা হলে বাপের ভিটা মাটী হতেও আজ বঞ্চিত হলুম, এখন তবে আমি পথে! যাক বাঁচা গেল, আমার বলতে আর কিছু রইল না"—বলিয়া আবদুলকাদের কাছারী ঘরে যাইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। ডাক পিওন আসিয়া তিন খানা পত্র হাতে দিল, খুলিয়া দেখিলেন—একখানা নুরনের বিবাহের দাওয়াৎ পত্র ছাপান চিঠি—জোনাবালীর সহিত নুরনের বিবাহ আবদুল কাদেরকে বিবাহে অবশ্য যাইবার জন্য নুরনের পিতার বিশেষ অনুরোধ, পত্রের এক প্রান্তে লেখা। এক খানি কলেজের প্রিনসিপালের, তাহাতে লেখা "তোমার উপস্থিতি কম হইয়াছে এবার পরীক্ষা দিতে পারিবে না।" তৃতীয় পত্র তাঁহার একমাত্র সহোদরা রোকেয়া খাতুনের মৃত্যু সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে।

আবদুল কাদের কাঁদিতে পারিলেন না—তাঁহার দুঃখ আজ ক্রন্দনের সীমার বাহিরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, মনের বেদনা কেবল সেই সর্ব্বসন্তাপ-হারক খোদার নিকট জানাইলেন—খোদা, দুঃখ দাও ক্ষতি নাই, বিপদ্ তোমার দান,—সম্পদ্ তোমার অনুগ্রহ,—যে বিপদ, যে দুঃখ তোমার কাছ থেকে আসবে, তা বুক পেতে যেন লতে পারি। বিপদের ঝঞ্ঝা, বিচ্ছেদের শিলাবৃষ্টি, প্রাণ-সম আত্মীয়ের বিয়োগ-ঝটিকা, বিদ্যুৎ ঢেলে, বজ্রপাত করে, চারিদিকে ভীমরবে গর্জ্জে গর্জ্জে বইতে থাকুক, তোমাকে সামনে ক'রে মরুভূমির মধ্যে বসে থাকব তোমার ইচ্ছে হয় এর উপর রোগ, দারিদ্র্য, দুর্য্যোগ আগুনের বৃষ্টি বহাইয়া দাও—সব সইব ইচ্ছে হয় তোমার দয়ার ছুরি দিয়ে ক্ষুদ্র হৃদয়টা কেটে কেটে টুকরা টুকরা কর,

আমার অতি আদরের, অতি স্নেহের, অতি আশার জিনিষগুলিকে পুড়িয়ে ছারখার করে দাও,—সইব। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিপদের উপর বিপদ্ এনে, রোগের উপর রোগ পাঠিয়ে, বিচ্ছেদের উপর বিচ্ছেদ দিয়ে, নিরাশার উপর নিরাশা পাঠিয়ে, তাপের উপর তাপ ঢেলে সব বিলীন করে দাও, সব সইব এই আঁধার জীবনে কি আলোকের পথ নাই খোলা?

---

(১৩)

সন্ধ্যার সময় চাকর আসিয়া বলিল—আর কয়দিন পরেই ত আপনাকে এ বাড়ী ত্যাগ করতে হবে ;—আমাকে যেন পা থেকে ফেলবেন না। আপনার ভাই আর মা যে সব যুক্তি করেছেন আমি আড়াল থেকে সব শুনতে পেয়েছি।

আবদুল কাদের বলিলেন—বেশ, তুই কাজে যা হবা, তুই আমার এ অবস্থা দেখেও যদি থাকিস তবে আমার সে ভাগ্য আর ভাই মাদের কথা বলছিস হবা, বাস্তব পৃথিবীতে এমন ভাইর অভাব নেইরে, এই দুনিয়ায় একজন অন্যের বুকের উপর যে ধারাল তলোয়ার পড়ছে তা বুক পেতে ধরে, আবার এই দুনিয়ায়ই ভাই ভাইর জন্য তলোয়ার ধার দেয়! দুনিয়াটার এই আসল রূপ, তুই ভাবিসনে হবা, খোদা আছেন

পরদার মধ্য হইতে বিমাতা পাগলিনীর মত হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—বাবা, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, ছত্তারের কয়বার দাস্ত হয়ে একেবারে এলিয়ে পড়েছে বাবা আমার উপায় নাই—বাড়ীতে আর কেউ নেই এখন রাত্রি হয়ে গেছে, এমন ঝড় বৃষ্টি হচ্চে, কে আমার বাবার জন্য ডাক্তার বাড়ী যাবে ?

ছত্তার বিমাতার উদরজাত পুত্র।

আবদুল কাদের মালকোচা মারিয়া পাগলের মত বাহির হইয়া পড়িলেন এবং ডাক্তারের বাড়ী অভিমুখে ছুটিলেন যাইয়া দেখেন পথে খেয়া নাই অন্ধকারের রাজ্য, ঝড় শিলাবৃষ্টির সঙ্গে গর্জ্জন করিয়া বহিতেছে বজ্রপাতের ভীষণ শব্দ, অনলোদগারিণী কামান গর্জ্জনের মত শ্রুত হইতেছে পারের অন্য উপায় না পাইয়া কাপড় আঁটিয়া পরিয়া

আবদুলকাদের নদীতে সাঁতার দিলেন ভীষণ স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন প্রবল ঢেউ আসিয়া এক একবার পানির মধ্যে ডুবাইয়া দিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে তীরে উঠিয়া ডাক্তারের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন ডাক্তার এই দুর্যোগে আসিতে স্বীকার করিলেন না আবদুল কাদের ঔষধ লইয়া বাড়ী ফিরিলেন। পরদিন ডাক্তার আসিলেন

ছত্তারের মাতার হাতে টাকা ছিল না স্বামীর পরিত্যক্ত টাকা মাটীর নীচে রক্ষিত ছিল, তাহা উঠাইলে লোকে জানিবে ভাবিয়া ডাক্তারের ভিজিট ২।৩ দিন পর দিবেন বলিলেন। ডাক্তার বলিলেন— বিনা ভিজিটে তিনি আর আসিতে পারিবেন ন।

আবদুল কাদের বলিলেন—ডাক্তার বাবু আপনি আমার ভাইকে চিকিৎসা করুন, আমি কল্য আপনার টাকা পরিশোধ করব। ডাক্তার ঔষধ দিয়া চলিয়া গেলেন। খোদার অনুগ্রহে আবদুল ছত্তার নিরাময়ের পথে দাঁড়াইল।

দুই দিনের ভীষণ পরিশ্রমে আবদুল কাদেরের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—এখন আমি টাকা কোথায় পাই শরীরে ত কুলায় না। কিন্তু আমার বসে থাকবার উপায় নাই, এ দুনিয়ায় কেহ বসে নাই। আমি বসে থাকলেও, আমার বুক ছিঁড়ে গেলেও দুনিয়া আমার পিঠে ধাক্কা দিয়ে দৌড় দেওয়াবে আজকের মধ্যে ছলিমের ডিক্রীর ৩৪০ টাকা ও ডাক্তারের জন্য ১০৲ দশ টাকা, এ আমাকে সংগ্রহ করতেই হবে

ভাবিতে ভাবিতে রৌদ্রের তাপ পৃথিবী ছাইয়া ফেলিল সেই— প্রখর রৌদ্রের মধ্যে বাহির হইয়া তিনি রফিকল ইসলামদের বাড়ী অভি-মুখে ছুটিলেন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তথায় পৌছিয়া ঘর্মাক্ত, রক্ত-

বিচ্ছুরিত মুখ রুমালে মুছিতে মুছিতে বলিলেন—ভাই রফিক, আজ তোমার কাছে এক অসম্ভব প্রার্থনা করতে এসেছি আজ আমাকে ৪০০৲ টাকা ধার দিতে হবে। কিন্তু তুমি জান, আমার কিছুই নাই। বাড়ীটা পর্য্যন্ত আমার নাই আমার এমন সম্পত্তি নাই যা দেখে লোকে আমায় পাঁচ টাকাও ধার দিতে পারে।

রফিক হাসিতে হাসিতে বলিল তুমি তোমার নূরনকে যদি আমার কাছে বন্দক রাখতে পার তোমায় হাজার টাকা দিতে পারি। ৪০০৲ টাকা বিয়ের খরচ করবে বুঝি? তা লয়ে যাও। কিন্তু সর্ত্ত ঐ থাকল,—বিয়ের পরেই বন্দক রাখতে হবে যাক এখন বিশ্রাম কর।

আবদুল কাদের লুকান বেদনা হাসি দিয়া চাপিয়া বলিলেন—সে ফেঁসে গেছে হে আমার নামটা বরের লিষ্ট থেকে বরখাস্ত হয়ে গেছে। শুনলুম নূরনের পিতা নূরনের ভাব গতিক বুঝে এবং দরবেশ সাহেবের অনুরোধে আমার সঙ্গেই নূরনের বিবাহ স্থির করেছিলেন সত্য, কিন্তু যখন তাঁরা জানতে পেরেছেন ভিটা বাড়ীটাও আর আমার নাই তখন আত্মীয় স্বজনের কঠোর আদেশে আমার নাম ক্যানসেল করে অবস্থাপন্ন জোনাবালীর সঙ্গে বিয়ে স্থির করেছেন—এই দেখ বিয়ের দাওয়াৎ পত্র রফিক একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তবে তোমার টাকার দরকার কি?

আবদুল কাদেরের অশ্রুসিক্ত চক্ষু রফিক না দেখিতে পায় এমন-ভাবে নীচু করিয়া টেবিলের কাপড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—সব বলছি তুমি দিতে পার কি না? এক বৎসরের মধ্যে খোদা চাহে তোমার টাকা শোধ করব

"শোধ করবার জন্য তোমার তাড়াতাড়ি নাই, তবে ৪০০৲ টাকা ঘরে আছে কি না, চল, একবার মায়ের কাছে যাই" বলিয়া

রফিক আবদুল কাদেরের হাত ধরিয়া সিঁড়ি বহিয়া উপর তালায় লইয়া গেল

রফিকের মাতা এই ভীষণ রৌদ্রের সময় আবদুল কাদেরকে দেখিয়া বলিলেন—তুই এমন কি দায় পড়েছিস কাদু, যে এর মধ্যে বাড়ী থেকে এলি? তোর মুখটা যে রোদে লাল হয়ে গেছে! বসে বাতাস নে—চিরকালই তোর শরীরের দিকে লক্ষ্য নাই।

রফিক আবদুল কাদেরের প্রার্থনা মাতাকে জানাইল এবং টাকা কয়টা যে দেওয়াই চাই এমন দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

রফিকের মাতা স্নেহদৃষ্টিতে আবদুল কাদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—তুই পাগল ছেলে কাদু, তোকে টাকা দিতে যদি হ্যাণ্ডনোট লতে হয় তবে দুনিয়ার কাউকে বিশ্বাস করা যায় না—এখন তুই ভাত খা, টাকা লয়ে যাস্ এখন আচ্ছা কাদু, রফিক আর তুই কি আমার দুই? তোকে না দেখলে আমার মনটা যে কেমন করে তা তুই বুঝতে পারবি না—আগে একটা ছেলের বাপ হ, তবে বুঝবি।

নিজ হস্তে নানারূপ সুখাদ্য দ্বারা আহার করাইবার পর রফিকের মাতা বাকসের চাবি আবদুল কাদেরকে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—বাবা তোর যে টাকার দরকার হয়—বাকস খুলে নিয়ে যা

আবদুল কাদের বাকস খুলিয়া টাকা লইয়া বলিলেন—মা, বড় ছরফরাজ হলাম, কিন্তু মা আমাকে দান গ্রহণ করাবেন না এই হ্যাণ্ড-নোটখানা দিলুম তুলে রাখবেন, বলিয়া পদধূলি গ্রহণ করিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

রফিকের মাতা হ্যাণ্ডনোটখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

আবদুল কাদের বাড়ী গিয়া ছলিমের টাকা দাখিল করিতে পাঠাইয়া দিলেন এবং প্রতিশ্রুত ডাক্তারের টাকা শোধ করিয়া দিলেন।

পরিচ্ছেদ

(১৭)

লতিফন পিত্রালয়ে আসিয়াছে পিতা আবদুল গফুর মিয়া অতি সরল লোক —তাঁহাকে যা বুঝান যায়,-সত্য মিথ্যা অনুসন্ধান না করিয়া তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন;—সুতরাং এরূপ প্রকৃতির পিতার বিশ্বাস জন্মাইতে বিলম্ব হইল না যে, 'লতিফনের স্বামী তাহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে এমন সকল স্থানে বেত্রাঘাত করিয়াছে যে তাহার চিহ্ন পিতাকে দেখান যায় না। এমন অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করিয়াছে যে তাহা মানুষে প্রয়োগ করিতে পারে না।

সে ক্রন্দনের সুর তুলিয়া বলিল,—বাপজান, আমি আপনার সংসারে এত ভারি যে, আমাকে অনাহারে মারবার জন্য রাক্ষসের হাতে ফেলে রেখেছেন

"মা, স্বামীর ঘর হাজার কষ্টের হলেও সুখের আর তোমার যদি এত কষ্ট হয় আচ্ছা, দুলা মিয়া এলে আমি বুঝিয়ে বলব, সে বড় সৎ ছেলে তোমার যাতে কষ্ট না হয় তিনি অবশ্য তা করবেন

পিতার কথাগুলি লতিফনের গায়ে আগুন ঢালিয়া দিল। সে স্থির করিল,—তাহার স্বামী যে একজন ভাল লোক পিতার এ বিশ্বাস ভাঙ্গিতেই হইবে

আবদুল গফুর সাহেবের পত্র পাইয়া আবদুল করিম ২ দিনের ছুটী লইয় তাঁহাদের বাড়ী আসিলেন পিতা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে, লতিফন যাইয়া বলিল—শুনেছেন বাপজান, আপনার জামাইকে আপনিত ফেরেস্তা বলেই জানেন—সে বলছে—আপনি যদি আমাকে ছেড়ে না দেন তবে আপনার মাথা ভেঙ্গে সে আমাকে

লয়ে যাবে   সে আমার স্বামী, আমার দেবতা, আমি তাঁর দাসী আমাকে যা বলে বলুক, মাথা পেতে নেব   কিন্তু আমার পিতাকে অপমান আমার অসহ্য!

প্রকৃত পক্ষে আবদুল করিম লতিফনকে লইয়া যাইবার কোন কথাই বলেন নাই

আবদুল গফুর সাহেব ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন—তুমি বলগে আমি জীবন থাকতে তোমাকে সেখানে যেতে দেব না। আর বলগে সে যেন আমার সামনে না আসে

লতিফন যাইয়া আবদুল করিমকে বলিল সেদিন ত তুমি আমাকে দূর করে দিয়েছ, ও সত্ত্বেও আমি আবার তোমার বাড়ী যাবার কথা বললুম,—বাপ বললেন—এ জীবনে তিনি আমাকে যেতে দেবেন না আমি বল্লেম—রাগের বশে এক কথা হয়েছে—তাই বলে কি আমি যাব না— হাজার হলেও স্বামী   তা শুনে তিনি কঠোর আদেশ দিলেন—আর আমি যদি সেখানে যাই তিনি আমার মুখ দেখবেন না। এখন আমি কি করি? আর তুমি আমাকে লয়েই বা কি করবে!—

"ঠিক বলেছ লতিফন—এই আমি চল্লুম"—বলিয়া আবদুল করিম দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন   আজ এ পথ বড় দীর্ঘ হইল। লতিফনের সমস্ত রূপ আজ তাঁহার নিকট পরিষ্কার হইয়া দেখা দিল   তিনি বুঝিলেন—লতিফন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিষ উদ্গীরণ করিয়া তাঁহার জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিতেছে, সংসার পথ তাঁহার নিকট কণ্টকাকীর্ণ। শান্তি কোথায় উড়িয়া গিয়াছে।

সেই পথেই তিনি আপিসে গিয়া আপিসের কাজ সারিয়া যখন বাড়ী আসিলেন—তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আজ আহার না করিয়াই তিনি শয্যায় ঢলিয়া পড়িলেন

যে দুনিয়া বাল্যকালে স্বর্গের সুষমা আনিয়া সম্মুখে ধরিত, যে পৃথিবী, বৃক্ষ-লতা পুষ্প পরিশোভিত উদ্যান বলিয়া বোধ হইত, বই হাতে করিয়া স্কুলে যাইবার সময় কত আশা বুকে আসিয়া ঝঙ্কার দিত ভবিষ্যত-সুখের কত ছবি চক্ষুর সামনে ভাসিয়া আসিত। বিবাহ—আনন্দময়, স্বপ্নময় বিবাহের পর স্বর্গের সরলতা-মাখা দেবী আসিয়া জগৎ ভরা ভালবাসা দিয়া ঘিরিয়া রাখিবে, জীবন-সহচরী বেহেস্তের হাসি কুড়াইয়া আনিয়া আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিবে, তাহার সুধামাখা স্বর কর্ণকুহরে অমৃত ধারা ঢালিয়া দিবে, তখন জগতের ভীষণ তাপ, জ্বালা কোথায় উড়িয়া গিয়া কি এক অবক্তব্য আনন্দরাশি বুকে হাসিয়া উঠিবে। কিন্তু হায়! সকলই এখন স্বপ্ন।

আবদুল করিম অধীরভাবে শয্যার উপর অনেকক্ষণ এ পাশ ও পাশ করিতে লাগিলেন। যে শয্যা কোনদিন পুষ্প-পরাগ-তুল্য কোমল বোধ হইত আজ তাহা অসংখ্য কণ্টকে পূর্ণ তিনি শয্যায় থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া বসিলেন। চৌকীর উপর হইতে উঠিয়া মেঝেতে শুধু মাটীর উপর গড়াইলেন হৃদয়ের জ্বালা নিভিল না। আবার উঠিয়া বসিলেন দীপালোকে দেখিলেন, গৃহকোণে একখানা ছুরিকা পড়িয়া আছে, তাহা উঠাইয়া হাতে লইয়া ভাবিলেন—আর কেন? আর সহ্য করতে পারি না, এই ছুরি দিয়ে সব শেষ করব- সকল চিন্তার আগুন থেকে চিরদিনের জন্য দূরে—বহুদূরে সরে যাবে আর না, খুব সহ্য করেছি, রক্তমাংসের শরীর-না হলে ফেটে যেত। হায়, যে লতিফনকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি, যার সুখের জন্য এ দেহকে একেবারে ক্ষয় করেছি, যার হাসিমুখ দেখবার জন্য অনাহারে অর্দ্ধাহারে, ছিন্ন কাপড়ে কাটিয়েছি, ভীষণ শীতের সময় কাপড় অভাবে আমি নগ্নদেহে থর থর করে কেঁপেছি আর তাকে সাধ্যের অতিরিক্ত টাকা দিয়েও কাপড় কিনে

দিয়েছি মনে আছে—মনে আছে সে একবার ভীষণ কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়, আমি ছয়দিন ছয়রাত অনাহারে অনিদ্রায় থেকে তার শুশ্রূষা কর্ত্তে কর্ত্তে আমিও সেই ভীষণ রোগের হাতে পড়ে মরতে বসেছিলাম সকলই মনে পড়ে—কিন্তু সকলই বৃথা! আর ভাবতে পারিনে। ভাবনাই জীবনের সার করেছি এখন সকল ভাবনা মিটাব। আবদুল করিম ছুরিকা লইয়া গলদেশে ধরিয়া বলিলেন—খোদ, আমি তোমার বান্দা, আজ তোমার কাছে ফিরে যাচ্ছি। তুমি তোমার দাসকে গ্রহণ কর রছুলের সাফায়াত যেন এ অধমের ভাগ্যে ঘটে তোমার বেহেস্তের ফোয়ারার সরাবন তহুরা দিয়ে এ তাপিত, দগ্ধ প্রাণকে শীতল কর।—তোমার রূপের যে 'আলোক' দেখবার জন্য কোটী কোটী প্রাণ তোমার দিকে ছুটছে, সে আলো যেন আমার চোখে দেখতে পাই খোদা

আবদুল করিম ছুরিক দ্বারা গলদেশে একবার আঘাত করিতেই তাঁহার মনে হইল—কি ভয়ানক! আমি কি করছি!—আমি তাপিত প্রাণ লয়ে যে মহা সিংহাসনের ছায়ার আশায় এ করছি—তিনি কি বলেন নাই—আত্মঘাতকের জন্য দোজখের আগুন ধু ধু জ্বলছে। কি করব খোদা বলে দাও, আমি কি করব?

তিনি ছুরিকা হস্তে মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন কে যেন হৃদয়ের মধ্যে বজ্রনির্ঘোষে বলিল—তোমাকে দাও, এখনি সব জ্বালা নিভে যাবে

আবদুল করিম উঠিয়া বসিলেন, ভাবিলেন—তাইত, তবে কেন—আর পুড়ি কেন? আলোকের সুধাধারা দিয়ে এখনই সব আগুন নিভিয়ে ফেলব।

আবদুল করিম ছুরিকা দূরে নিক্ষেপ করিয়া কাগজ কলম লইয়া

লিখিতে আরম্ভ করিলেন। অশ্রুধারা ঝর ঝর করিয়া পড়িয়া কাগজ ভিজাইয়া দিতে লাগিল সদ্য লিখিত বাক্যগুলি চোখের জলে ধুইয়া যাইতে লাগিল আবার হঠাৎ লেখনী বন্ধ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, —কি করছি,—আবার চিন্তা করি—যে লতিফনকে প্রাণ দিয়ে ভাল-বেসেছি, তাকে জীবনের জন্য পরিত্যাগ,—এও যে সইতে পারি না! এত কষ্ট করে যাকে সুখী করতে চেষ্টা করেছি, তাকে চিরদিনের জন্য পরি-ত্যাগ! কি করব! আর যে উপায় দেখি না! হায়, আমি কি করব ঐ যে লতিফনের ছলনার আগুন দাউ দাউ করে আমাকে পোড়াতে আসছে, এও ত আর সহ্য করতে পারছি না ঠিক করছি,—এই প্রশস্ত পথ আর কেন! খুব চিন্তা করেছি, খুব ভেবেছি —লতিফন, তোমার জ্বালান আগুনে পুড়ে পুড়ে মরেছি, আবার তোমার মোহে ভুলে সেই আগুন বুকে করে রয়েছি। নীরবে অনেক সয়েছি। আর পারি না

আবদুল করিম হৃদয়ের সমস্ত শক্তি জাগ্রত করিয়া, সমস্ত ছড়ান চিন্তা একত্র করিয়া দেখিলেন—এই প্রশস্ত পথ তিনি তালাকনামা লিখিয়া শেষ করিলেন ইসলাম, তোমারই মধ্যে এমনি সুন্দরতম প্রশস্ততম পথ আছে, যা আত্মহত্যারূপ মহাপাতকের হস্ত হইতে মানুষকে অতি সহজে উদ্ধার করিতে সক্ষম!

দুই দিন পর লতিফনের পিতা এক পত্র পাইলেন পত্রপাঠ করিয়া লতিফনের নিকট পাঠাইয়া দিয়া তিনি বৈঠকখানা ঘরে মাথায় হাত দিয়া বসিলেন সেই পত্রে লতিফনের আনুপূর্ব্বিক ব্যবহার এবং কথা সমস্তই বিবৃত ছিল এবং তৎসঙ্গে তালাকনামাও প্রেরিত হইয়াছিল। বাড়ীর মধ্যে লতিফন পত্র পাঠ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল

(১৮)

আজ নুরন এক অপূর্ব্ব বেদনার উত্তাপে ছটফট করিতেছিল। সে খোদার দিকে চাহিয় বলিল—খোদা, আমার হৃদয়টা পাথরের মত বোধহীন করে দাও, চিন্তাশক্তি লুপ্ত হউক, বোধশক্তি লীন হউক, ভাববার ক্ষমতা পুড়ে ছাই হউক জোবেহ করা প্রাণীর গা থেকে চামড়া খসিয়ে নিলে সে যেমন আহা উহু করে না আমায় সেইরূপ বোধ-হীন কর। খোদা, এত চিন্তার ঢেউ এসে মনের পাড়িগুলি যে ভেঙ্গে ফেললে, তুমি নীরবে সব দেখচ! এমন ধারা কত দৃশ্য পলে পলে এঁকে তোমার সৃষ্টিকৌশলের কি তাৎপর্য্য দেখাও খোদা? মানুষের ছেঁড়া, কাটা রক্তমাখা হৃদয়খানি বের করে একটা রেকাবীর উপর রেখে দেখ—কেমন দেখায়! এ সব দেখে তোমার লাভ কি? নিরাশ প্রাণের হাহাকার, ক্ষুধাতুরের জঠরজ্বালা, আর্ত্তের ক্রন্দন, দেখিয়া তোমার লাভ কি? তাইত, আবার ভাবি, আমি বালিকা, আমার অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান দিয়ে তোমার মহীয়সী শক্তির খেলা কি বুঝব! আমার বোধ হয় লাভ অবশ্যই আছে, কোন্ লোকসানের মধ্য দিয়া কি লাভ এনে দাও, তা কি করে বুঝি! আমি পুতুল, তোমার মত পুতুলনির্ম্মাতার গৌরব কি করে বুঝি, (১) যেটা ভাবি ভাল যেটা তোমার কাছে চাই, হয়ত দেখি সেটা মধুরূপে গরল। যেটা চাই না, যেটা বিষ বলে দূরে রাখ্‌তে চাই, সেটা দেখি গরলরূপে সুস্বাদু মধু। তাই ভাবি কষ্টদাতা, কি করিয়া বুঝ্‌ব জগতে কোনটী ভাল।

আজ নুরনের বিবাহ কোর্ম্মা পোলাও, কালিয়া, কোপ্তা, জরদা,

(১) Socrates knew that he knew nothing

ফির্ণি, মোছাল্লান, শিককাবাব, বিরিয়ানি, পারটা হালোয়া ইত্যাদি আহার্য্যের সুগন্ধে আজ শিকদার বাড়ী ভরপুর। সয়তান বাতাস সে সুগন্ধ বহিয়া আনিয়া লেখকের মত একজন কোর্ম্মা পোলাও-লোভী অথচ শিকদারদের সঙ্গে কোন কারণ বশতঃ একটু মনোমালিন্য আছে বলিয়া দাওয়াত হইলেও তাহা রক্ষা না করিয়া অভিমান রক্ষা করিতে হইবে—এমন ব্যক্তির পরিপাক ক্রিয়া বর্দ্ধিত করিয়া দিতে লাগিল। গেলেও হয়,—খাবার সময় আবার ঝগড়া কি?—যা হবার তা একদিন হয়ে গেছে—এমন সুবুদ্ধিও মন কখন কখন যোগাইয়া দিতে লাগিল। খুব সমারোহ। পানি দাওরে, হুকাটা ভর তো রে, চেয়ার আন রে, বিছানা পাত রে, তামাক সাজ রে, একে কেওড়া দিয়ে এক গ্লাস সরবত এনে দে রে, খোনকার সাহেব এত দেরী করে এলেন কেন? ছৈয়দ সাহেব, বড় ব্যস্ততা জন্য লোক না পাঠিয়ে ডাকে চিঠি দিয়েছি কিছু মনে করবেন না, গোস্তটা নেড়ে দে ত, পুড়ে যাবে, তুই দেনা, আমাকে কর্ত্তা ডাকছেন, আরে জুড়ন ভাই। কল্‌কেটায় একটু ভাল আগুন তোলত, তামুক খেয়ে সুখ হল না—ইত্যাদি কলরবে শিকদার বাড়ী মুখরিত। কদলীপত্রের সুমোহন বেণু প্রস্তুত করিয়া গোষ্ঠে যাইবার জন্য বালকগণ ব্যস্ত কাহার বেণুটা ভাল হইয়াছে এই মহা তর্ক লইয়া পরস্পর কর্ণ মর্দ্দনের ব্যবস্থা যে না হইয়াছিল তাহা নয়। স্কুলের কোন আদবওয়ালা ছেলে ফুরছি হুকাটা ফরাসের উপর হইতে চুপে চুপে টানিয়া লইয়া ঘরের পিছনে যাইয়া টানিতে লাগিল। ফরাসে উপবিষ্ট পিতা, উল্লুক ছোঁড়াটা একেবারে জগতটা সরাইয়া লইয়া গেল দেখিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। কেন টাকা খরচ ক'রে এদের লেখাপড়া শিখাই; আচ্ছা নিলি, নিলি, আর একটা নারিকেলি ভাববার সত্ত অগ্নি সজ্জিত করে দিয়েই বা ওটা লয়ে যা, আজকালকার

ছেলেদের একেবারেই কাণ্ডজ্ঞান নাই ইত্যাদি ছেলেদের সম্বন্ধে নিগূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব মনে মনে আবিষ্কার করিতে লাগিলেন

দাওয়াত রক্ষা না করা ভদ্রতা ও নীতিবিরুদ্ধ। আবদুল কাদের তাই কঠিন দাবানল বুকে চাপিয়া রফিকুল ইছলামের সঙ্গে এক নৌকায় আসিতেছিলেন পথিমধ্যে রফিক, আবদুল কাদেরকে বলিল—কেন হে, তুমি সেদিন বল্লে যে নুরনকে তুমি বিবাহ করতে চাওনা, আবার দেখি যে মুখটা ভার করে বসে আছ! আমি জানি এ কয় মাস তোমার মনের মধ্যে কি ভীষণ যুদ্ধ চলছে এক দিকে ন্যায়ের শাণিত অস্ত্র অন্য দিকে ভালবাসা! সব বুঝ্‌তে পারছি, কিন্তু কি কর্‌ব ভাই! বাস্তব-জীবনে কত লোকের হৃদয়ভরা ভালবাসা, অতল জলে ডুবেছে! কত হৃদয় ভেঙ্গে চুরে ছারখার হয়েছে কত স্নেহের বন্ধন নির্ম্মম আঘাতে ছিন্ন হয়েছে. কত হৃদয়ের হাহাশ্বাস আকাশ বিদীর্ণ করেছে! তুমিত ভাই বলেছ সব ইচ্ছা খোদার ইচ্ছার মধ্যে মিশিয়ে দাও

আবদুল কাদের সমস্ত দুঃখ চাপা দিয়া বাহ্যিক হাস মুখে বলিলেন—ভাল হল হে ভাল হল, আমি বেটা কি ঘোড়ার ঘাস কাটতে পারব যে নুরন আমায় বাহাল কর্‌বে?

আবদুল কাদের এবং রফিক পৌছিবার কিছুক্ষণ পরেই বিবাহের বর আসিল সদ্য-বিবাহিতা উচ্চ ধরণের পরদানসিন, বুক পর্য্যন্ত ঘোমটা টানা অর্দ্ধাঙ্গিনী—যাহার সামান্য একটা কথা শুনিবার জন্য পিতার বহু কষ্টের উপার্জ্জিত অর্থ দিয়া, কলেজের ছুটি হইলে, কলিকাতা হইতে মূল্যবান সাবান, ল্যাভেণ্ডার, অট-ডি-রোজ, তোয়ালে, আলতা প্রভৃতি আনিয়া পদপঙ্কজে অর্পণ করিতে হয় সে আজ বিনা আবেদনে "আপনি এখন বসেন, আমি একটু, আসি" বলিয়া বিবাহের বর দেখিবার জন্য স্বামীর বাহুপাশ ছাড়িয়া জানালার পাশ আলিঙ্গন করিল শুদ্ধ বাঙ্গালায়

'বর'কে যদি 'ববাহ' বলে, তবে আমাদের বরাহ জোনাবালি সকলকে দেখা দিয়া নূরনদের বাটী উপস্থিত হইল

অনেক কথা কাটাকাটির পর এবং জোনাবালি, কাবিনের শর্ত্ত লইয়া তর্ক করিতে করিতে অনেক সময় ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিলেও কাবিন লেখা সম্পন্ন হইল। আহারান্তে বিবাহ পড়ান হইবে স্থির হওয়ায় দেখিতে দেখিতে রেকাবী, ডিস, কোর্ম্মাদানীতে গৃহের কোণ পূর্ণ হইল শিকদার সাহেবের নির্ব্বন্ধ অনুরোধে আবদুল কাদেরের অনুনয়পূর্ণ ঘোর প্রতিবাদসত্ত্বেও তাঁহাকে খাদেম নিযুক্ত হইতে হইল

জোনাবালিকে দেখিয়াই তাঁহার বুকের মধ্যে প্রবল ঝড় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া বহিতেছিল তাহার উপর জোনাবালিকে স্বহস্তে পরিবেশন করিতে গিয়া তাঁহার হস্ত যেন একেবারে অবশ হইয়া পড়িল সদ্যহত্যা-জন্য আনীত ছাগের ন্যায়, সদ্যকুঠারাঘাতপ্রাপ্ত বৃক্ষের ন্যায় দেহমন কাঁপিয়া কাঁপিয়া মুছড়িয়া যাইতে লাগিল

মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ধমনীতে ধমনীতে তড়িৎপ্রবাহ ছুটিতে লাগিল। দূর বিস্তৃত মরুভূমির অগ্নি-সম বায়ু হৃদয়ের উপর স্পর্শ দিতে লাগিল। কিন্তু উপায় নাই, সমস্ত দুঃখের আগুন কঠোর শক্তিপ্রয়োগে চাপিয়া রাখিয়া সকলের সঙ্গে জোনাবালিকেও পরিবেশন করিলেন। মানুষকে পৃথিবীতে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কত দুরূহ ও ঘোর অপ্রিয় কর্ম্মকেও হাসিমুখে গ্রহণ করিতে হয়। কত কঠিন ঝড় বুকে ঢাকিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হয় আবদুল কাদেরের মনের বেদনা ক্রমে এতই অসহ্য হইয়া উঠিল যে, বন্ধু-সমাজে তাঁহার এই দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইবার ভয়ে তিনি, শরীর অসুস্থ হইয়াছে বলিয়া শিকদার সাহেবের নিকট বাড়ী যাইবার জন্য বিদায় প্রার্থনা করিলেন শিকদার সাহেব বিস্ময়-বিস্ফারিত-লোচনে তাঁহার হাত ধরিয়া বাটীর মধ্যে লইয়া নূরনকে বলিলেন—মা নূরন, আবদুল

কাদের মিঞা এখনই বাড়ী যাবেন, তাঁর শরীর অসুস্থ হয়েছে, কিছুতেই থাকবেন না, তুমি একে কিছু খেতে দাও, কিছু না খেয়ে যেতে দেব না

বলা বাহুল্য মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় হইলেও এঁদের পরস্পরের বাড়ীর মধ্যে যাতায়াত এবং পরস্পর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল

পিতার আহ্বান শুনিয়া নুরন দ্রুত আসিয়া আবদুল কাদেরকে দেখিয়া উপর তালার রেলিং ধরিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল আজ কি যেন এক অজ্ঞাত ভাবের তাড়না তাহাকে গৃহের মধ্যে টানিতে লাগিল। কিন্তু মনুষ্য-শরীরে প্রবল অশনিপাত হইলে যেমন সে স্পন্দনহীন হইয়া যায়, শরীরের কোন স্থানে অনবরত ভীষণ কষ্ট দিতে থাকিলে যেমন সেস্থান বোধহীন হইয়া যায়, জিহ্বার দ্বারা অনবরত কোন ঘোর বিস্বাদ পদার্থের আস্বাদ লইতে লইতে যেমন তাহার বোধশক্তি বিলীন হয়, লোকের মনের বেদনাও যখন চরমে উঠে তখন তাহার বেদনা বোধ করিবার ক্ষমতাও তেমনি লয় পায় নিরাশার বিদ্যুৎপাতে আজ নুরনও তেমনি অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। কোন প্রকৃত অপরাধীকে যদি কিছু দিনের জন্য জেলে দেওয়া যায়, সে কাঁদিয়া বক্ষ ভাসায়, কিন্তু নিরপরাধীকে ফাঁসিতে লটকাই-বার জন্য যখন জল্লাদ লইয়া যায় তখন সে কাঁদে না, তাহার মনের বেদনার স্বর স্তব্ধ হইয়া যায়, তাহার বোধশক্তি বেদনার সীমা ছাড়াইয়া যাইয়া সে সময় সে এক অপূর্ব জ্যোতিষ্মান মূর্ত্তি গ্রহণ করে; আবদুল কাদেরকে দেখিয়া নুরনের পবিত্র মূর্ত্তি তেমনি অপূর্ব দৃঢ়তায়, অপূর্ব জ্যোতিঃতে, উদ্ভাসিত হইয়া যেন তাপসীবেশে আবদুল কাদেরকে দেখা দিল সিকদার সাহেব আবদুল কাদেরকে উপর তালায় পৌঁছাইয়া দিয়া তাঁহার আহার্য্য আনিয়া দিবার জন্য নুরনকে দৃঢ় আদেশ দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন

সিকদার সাহেব অতি 'সাদা" লোক বিবাহের দিনে নুরনকে এরূপ আদেশ দেওয়া উচিৎ কি অনুচিত অতটা মাথা ঘামান তাঁহার স্বভাবের বাহিরে

নুরন পিতার আদেশ অনুযায়ী ক্ষিপ্রতার সহিত সমস্ত আহার্য্য আনিয়া আবদুল কাদেরের সম্মুখে রাখিল। সিকদার সাহেব বাহিরে যাইতে যাইতে আবার মুখ ফিরাইয়া, "আবদুল কাদেরকে খাওয়াতে কোন ত্রুটী না হয়"—বলিয়া চলিয়া গেলেন। আহার্য্য দিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া নুরন আবদুল কাদেরের দিকে চাহিল,—দেখিল, —কি এক অব্যক্ত বেদনার জলদ-জাল তাঁহার মুখের উপর রাজ্য করিতেছে মুখের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতার সহিত বেদনার মিশ্রণে মুখের সৌন্দর্য্য আশ্চর্য্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে সে মুখ নীরব নিথর আকাশের ছবির ন্যায় ধীর স্থির। বাকী আহার্য্য আনিয়া সম্মুখে দিতে নুরনের হস্তের কম্পন আবদুল কাদেরের চক্ষু এড়াইল না এবং সে কম্পনের হিল্লোল তাঁহার হৃদয়ও কঠিনভাবে স্পর্শ করিল এতক্ষণ আবদুল কাদের নুরনের দিকে তাকাইতে পারেন নাই এবং সে চেষ্টাও করেন নাই, কিন্তু হঠাৎ বিনা চেষ্টাতেই চক্ষু নুরনের মুখের উপর পড়িলে দেখিলেন,—সহিষ্ণুতার সহিত মনের কি এক প্রবল যুদ্ধের কোলাহল সে মুখ দিয়া ঠিকরিয়া পড়িতেছে। সমস্ত জগতের বেদনা সে মুখের উপর পুঞ্জীভূত হইয়া এক বিশাল ঘূর্ণিবায়ু সৃষ্টি করতঃ সমস্ত কালিমা উড়াইয়া লইয়া সদ্যপ্রসূত বালিকার মুখের মত যেন নির্ব্বিকার ও মহিমাময় করিয়া দিতেছে।

নুরনের মুখের এই ছবি দেখিয়া সহসা আবদুল কাদেরের মুখ খুলিল, তিনি বলিলেন—নুরন, আমরা বড় ভুল করেছি, তুমি আমার অতি ঘনিষ্ট আত্মীয় না হলেও, অতি নিকট আত্মীয় হতেও স্নেহের বন্ধন তোমার

সঙ্গে হয়েছিল তুমি পাগলের মত ভুল করেছ, আমার মত পথের ভিখারীর সঙ্গে তোমার ঐ মূল্যবান জীবন বেঁধে দেওয়া কোন মতেই সঙ্গত হতে পারে না তুমি বোধ হয় জান যে, মাথা রাখবার একটু মাটীও আমার আর নাই যাক খোদা তোমাকে উপযুক্ত হস্তে অর্পণ করুন—এই এখন আমার কামনা। নূরন গম্ভীর—দৃঢ় স্বরে বলিল—ভাই, দুনিয়াটা যেমন নিষ্ঠুর তুমি তার চেয়েও নির্ম্মম, আজকে তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হলে বোধ হয় ভাল হত —তুমি পথের ভিখারী একথা আমাকে বলে ব্যাথা দিতে পারতে না ভাই, যদি কোন খাতা করে থাকি মাপ ক'রো

নূরন, আমি সত্যই কঠিন, তা না হলে তোমার বিবাহে আসবার ক্ষমতা আমার কখনও হত না আর মানুষের মন ভগ্নি, তোমাকে অন্তরের দিকে ভিন্নরূপে অনেকবার টেনেছি বটে, আবার যখন নিজের অবস্থার কথা ভেবেছি তখন তোমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি আজ চিরদিনের জন্ত দূরে সরিয়ে দিচ্ছি—জীবনে এই শেষ দেখা আমি চল্লুম, খোদার দরগায় মনাজাত করি,—তুমি যেন শুধু সুখী না হয়ে শান্তিও পাও

বিবাহ পড়ানর জন্ত আলেম যখন জোনাব আলীর নিকট গিয়া বসিলেন—আবদুল কাদের সকলের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

পরিচ্ছেদ।

(১৯)

হিমালয়-পথে

আবদুল কাদের নৌকাযোগে যখন বাড়ী পৌঁছিলেন তখন সূর্য্যোদয় হইয়াছে টেবিলের উপর একখানা পত্র পড়িয়া ছিল, খুলিয়া দেখিলেন—পত্রখানা দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে তাহার বাল্যবন্ধু রমেশ লিখিয়াছে রমেশ অসুস্থতাবশতঃ হাওয়া পরিবর্ত্তনে দার্জ্জিলিঙ্গ গিয়াছিল। আবদুল কাদের রফিকের মাতার নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করিবার পর রমেশকে লিখিয়াছিলেন—ভাই, আমি বিশেষ কারণে কতকগুলি টাকার ঋণী হয়েছি চাকরী ভিন্ন সে টাকা শোধ দিবার আমার কোন উপায় নাই, এম, এ পরীক্ষা দেওয়া বোধ হয় আর ঘটবে না, আশা করি আমার জন্য একটা চাকরী জোগাড় করবে

রমেশ উত্তর দিয়াছে—প্রিয় আবদুল কাদের, তোমার জন্য একটা চাকরী জোগাড় করিয়াছি, বঙ্গের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর সাহেবের সঙ্গে ৫ দিনের মধ্যে দেখা করিতে হইবে, পত্র পাঠ চলিয়া আসিবা

আবদুলকাদের স্বহস্তেই সামান্য আহার্য্য পাক করিয়া স্নানাহার সারিয়া—দার্জ্জিলিং যাত্রা করিলেন

পোড়াদহ ও শান্তাহার জংশন অতিক্রম করিয়া তিনি শিলিগুড়ি অবতরণ করিলেন এখানে দার্জ্জিলিং-হিমালয়-রেলওয়ের ক্ষুদ্র ট্রেনে আরোহণ করিলে ট্রেন ছাড়িল তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে বেড়া নাই

একেবারে খোলা, কেবল বসিবার বেঞ্চের দুইধারে অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত লোহার হাতা।

শিলিগুড়ি হইতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই ধূসরবর্ণ পর্ব্বতশৃঙ্গ স্পষ্টরূপে নয়নপথে পতিত হইল। রৌদ্রের কিরণ তাহার উপর পড়িয়া কি এক অপূর্ব্ব ছবি আঁকিয়া দিতেছে! গাড়ীখানি ঘোর বনরাজির বক্ষ ভেদ করিয়া চলিল ক্রমে ক্রমে পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করিয়া, গাড়ী উপরে উঠিতে লাগিল আবদুল কাদেরের চোখের উপর দিয়া পাহাড়গুলি সচল বস্তুর ন্যায় যেমন সরিয়া যাইতে লাগিল—আবদুল কাদেরও নুরনের স্মৃতিকে তেমন করিয়া পশ্চাতে রাখিয়া যাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু নূতন নূতন পাহাড় আবার যখন চক্ষুর সম্মুখে নূতন নূতন রূপ লইয়া আসিতে লাগিল, নুরনের স্মৃতিও নূতন করিয়া হৃদয়ের মধ্যে জাগিয়া উঠিতে লাগিল (১)

তিনি ভাবিলেন তার স্মৃতি বুকে রাখা কি আমার পাপ নয়? সে ত এখন পরস্ত্রী। তাকে ভুলে গোলা থেকে বাঁচতে চেষ্টা করব। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট বসতি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরগুলি দূর হইতে যেন পাখীর বাসার মত দেখা যাইতেছে। আবদুলকাদের সেগুলিকে বুকে টানিয়া লইতে লাগিলেন। পাহাড়ীয়ারা কেহ পানির কলসী পৃষ্ঠে রাখিয়া তাহার রশি কপালের সহিত বাধাইয়া পাহাড়ে উঠিতেছে তাহাদের কি বল! কি বলিষ্ঠ দেহ! মুক্ত পাহাড়ের বাতাস তাহাদের দেহে কি এক অপূর্ব্ব শক্তি প্রদান করিয়াছে বড় বড় ঝরণাগুলি

---

(১) But he who stems the flood with sand,
And flatters flame with flaxen band
Has yet a harder task to prove
By firm reasolve to conquer love —Scott

আবহমানকাল পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে বহিয়া আসিয়া নিম্নে পড়িতেছে। সেই প্রবাহ বৃহদাকার শিলাখণ্ডের উপর আছাড় খাইয়া বালকের মুখের নিষ্পাপ হাসির মত হাস্য করিতে করিতে নিম্নে নামিয়া আসিতেছে। সে হাসির সহিত সূর্য্যের হাসি মিলিয়া অনন্ত হাসির সৃষ্টি করিয়া দিতেছে।

নূতন নূতন নিঝুম নিস্তব্ধ পাহাড় এমন অসীম, এমন বিশাল। এমন বিরাট মূর্ত্তি! এমন নির্ব্বিকার শান্তিভরা অনন্তপাহাড়! খোদা এমন সব রাজ্যের অধীশ্বর! কি নিবিড় জঙ্গল! বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের তলদেশ কি গম্ভীর, কি নিস্তব্ধ. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতা সকল ছোট ছোট গাছের গা জড়াইয়া উপরে উঠিয়াছে লতার গায়ে সুগন্ধ কি গন্ধহীন ফুলগুলি ফুটিয়া প্রকৃতির এ বিশাল উদ্যানে গন্ধ এবং সৌন্দর্য্য বিলাইয়া দিতেছে। এই বিরাট পাহাড়, বিরাট জঙ্গল, বিরাট খোদার বিরাট মহিমা ঘোষণা করিতেছে দুই একস্থানে বনজাত তৃণজাতীয় পুষ্প, হাসির ফোয়ারা ছড়াইয়া ট্রেনের বেগজনিত বায়ুর সঙ্গে দোল খাইতেছে। চলন্ত গাড়ীর মধ্য হইতে হাত বাড়াইয়া আবদুল কাদের কয়েকটী হাসিমাখা ফুল কুড়াইয়া লইলেন

যতই পাহাড়ের অন্তরদেশে গাড়ী প্রবেশ করিতে লাগিল ততই এই স্বভাবের নগ্ন সৌন্দর্য্য আবদুল কাদেরের ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্নেহের হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। পানি লইবার জন্য একস্থানে গাড়ী থামিল। একটী পাহাড়িয়া দম্পতী জঙ্গলের মধ্য হইতে কয়েকটী বালকসহ আসিয়া গাড়ীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গান ধরিল ৪ ৫ বৎসর বয়স্ক দুইটী বালক-বালিকা হাত নাড়িয়া নাড়িয়া নাচিতে এবং গান করিতে লাগিল পাহাড়িয়া যুবকটী হাতে একটী পার্ব্বত্য অতি সাদাসিদা দুই তার-ওয়ালা কদাকার যন্ত্র বাজাইতে লাগিল তাহার স্ত্রী তাহার সঙ্গে গাহিতে লাগিল। সেই পার্ব্বত্য বাঁশীর পার্ব্বত্য সুর পার্ব্বত্য অশিক্ষিত হস্তে

যাহা বাজাইল তাহা কি মধুর! কি প্রাণস্পর্শী! তানলয় এমন কিছুই নাই যাহাদ্বারা আমাদের সহরবাসী, থিয়েটার-গমনকারী বাবুদের কর্ণে সুখ দিতে পারে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা বড়ই কবিত্বভরা। সে গান গাড়ীর আরোহীদের কর্ণে নিনাদিত হইয়া পাহাড়ের গায় ঢেউ খেলিতে লাগিল গাড়ী ছাড়িয়া কতক্ষণ পর দার্জ্জিলিং পৌঁছিল

রমেশ ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল, সে আবদুল কাদেরকে মৃত্যুর কবল হইতে বাঁচিবার পর এই প্রথম দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল

আবদুল কাদের গাড়ী হইতে নামিয়া দেখিলেন, পার্ব্বত্য ধরণে কাপড় পরা কতকগুলি সুন্দরী যুবতী তাঁহার বোচকা বহিয়া লইবার জন্য কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল তাহাদের রক্তবর্ণ গণ্ডস্থল হইতে যেন রক্ত বিচ্ছুরিত হইয়া বাহির হইতেছে দুইটী পাহাড়িয়া রমণী ঝাঁকায় বোচকা সকল রাখিয়া পিঠের উপর স্থাপনকরতঃ তাহার রসি কপালের সহিত বাধাইয়া দিয়া পাহাড়ের গায়ে উঠ—নামা করিয়া রমেশের বাসায় পৌঁছাইয়া দিল

পরদিন রবিবার, ডিরেক্টরের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না ভাবিয়া তাঁহারা ভ্রমণে বাহির হইলেন। বাজার অতিক্রম করিতে দেখিলেন, এক দোকানে রুটি কিনিয়া, মাখন কিনিতে হইলে পঞ্চাশ ষাট গজ উপরে বা নীচে নামিয়া ক্রয় করিতে হয় মাছের বাজার দুর্গন্ধময় মাছ অধিকাংশই পচা বা বরফ দেওয়া এখানে এরূপ মাছ ছাড়া পাইবার উপায় নাই তাঁহারা বাজার অতিক্রম করিয়া উদ্ভিদ-উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। কি বিচিত্র বৃক্ষসকল, কি বিচিত্র পত্র এবং ফল! কোনটি ফল মানুষের চুলের মত কোনটী বা পাথরের তৈয়ারী বলিয়া বোধ হয় বিচিত্র বৃক্ষের বিচিত্র পাতা এবং ফল খোদাতালার সৃষ্টির বিচিত্রতায় সাক্ষ্য দিতেছে।

পরদিন আবদুল কাদের ডিরেক্টারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ডিরেক্টর বলিলেন—এখন আপনি এইখানে গবর্ণমেণ্ট স্কুলে থাকুন, ৩০ দিন পর পহেলা তারিখ কার্যে যোগ দিবেন পরে আপনাকে পরিদর্শন বিভাগে দেওয়া যাইবে

বর্ত্তমানে মাহিনা ৫০ টাকা ও পাহাড়বাসের জন্য ২০ টাকা, মোট ৭০ টাকা নির্দ্ধারিত হইল

ডিরেক্টরের নিকট হইতে আসিয়া অপরাহ্নে তাঁহারা ভ্রমণে বহির্গত হইলেন আজ তাঁহারা অনেক দূরে গিয়া পাহাড়ের গায়ে এক স্থানে বসিলেন মেঘগুলি আসিয়া গা জড়াইয়া ধরিয়া গাত্রবস্ত্র সিক্ত করিতে লাগিল এই মেঘের দেশের মেঘের খেলা বড় মনোরম পায়ের নীচের দিকে কত মেঘ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কোনটি বা অন্য পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া আনন্দাশ্রু বহাইতেছে কতক্ষণ পর আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল আবদুলকাদের শ্রান্ত হইয়া এক স্থানে শুইয়া পড়িলেন। রমেশ বসিয়া থাকিল

এদিকে বসতি নাই। আবদুল কাদের তন্দ্রাভিভূত হইলেন। জঙ্গলের মধ্য হইতে পার্ব্বত্য বাঁশীর সুর দূর হইতে ভাসিয়া আসিয়া তন্দ্রার ঘোরে এক অপূর্ব্ব স্বপ্নময় দেশে তাঁহাকে লইয়া যাইতেছিল সে স্বরের সঙ্গে পাখীর স্বর মিলিয়া বেহস্তের গান-মাখা প্রবাহ বহাইতেছিল আবদুল কাদের পাখীর গানের মধ্যে স্নাত হইতে হইতে চক্ষু মেলিলেন দেখিলেন—সূর্য্য পাহাড়ের গায়ে একেবারে ঢলিয়া পড়িয়াছে চতুর্দ্দিকে চূড়ার উপর চূড়া যেন তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়া অনন্ত সমুদ্রে ঢেউ খেলিতেছে। দূরে বরফে ঢাকা চূড়া সকলের উপর সূর্য্যের শেষ রশ্মি ফেলিয়া কোন অদৃশ্য চিত্রকর অদৃশ্য তুলি দিয়া আলোর সহিত আঁধারের

বিচিত্র ছবি আঁকিতেছে আবদুল কাদের হৃদয়ের কপাট খুলিয়া এই ছবিগুলি বুকে আঁকিয়া লইলেন

রমেশ টেলিস্কোপটা আবদুল কাদেরকে দিয়া বলিলেন—ঐ দেখ, দূরে ঐ পাহাড়ের গায়ে ফোয়ারাগুলি (১) কেমন ক্রোশব্যাপী গাছপালা ভাঙ্গিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিতেছে বরফে ঢাকা পাহাড়গুলি যেন রূপার পাত দিয়া মোড়া আকাশের অংশ যেন সাদা কাপড় পরিয়াছে আবদুল কাদের রমেশকে বলিলেন—ভাই, দেশের খবরও আর লব না, আমার খবরও দেশকে দেব না দেশ থেকে সব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেছি এই নীরব নিঝুম পাহাড় বড়ই ভাল এ কত উদার, কত শ্রেয়ঃ, কত মহৎ! সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল তাঁহারা বাসায় ফিরিলেন

(১) গ্রন্থকার দার্জ্জিলিং এবং হিমালয়ের অন্যান্য স্থান ভ্রমণকালে এই রকমের নদীর পতন দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন

পরিচ্ছেদ

(২০)

কাবাপথে

মা নুরন, আমার ঘাড়ের উপর আর এক ফরজ আমার প্রতি সংসারের এই নির্দয় ব্যবহার, আত্মীয় স্বজনের গঞ্জনা আর সহ্য করতে পারি না কাবার কঠিন পথে এ সকল ভাবনা ভুলতে পারব তোমাদিগকে খোদার হাতে রেখে যাচ্ছি যে বাড়ী বেহেস্তের বাগান, তা এখন আমার কাছে দোজখ খোদাতালা তোমাদের দেখবেন। আমি আগামী পরশ্ব রওয়ানা হতে চাই।

নুরন চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল—বাপজান, আপনি খোদার আদেশ পালন করতে যেতেছেন, আমি খুশীমনে আপনাকে বিদায় দিচ্ছি আমাদের জন্য আপনি ভাববেন না। আমাদের কাছে খোদা আছেন।

তিন দিন পর অশ্রুজলের সহিত বিদায় লইয়া সিকদার সাহেব বোম্বাই পৌঁছিলেন

কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে. আজ বোম্বাই হইতে হজ-যাত্রী লইয়া জাহাজ জেদ্দাভিমুখে যাত্রা করিবে হজযাত্রীদের কলরবে নগর মুখরিত সমস্ত জিনিষ অগ্নিমূল্য

যাত্রীতে জাহাজের ডেক ভরিয়া গেল—ক্যাপটেনের সঙ্কেতে জাহাজ ছাড়িল ভীমকায় অর্ণবপোত সাগরবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া প্রকাণ্ড আগ্নেয়গিরির মত ধূম নির্গত করিতে করিতে ছুটিয়া চলিল

অনন্ত প্রসারিত সমুদ্র অর্ণবপোত যেন কোন অজানা দেশের দিকে অগ্রসর হইতেছে বিরাম নাই,—বিশ্রাম নাই মস্তকোপরি অনন্তবিস্তৃত, নীল আকাশ, নিম্নে অসীমঅনন্ত নীল জলধি এ আকাশ, এ পানি সিকদার সাহেবের অন্তঃকরণ স্পর্শ করিতে লাগিল রাত্রিকালের সমুদ্র কি মনোরম। অসংখ্য নক্ষত্র সাগর-বক্ষে অসংখ্য আলোক জ্বালিয়া দিয়াছে আর পশ্চাৎ পশ্চাৎ জাহাজের গতির ঢেউ আসিয়া তাহা খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দিতেছে। ঢেউএর উপর দিয়া বাতাস বহিয়া আসিয়া যেন দেহ ভেদ করিয়া মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিতেছে সিকদার সাহেব জাহাজের রেলিং ধরিয়া উপরে আকাশের দিকে আর নীচে সাগরের দিকে চাহিয়া ভাবিলেন—খোদা তুমি কত মহান্,—তোমার পৃথিবী নাকি যেমন দিনে এক বার ঘোরে সূর্য্য ও তেমনি পূর্ব্ব হ'তে পশ্চিমদিকে ২৫ দিনে একবার ঘোরে। এই অনন্ত আকাশে নাকি ৩০ কোটী নক্ষত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সূর্য্যের ন্যায় এরাও জ্বলছে, তাদের কিরণ এই পৃথিবীতে আসতে হাজার হাজার বছর কেটে যাচ্ছে। এ দুনিয়া আর তারা এই সূর্য্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। অনন্ত আকাশে এমন কোটী কোটী সূর্য্য আছে এই সকল সূর্য্য কোটী কোটী গ্রহ সঙ্গে করে এক মহাসূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরছে খোদা, তোমার এত বড় দুনিয়ার মধ্যে আমি কতটুকু। আর এত সূর্য্যের অধীশ্বর তুমি কত মহান!

প্রত্যহ প্রভাতে সমুদ্রের বক্ষ হইতে সূর্য্য উঠে,—জগতকে হাসাইয়া কাঁদাইয়া আমাদেরই মত সাগরের সীমাহীন বক্ষে আবার ডুবিয়া যায়। উষা কালে রক্তমাখা কিরণ জাল বিস্তার করিতে করিতে যখন পানির মধ্য হইতে সূর্য্য উঠিতে থাকে, সিকদার সাহেব তন্ময় হইয়া

সেদিকে চাহিয়া ভাবেন—জগতে কে এমন পাষণ্ড আছে, যে খোদার এদান পেয়ে তাঁকে ছেজদা না করে ?

আবার সূর্য্য যখন সহস্র কিরণ সমুদ্রের বুকে ঢালিয়া দিতে দিতে পানির উপর টলমলে প্রতিবিম্ব বিলাইতে বিলাইতে কোন পারের দেশে ডুবিয়া যায়—সিকদার সাহেব এক দৃষ্টে চাহিয়া থাবেন কয়েকদিন প্রকৃতির এমনি নগ্ন সৌন্দর্য্য দেখাইয়া জাহাজ জেদ্দা বন্দরে পৌঁছিল তথা হইতে তিনি মক্কা শরিফে যাইয়া হজ্ব ব্রত উদ্‌যাপন করিলেন

মদিনা শরিফে যাইবার কাফেলা যাত্রা করিবার সময় জানিবার জন্য তিনি একদিন বাহির হইয়া দেখিতে পাইলেন—কাবা ঘরের নিকট কতকগুলি লোক এক স্থানে কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, আর তার মধ্য হইতে এক অব্যক্ত মধুর স্বর উঠিয়া শূন্যে বিলীন হইতেছে মনে হইতেছে যেন বেহেস্ত হইতে হুর সকল সুমধুর তানে সেই জগত-পাতার উদ্দেশ্যে গান ধরিয়াছে সমীরণ-স্পর্শে সে স্বর কাঁপিয়া কাঁপিয়া হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে আসিয়া ঝঙ্কৃত হইতেছে একটু অগ্রসর হইয়া বুঝিতে পারিলেন—কোরাণ শরিফের পবিত্র আয়েত পঠিত হইতেছে। আর বর্ত্তমান সময়ে পবিত্র মক্কা ভূমির প্রধান "কারী" মৌলানা মহিউদ্দিন বোখারী তাহা পাঠ করিতেছেন

সিকদার সাহেব মক্কা শরিফ ত্যাগ করিয়া পবিত্র মদিনাভিমুখে রওয়ানা হইলেন কয়েকদিন অগ্রসর হইবার পর দূর হইতে সেই পাপ-তাপ-ক্লিষ্ট ওম্মতের সাফায়াতকারী মহাপুরুষের মাজার শরিফের উপরিস্থিত সবুজ বর্ণের গম্বুজ যখন দৃষ্টি পথে পতিত হইল তখন তাঁহার মনের উপর যে ভাবের ঢেউ উঠিল তাহা প্রকৃত মুসলমান ভিন্ন কেহ বোধ হয় অনুভব করিতে পারিবেন না মনের সঙ্গে যে বৈদ্যুতিক আকর্ষণের খেলা চলিল তাহা অনুভব করিবার জিনিষ তাহা প্রকাশ

করিবার জিনিষ নহে "রওজা" শরিফের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ---অহো,---কি প্রশান্ত! কি গম্ভীর! শান্তির কি বিরাট নির্ব্বিবাদ রাজত্ব! বাতাস বিমল ভক্তির গান ধরিয়া গাছের পাতার মধ্য দিয়া সাঁ সাঁ রবে বহিতেছে নীরব প্রেম, উচ্ছ্বাস বহাইয়া স্থানটীকে অনবরত ধুইয়া দিতেছে

হঠাৎ কোথা হইতে দরবেশ সাহেব আসিয়া সিকদার সাহেবকে জড়াইয়া ধরিলেন বহুদিনের হারান বন্ধুকে পাইয়া সিকদার সাহেব খোদার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন দরবেশ সাহেব, সিকদার বাটী পরিত্যাগ করিয়া মদিনা শরিফ পৌঁছা পর্য্যন্ত সমস্ত কথা বিবৃত করিলেন। বলিলেন আমার সাক্ষাতে নুরনকে দোজখে ফেলে দিচ্ছেন দেখে আমি সহ্য করতে না পেরে আপনাকে না বলে আপনার বাড়ী ছেড়ে এখানে এসেছি।

কয়েকদিন মদিনা শরিফে অবস্থান করিবার পর তাঁহারা উভয়ে বদর যুদ্ধ ওহাদ যুদ্ধ-স্থান ও কারবালা প্রান্তর দেখিবার জন্য বাহির হইলেন। ওহদ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন আজ সে যুদ্ধভূমি নীরব, স্থির সে অস্ত্রের ঝনঝনা নাই, আনছারীদের সৈন্যশ্রেণী নাই, কোরেশগণের নির্ম্মম তীর নাই সে দিন আর আজ। এই স্থানে এসলামকে ধ্বংস করিবার জন্য কাফেরগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল--- সেই এসলামের ঝঙ্কার আজ সমস্ত দুনিয়া মুখরিত করিতেছে হজরতের প্রিয়তম পরিষদ হজরত আবুবকর এইস্থানে, এই মাটীতে ইসলামকে রক্ষা করিবার জন্য খণ্ডিত বিখণ্ডিত দেহে লুটাইয়া ছিলেন। এ সকল তাঁহাদের স্মৃতিপথে উদিত হইলে তাঁহারা কাঁদিয়া ফেলিলেন এস্থান ত্যাগ করিয়া ক্রমে তাঁহারা কারবালা প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন

চিরদুঃখের স্মৃতি বুকে ধরিয়া কারবালা প্রান্তর ধু ধু করিতেছে সমীরণ রক্তগন্ধ স্মৃতি বহন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে ইউফ্রেতিস নদী 'হায়' 'হায়" করিতে করিতে বহিয়া যাইতেছে। এই স্থানেই হজরতের প্রিয়তম দৌহিত্র হজরত হোছেন ইসলামের বুকে গভীর বেদনার ক্ষত রাখিয়া অনন্ত শয্যায় ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন—এ সেই স্থান। এস্থান কি বিরাট। জগতের আর কোন্ স্থান প্রাণে এমন আলোড়ন দেয়।

এ সকল দেখিয়া, তাঁহারা আবার মদিনা শরিফে ফিরিলেন। ভ্রমণ জনিত অতিরিক্ত পরিশ্রমে সিকদার সাহেবের শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এখানে পৌঁছিয়াই তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন দরবেশ সাহেব প্রাণপণে তাঁহার সুশ্রূষা করিলেন; কিন্তু তাঁহার অবস্থা ক্রমেই কঠিন হইয়া আসিল। একদিন তিনি দরবেশ সাহেবকে বলিলেন—ভাই, এই বাস্তব জগতেও মনে হয় আপনি কোন স্বপ্নরাজ্যের ফেরেস্তা খোদার কি অসীম দয়া! এই ঘোর কঠিন সময়েও আপনাকে পেয়েছি। এই অন্তিমকালে আমার অনুরোধ—নূরন ও আবদুর রহিমকে খোদাকে সাক্ষী করে আপনার হাতে দিয়ে গেলাম,—তাদের ছেড়ে আপনি যেন কোথাও যাবেন না। আহা! তারা মাতৃহীন হয়েছিল, আজ তারা পিতৃহীনও হোল! যাক—খোদার কি অনুগ্রহ! আমি কোন সময় তাঁর কাছে চেয়েছিলাম যে আমার শেষ দিনে মদিনার এই পবিত্র ভূমিতে হজরতের রওজার নিকটে যেন মাথা রেখে শেষ নিশ্বাস ফেলতে পারি। তিনি তা বোধ হয় শুনেছিলেন—তাই আমায় স্নেহের নূরন, আবদুর রহিমকে এমন অসহায় অবস্থায় রেখে ও বুকে হেঁটে এখানে এসেছি, আরও সৌভাগ্য মৃত্যুকালে আপনাকে পেলাম, আপনার হাতে ওদের সঁপে দিয়ে সুখে মরতে পারব আবদুল কাদেরের সঙ্গে যদি দেখা

হয়, আমার আন্তরিক দোয়া জানাবেন –আর নুরনকে তার—এয়া খোদ ; লায়এলাহা এল্লাল্লা-মহাম্মদর রছুলোল্লাহ

পবিত্র রওজার দিকে মুখদিয়া এই নাম মিশান পবিত্র কলেমা পড়িতে পড়িতে বেহেস্তের হুরদের আহ্বান শুনিতে শুনিতে তাঁহার পরমাত্মা কোন অজানা আলোকের পথে চলিয়া গেল

সেই রাত্রে দরবেশ সাহেব নিদ্রার ঘোরে শুনিলেন কে যেন বলিতে-ছেন—তুমি অবিলম্বে ভারতে ফিরিয়া যাও তোমার ভারত আজ পাপে, দুঃখে দুর্দ্দশায় অনাচারে বস্ত্রবিহনে, অনাহারে জর্জ্জরিত। তুমি সেখানে গিয়ে তাদের চোখের পানি মুছাতে চেষ্টা কর

তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে ভাবিলেন—আমার হিন্দু মুসলমান—সত্যই ত আজ অনাহারে বস্ত্রবিহনে উৎপীড়িত আমার এই ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা যদি একটী হিন্দুর, একটী মুসলমানের, একটী বৌদ্ধের,একটি ব্রাহ্মের বা একটি খ্রীষ্টানেরও সেবা করতে পারি, একটা নিরন্নকেও আমার মুখের ভাত তুলে দিতে পারি তবুও এ জীবন ধন্য হবে। হিন্দু মুসলমান আজ গলায় গলায় মিলবার জন্য ছুটছে, আমি গিয়ে তাদের সঙ্গী হব।

পরিচ্ছেদ

(২১)

সুখের পথে

লতিফনের পুনরায় নেকাহ হইয়া গিয়াছে। লতিফনের সৌন্দর্য্য আছে, অবস্থাও মন্দ নহে সুতরাং তাহার পুনরায় বিবাহ দিতে কোন বেগ পাইতে হইল না সে যে সুখের সন্ধানে—গহণা ও অর্থের মধ্যে ডুবিয়া থাকিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপেই সে পাইল। অর্থের অভাব এখানে নাই। থাকিতেও পারে না কোন বালক পানিতে পড়িয়া মরিয়া গেলে—যখন তাহার ভিক্ষুক পিতা মাতা বক্ষে করা ঘাত করিয়া ধুলায় লুটাইতে থাকে, এমন পিতামাতার নিকট হইতে যাহারা পকেট পুরিয়া অর্থ লইয়া বাসায় ফেরে তাহাদের আবার টাকার অভাব কি? লতিফন এখন রাজরাণী।

একদিন তার স্বামী বলিল—দেখ টাকার আমার অভাব নাই টাকাও আমাকে চেনে আমিও টাকাকে চিনি। যার টাকা নাই তার দুনিয়াই মিথ্যে টাকা না হলে কোন সৎ কাজটা হয়? টাকার জন্যেই তুমি আমাকে এ বয়সে দয়া করেছ। এখন এ সব তোমারই তবে প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ছেলেটার বয়স ২৫ পার হয়ে গেল, তার বিয়েটা দিতে যা একটু খরচ সে ত তোমার হাতেই হবে। আজ হতে চাবিটা তোমার হাতেই রাখ লতিফন খুশীতে গলিয়া গিয়া চাবিদ্বারা বাক্স খুলিয়া দেখে—অনেক টাকা। লতিফন হাতে স্বর্গ পাইল।

এখন তাহার পূর্ব্বের মত অভাবের তাড়না নাই পূর্ব্বে একখানা কাপড় ছিঁড়িয়া না গেলে আর একখানা পাওয়া যাইত না, এখন বিভিন্ন রকমের কাপড়ে বাক্স পূর্ণ ক্ষুদ্র মলিন কাঁথার পরিবর্ত্তে দুধের মত সাদা বিছানা।

লতিফন কিছুদিন এখানে সুখের মধ্যে হাবুডুবু খাইয়া পিত্রালয়ে আসিয়াছে। তাহার কাপড় ও গহনার চাকচিক্য দেখাইয়া প্রতি-বেশিনীগণের নিকট নিজের অদৃষ্টের প্রসঙ্গ তুলিয়া একদিন বলিল—দেখ 'যে যা চায় তাই পায়—বিধি কারও বাম নয়'। আমার কপালে আছে সুখ আমি কেন পোয়াব দুঃখ এ কথাগুলির তাৎপর্য্য দেখাইবার জন্য সে গহনাগুলি একটু নাড়া দিল। কয়েক জন গরীব প্রতিবেশিনী বারান্দার এক কোণে বসিয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিল—তাই ত মা, তাই ত, বেশ হয়েছে যেমন মেয়ে, তেমনি সব হয়েছে, এমন না হলে মানাবে কেন ?

যদুর মা ধান ভানিতেছিল। সে ঢেঁকির উপর হইতে হাত নাড়া দিয়া বলিল—আরে বুন, বোঝনা, যার কপালে আছে, তাকে কি কেউ বেঁধে রাখতে পারে! অথাই পানিতে ডুবিয়ে দিলেও সে ভেসে ওঠে — একথা বলায় মনিব-কন্যা অবশ্য সন্তুষ্ট হইয়াছে ভাবিয়া সে ঢেঁকির পাড় জোরে জোরে দিতে লাগিল। অনেক পানলোভী প্রতিবেশিনী পুত্র কন্যা কোলে লইয়া আসিয়া বেশ জটলা করিয়া লতিফনের ভাগ্য-গুণের প্রশংসা করিতেছে। এক স্থূলাঙ্গী পুত্রকে স্তন্য দিতে দিতে হাতটা বাড়াইয়া চিৎ করিয়া ধরিয়া বলিল—তাও ত মা, একটু পাতার গুঁড়ো, এ গুঁড়ো বুঝি সেখান থেকে এনেছ? তা না হলে এমন জিনিস কি এখানে পাওয়া যায়? সিঁতের সিঁদুর বজায় থাক

দাঁতে দাঁতে আটিয়া সে এই অমৃতবৎ তামাকচূর্ণ ঘর্ষণ করিতে করিতে ও বার বার থুথু ফেলিতে ফেলিতে বলিল—হয়েছে মনে—তবে জামাইটা না কি বয়সে বড় বেশী। শুনলুম জুতোর কালী দিয়ে নাকি চুল দাড়ি কালো করে এসেছিল তোমরা যাই বল, আমার মনে ত ভাল লাগে না

যদুর মা ঢেঁকির উপর হইতে উচ্চগলায় বলিল—ও কথা বলো না, ষাট, বুড়ো হয়েই বেঁচে থাক

মবেজের স্ত্রী বিস্মিত কণ্ঠে বলিল—ও মা, ষাট বছরের বুড়ো, বলিস কি যদুর মা!

"না লো না, তোরা কি শুনছিস? আমি বলছি ষাট বেঁচে থাক, আর তোরা ধরে নিলি ষাট বছর—ধন্যি তোদের কান"

সরল চাষার স্ত্রী, এমন কথা সম্মুখে বলা যে ভদ্রতাবিরুদ্ধ তাহা সে একটু চিন্তাও করে নাই, যদুর মার কথায় যখন তাহার জ্ঞান হইল, আর এ কথা লইয়া গণ্ডগোল বাঁধিবে ভাবিয়া সে খড়ের ক্ষেতের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িল।

পরিচ্ছেদ

(২২)

রাহজানের বৈঠক বসিয়াছে (১) আজকাল টাকার অভাবে তাহাদের "ম" কারের সঙ্গে সাক্ষাৎ বড়ই কম হইয়াছে। টাকা খরচের সন্ধান পাইয়া রাহজানের পিতা সতর্ক হইয়াছে। টাকা নাই সুতরাং বারাঙ্গনালয়ে স্থান নাই সুরাদেবীর আড়তও বন্ধ। রাহাজানের সঙ্গিগণ অর্থাভাবে অসদ্ভাবের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে খলিল বলিল—ভাই, আমরা ত ডুবতে বসেছি, কিন্তু বাধ্য হয়ে অর্থের অভাবে আমাদের এখন এ সব ছেড়ে দেওয়াই উচিত। এভাবে আর কয় দিন পোষায় ?

রাহাজান দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তাই ত বলছিলাম, টাকা না হলে দুনিয়ায় কোন্ কাজ হয় ? আমার বাপ ব্যাটা ত এখন একটা পয়সা দিতে চায় না ব্যাটা সব ঠিক পেয়েছে। এখন কি করে খরচটা পোযায় বল ? এতদিন যত টাকা চেয়েছি ব্যাটা দিয়েছে, এখন হঠাৎ ব্যাটার এ মতিচ্ছন্ন ঘটল কেন ? ব্যাটা রাত দিন আমাকে গাল দিয়ে ভূতছাড়া করছে। ব্যাটার একটা হেস্তনেস্ত না করলে আর চলেনা আমি এর একটা উপায়ও স্থির করেছি। ব্যাটাকে পগার-পার করলে সব দিক ফরসা, আমি সর্ব্বেসর্ব্বা। ব্যাটা আর চোখরাঙ্গাতে পারবে না। শুনতে একটু কঠিন হলেও সংসারের আপদ দূর করতে হয়। কি বল ? খলিল শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—বল কি ! তোমরা যা ইচ্ছে তাই করগে ভাই, আমার দ্বারা এ হবে না।

---

(১) For Satan finds some mischief st ll, fo1 idle hands to do—D1. Watts.

রাহাজান রাগান্বিত হইয়া বলিল—কি আমাদের কাজের প্রতিবাদ! এত বড় আস্পর্দ্ধা! সয়তান, নেমকহারাম্! খলিলও ক্রোধান্বিত হইয়া বলিল—তুই নেমকহারাম, বিশ্বাসঘাতক, মুসলমান কুল-কলঙ্ক, বেইমান; তুই আমাকে গালি দিস্! তুই যার অন্নে প্রতিপালিত হয়েছিস্, যার অর্থ দিয়ে এত দিন এই পাপলিপ্সা চরিতার্থ করেছিস্, সে হউক পাষণ্ড, যে হউক নারকী, তার শাস্তি দিবার জন্য খোদা আছেন। তুই তাকে জানে মারবার জন্য ষড়যন্ত্র করছিস্! আমি এর সাহায্য করছি না বলে আমি সয়তান? আজ সমাজে তোর মত নীচাত্মা-কুকুর আছে বলে সমাজের এ দশা! আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাই না। তোরা এ কাজ হতে নিবৃত্ত হ। আমি সাবধান করে দিচ্ছি, তোরা এ কাজ করলে, নিশ্চয় তোদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে তোদের ফাঁসিকাঠে ঝুলাব

রাহাজান রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—তোর মত লোক আমাদের কি করতে পারে? আমি ইচ্ছা করলে আজই তোকে ভিটাছাড়া করতে পারি, তা জানিস্?

খলিল বিদ্রূপের স্বরে বলিল—তার আর আশ্চর্য্য কি! আমাকেই সঙ্গে করে কত জনের সর্ব্বনাশ, কত জনের ভিটাছাড়া, আমারই সাক্ষাতে করেছ আমি সোনায় ডুবে অন্ধ হয়েছিলাম, তাই তোমাকে এসব করতে সাহায্য করেছি। চিরদিন কি সয়তান হয়েই থাকব?

রাহজান—তোর এত বড় সাধ্যি! আমার মুখের উপর আমাকে অপমান! আমাদের যদি বাধাও, তবে তোমাকেও বাধতে হবে, এ জেনে রেখ।

ছায়মদ্দি বৃদ্ধাঙ্গুলি উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিল—আরে ওর মত লোক আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কি করতে পারে? ও ত একটা মশা,

এক টিপের কাজ। খলিল বলিল—জেনে রেখো, সত্যের পক্ষে দাঁড়ালে এক মশাই হাতী হয়ে দাঁড়াতে পারে; সত্যকে বুকে করে দাঁড়ালে এক জনই হাজার লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে

ছামদদ্দি।—বেরো এখান থেকে, হারামজাদ!—ব্যাটা বড় সত্যি দেখাতে এসেছে!

"এই বেরোলাম, চিরদিনের জন্য তোমাদের কাছ থেকে বেরোলাম এক খোদা ভিন্ন সকলেরই এবং সকল কাজেরই সীমা আছে" বলিয়া খলিল দ্রুতপাদবিক্ষেপে বাহির হইয়া গেল

জহিরদ্দি মিঞার সবজজ কোর্টে একটা মোকদ্দমা ছিল। সে আজ অত্যন্ত বিষণ্ণমুখে লাঠিটা ঠক ঠক করিতে করিতে কোর্ট হইতে বাড়ী আসিল আহার না করিয়াই বিছানায় শুইয়া পড়িয়া কেবল ছট ফট করিতে লাগিল আর চিন্তা করিতে লাগিল—হায় দুই হাজার টাকা! হায় কি সর্ব্বনাশ হোল! বালিশের সঙ্গে মাথা গুজিয়া, বালিশের উপর ২।৩ বার হাত চাপড়াইয়া বলিতে লাগিল—হায় দুই হাজার টাকা—তিন আনা—ছয় পাই—ডিগ্রি হয় আর কি!—এমন সময় জজ ব্যাটার মাথায় বজ্রাঘাত হো'ল, ব্যাটা কি করে ঠিক পেল যে জাল দলিল! ব্যাটার ভিটেয় ঘুঘু চরুক ব্যাটা মকদ্দমাটা ডিসমিস করে দিলে তবে ছাড়লে। এর চেয়ে ব্যাটা আমার ফাঁসির হুকুম দিল না কেন?

চাকর আসিয়া বলিল—কর্ত্তা ভাত হয়েছে, বাড়ীর মধ্যে এসে খেয়ে শুয়ে থাকুন।

"ভাত হয়েছে ত আমার মাথা কিনে নিয়েছে! আমাকে আজ ডাকবি ত ব্যাটাদের আমি খেয়ে ফেলব।"

চাকর ভীত হইয়া প্রস্থান করিল তাহারা জানিত—কোন

মোকদ্দমা হারিয়ে গেলে কর্ত্তা এইরূপই করিয়া থাকেন। চাকর চলিয়া গেলে আবার চিন্তা করিতে লাগিল—হায় কি সর্ব্বনাশ হোল। ব্যাটা জজের সর্ব্বনাশ হোক্,—হায় দুই—হা—জার টা—কা, আরও তে—র আ—না—আরও ছ—য় পাই। হায় কি করে ভুলব রে। হায় টাকা. দলিলটা জাল করতেও এক ব্যাটা সর্ব্বনেশে ৫৲ টাকা নিল, আরও এক ওক্ত খেয়ে গেল। ব্যাটার ব্যাটা মরবে, ব্যাটা কেমন করেই লেখেছিল। সে ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল নিদ্রার ঘোরেও অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল—হায় টাকা ! সর্ব্বনেশে ব্যাটারা—আমার কি হল রে—হায় টাকা! ওরে টাকা!

শ্রাবণের রাত্রি বৃষ্টিপাত হইয়া গিয়াছে চারিদিকে নিস্তব্ধতা ও অন্ধকার বিরাজ করিতেছে তহিরদ্দি মিঞা বৈঠকখানা ঘরের যে কামরায় ঘুমাইয়াছিল, তাহার দরজা সহসা অবসারিত হইল যমদুতস্বরূপ ৪ জন লোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কেহ গলা চাপিয়া ধরিল, কেহ বুকের উপর উঠিয়া বসিল, কেহ হাত পা ধরিল তাহার প্রাণবায়ু বাহির না হইতে হইতেই তাহারা নিকটবর্ত্তী বিলের মধ্যে শেওলার নিম্নে রাখিয়া আসিল রাহাজান ফিরিয়া ঘরে আসিলে জমিলা তাহার স্বামীর মুখের অমানুষিক ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল—একি! তুমি অনেকদিন অনেক পাশবিক কাজ করেছ, কিন্তু কোন দিন তোমার মুখের চেহারা ত এমন হয় নাই। তুমি কাঁপছ কেন? তোমার পরনের কাপড় ভিজে কেন? তুমি যেন আজ কি ভীষণ কাজ করেছ!

রাহাজান কাঁপিতে কাঁপিতে মেঝের উপর এক হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল—অত খবরের তোমার দরকার কি? পথ দিয়ে আসতে হঠাৎ পুকুরের মধ্যে পড়ে গিয়ে কাপড় ভিজে গেছে। জমিলা একখানা

শুষ্ক কাপড় আনিয়া রাহজানকে পরাইয়া দিয়া গা মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল—আমার যেন বোধ হচ্ছে তুমি নিশ্চয়ই আজ কোন কঠিন কাজ করেছ! তুমি একটু স্থির হও রাহজান কম্পিতস্বরে বলিল—সত্যই জমিলা, জীবনে তোমার কাছে অনেক কথা গোপন করেছি, কিন্তু আজকের কথা বুকের উপর পাহাড় হয়ে রয়েছে, আজকের কথা তোমার কাছে লুকোব না। তোমাকে বললে, বোধ হয়, এর ভার অনেক কমে যাবে। জীবনে অনেক পাপ করতে যাবার সময় তুমি পা ধরে কেঁদেছ, আমি তোমাকে পা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে চলে গিয়েছি আজ বলব, — আমরা বুড়োকে শেষ করে এসেছি।

জমিলার গায়ের উপর যেন বিদ্যুৎপাত হইল; সে শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—তুমি বল কি! কি সর্ব্বনাশ! তুমি বাঁচবে কি করে? জমিলার বক্ষ ভাসিয়া অশ্রু গড়াইল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—এ কথা ত গোপন থাকবে না—উপায় কি হবে? এয়া খোদা!

"যা করবার তা করেছি, এখন উপায় কি জমিলা?"

"উপায় এখন খোদার হাতে। যদি সৎকাজ করতে গিয়ে কোন বিপদে পড়তে, খোদার দরগায় মাথা কুটতুম তা নয়, এ ব্যাপারে সে বড় দরগাই বন্ধ। ধর্ম্মের বিধানে তোমাকে রক্ষা করা উচিত নয়। অপরাধীকে, বিশেষতঃ হত্যাকারীকে, রক্ষা করা উচিত নয়। তুমি আমার স্বামী। আমি কি করব? এক দিকে সত্য, অন্য দিকে স্বামী। খোদা, আমি কি করতে পারি!" বলিয় জমিলা মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল।

কতক্ষণ পর প্রভাত-সূর্য্য উঁকি দিল। জহিরদ্দি মিঞার জন্য হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। ছায়মদ্দি শুইয়া শুইয়া তাহার স্ত্রীকে বলিল—

আরে ব্যাটারা বুড়োকে খুঁজছে—বুড়ো যে এতক্ষণ বিলের মধ্যে সাঁতার খেলছে

অনেক অনুসন্ধানের পর বিলের মধ্যে শব পাওয়া গেল জেলার পুলিশসাহেব আসিলেন। থলিল আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা পুলিশ সাহেবকে খুলিয়া বলিল (১)

জমিলা ঘরের মধ্য হইতে বলিল—হুজুর, আমি বড় কষ্টে পড়ে শ্বশুরকে খুন করেছি। আমার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, কেবল শত্রুতা,—সব মিথ্যা। হুজুর, আপনার পায়ে পড়ি,—আমি দোষী, আমাকে ছেড়ে দিয়ে আমার নির্দ্দোষ স্বামীকে ধরে নিয়ে যাবেন না।

"আপনি ভাল স্ত্রীলোক আছেন মিথ্যা বলা পাপ আছে। আপনি বুঝটে পেরেও স্বামীর জন্য মিঠ্যা কটা বলছেন আপনি বললে হবে যে চণ্ডু ডিনের বেলায় আলো ডায়। রাট্রে সূর্য্য ওঠে পর্ব্বট পাখীর মট উড়ে বেড়ায়? আপনি সট কঠা বলুন"

তদন্তের পর পুলিশ সাহেব আসামীগণকে চালান দিলেন মাটী ভিজা থাকার জন্য যে সকল পদচিহ্ন পড়িয়াছিল তাহা তাহাদের পায়ের সঙ্গে মিলিয়া গেল

(১) Man cannot cover what God would reveal—Campbell.

পরিচ্ছেদ

(২৩)

আজ রাহাজান ও তাহার সঙ্গীদের বিচারের দিন। গহনাপত্র যাহা কিছু ছিল বিক্রয় করিয়া জমিলা নিজের অর্থে ভাল একজন ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়াছে। জজকোর্টে লোকে পরিপূর্ণ

জমিলা আপাদমস্তক বোরখা দ্বারা আবৃত করিয়া আসিয়াছিল। সে সাক্ষ্য দিতে উঠিয়া বলিল—হুজুর, আমি পূর্ব্বেও বলেছি, এখনও বলছি আমার কথায় বিশ্বাস করুন, আমি প্রকৃত দোষী। লোকে শত্রুতাবশে তাঁকে দোষী করছে। হুজুর, বিশ্বাস করুন, জগতে নারী অধিক পাপ কার্য্য করতে পারে—যা পুরুষের দ্বারা হয় না। একথা সকলেই জানে, হুজুর, হজরত এমাম হাছেনের মৃত্যুর কারণ নারী। নারীই তাঁকে ভীষণ বিষ প্রয়োগ করেছিল। হিন্দুর দেবতা রামকে স্ত্রী-ভ্রাতাসহ যে এত কষ্ট পেতে হয়েছিল, প্রিয়তমা পত্নীকে ত্যাগ করতে হয়েছিল—তার মূলে রমণী এ রকম ভুরি ভুরি কঠিন নৃশংস কাজ নারীর দ্বারাই হয়েছে আমার শ্বশুর অত্যন্ত কৃপণ ছিলেন—আমাকে নানারূপ অভাবে রেখে কষ্ট দিয়েছেন। তাই সে জঞ্জাল দূর করতে আমি এ করেছি আমার স্বামী নির্দ্দোষ এ কি কখনও সম্ভব, পুত্র পিতাকে খুন করতে পারে?

জজ ঈষৎ হাসি-মুখে বলিলেন—অসম্ভব জগতে খুব কম জিনিষই আছে।

পুলিশ সাহেব সাক্ষ্য দিতে উঠিয়া বলিলেন—আমি তন্ন তন্ন করে

তদন্ত করেছি রাহাজানরাই প্রকৃত দোষী খলিল চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে—স্বচক্ষে দেখেছে এ সাক্ষ্য খলিল দিয়েছে

জজ জুরিদের সহিত একমত হইয়া ফাঁসির হুকুম দিয়া বলিলেন—আগামী ১৪ই তারিখে এদের ফাঁসি হবে—জমিলা, তুমি বাড়ী যাও

জমিলা কোর্টের মধ্যে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—আমি এই খানে শুলুম আমি কিছুতেও যাব না হুজুর, আমাকে মেরে ফেলুন, আমাকে ফাঁসি দিন আমি কিছুতেই এখান থেকে নড়ব না আপনাদের প্রাণে কি একটুও মায়া নেই? স্ত্রীর বুক থেকে স্বামীকে কেড়ে নিয়ে আপনারা ফাঁসি দিতে পারেন। শুনি, মানুষের শরীরে দয়া আছে আপনারা কি এত নিষ্ঠুর।

জজ সজলচক্ষে ধীরে ধীরে বলিলেন—কি করব জমিলা, আইনের বিরুদ্ধে কাজ করবার আমাদের ক্ষমতা নাই আর তা করা উচিৎও নয়। তা হলে পাপ আর অত্যাচারে দেশ ভেসে যাবে। অপরাধীকে ছেড়ে দেওয়া আর নিজ হাতে দেশের ঘরে ঘরে আগুণ জ্বেলে দেওয়া সমান। এতে আইনের বন্ধন শিথিল হবে, সমাজের বন্ধন ছিন্ন হবে। আর তুমি এমন স্বামীর জন্ত এত ব্যাকুল কেন জমিলা? এই আদালতে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে আর তুমিও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছ যে, তোমার স্বামী আজীবন তোমাকে কষ্ট দিয়েছে, চিরকাল বেশ্যালয়ে জীবন কাটিয়েছে, কুলটা রমণীকে ঘরে এনে তার সাক্ষাতে তোমার উপর অত্যাচার দেখায়ে তার মন সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করেছে। তুমি সেই রমণীর পা পর্য্যন্ত ধুইয়ে দিতে বাধ্য হয়েছ। তোমার গা থেকে তোমার পিতৃদত্ত গহনা কেড়ে নিয়ে কুলটার গায়ে পরিয়েছে। এমন স্বামীর জন্ত তুমি এত ব্যাকুল হচ্ছ কেন?

জমিলা অধিক বেগে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—হুজুর, আপনি কি

জানেন না মুসলমানরমণীর স্বামী তার কি ? স্বামীর মুখের উপর দিয়ে যে স্বর্গের আলোক মর্ত্তে ভেসে আসে—সে আলোক নিভে গেলে যে রমণীর সব আঁধার আপনি আমার সব আঁধার করে দিলেন আপনার প্রাণে কি দয়া নেই ? আমি কি করব হুজুর ?

জজ। কি করবে জমিলা, উপায় নাই।

জমিলা বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে বাড়ী ফিরিল।

আজ মাসের ১৩ই। রাহাজান ও তাহার সঙ্গিগণ হাজতে। আগামী কল্য প্রত্যূষে ফাঁসি হইবে গভীর রাত্রি চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। অনতিদূরে কেবল পাহারাওয়ালাদের 'হোই' 'হোহ' শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে। বহুদূর হইতে বারাঙ্গনাগৃহের অশ্রাব্য গানের সুর বাতাস বহন করিয়া আনিতেছে। যে গানের সুর অন্যান্য দিন রাহাজানের কাণে সুধা ঢালিয়া দিত আজ তাহা বিষের শলাকার মত বিদ্ধ হইতেছে রাহাজান পাগলের মত চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—এস বারাঙ্গনা রাক্ষসী সকল, নাচতে নাচতে এসে আমার রক্ত পান কর। নিষ্পাপ ছলিম, তোমার অভিশাপের ছুরি দিয়ে আমার হৃদয়টাকে কেটে খণ্ড-বিখণ্ড করে দাও এ সেই জেলখানা, যে জেলখানায় বিনা অপরাধে তোমাকে কষ্ট দিয়েছি —হা! আমার বুকের উপর পাথর চেপে আসছে রে। হিমালয় এসে বুকের উপর নৃত্য করছে রে!—তুমি বিনা কারণে যেখানে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়েছিলে—আমি আজ সেই জেলখানায় কিন্তু তুমি আমি কত তফাৎ। তুমি নিরপরাধী আর আমি অপরাধী। তুমি মানুষ, আমি পশু। তুমি বেহেস্তের ফেরেস্তা, আমি দোজখের কীট। তোমার জন্য উদ্ভাসিত আলোক স্বর্গের দুয়ারে চিরদিনের জন্য জ্বলছে, আমার জন্য নিরাশার আঁধার দোজখের অন্ধকার ঘনীভূত করছে কত প্রভেদ। তুমি ইহকালের জ্বালা স্বপ্নবৎ দুদিনের

জন্য এড়ায়ে পারের দেশে চির সুখ, চিরশান্তি লাভ করবে। আর আমি দুনিয়ার ভুল সুখের সঙ্গে দৌড়িয়েছিলাম, যৌবনের উদ্দামগতি যে দিকে চালিয়েছিল সেই দিকে চলেছিলাম—আমার জন্য দোজখের আগুন,—সহস্র জিহ্ব বিস্তার করে হা করে চেয়ে আছে। কি ভয়ানক। ঐ দেখছি—কি কাল বর্ণের আগুন—। ঐঃ দোজখীদের কি চীৎকার!—বাপরে!—আহা, আবদুল কাদেরের মত স্বর্গের দেবকেও এই হাতে অস্ত্রাঘাত করেছি, এস, দেব—তোমার পবিত্র পাদুখানি এ বুকে উঠিয়ে দিয়ে আগুনটা চাপা দিয়ে নিভিয়ে দাও "এস গরীবের অশ্রু, বিধবার হা হা শ্বাস, সন্তানহীনের আর্ত্তনাদ, নিঃসহায়ের অরুন্তুদ বেদনা, আমার মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ কর কত জনকে ভিটা ছাড়া ক'রেছি, নিঃসহায়কে পুড়িয়ে মারবার জন্য নিভৃত রাত্রে আগুন দিয়েছি—আহা। এখন আমার মনে কে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে রে। খোদা আছেন—তিনি সকলই দেখেন—সকলেরই শেষ আছে—জমিলা অনেক দিন বলেছিল,—আমি ক্ষিপ্ত কুকুরের মত তাকে আক্রমণ করেছিলাম। এখন বুঝ্‌ছি তার কথা কত সত্য! জমিলা, তুমি এমন নরাধমকেও কি করে স্বামী বলে বুকে রেখেছিলে? জমিলা,—এ যে বিষ্ঠা হতেও অপবিত্র, কবর হতেও ভীষণ, পুল ছেরাও হতেও ভয়ানক, দোজখ হতেও ঘৃণ্য, এ যে পাপ হতেও অপবিত্র, বিশ্বাসঘাতকতা হতেও নিকৃষ্ট, এর স্বর গর্দ্দভ হতেও কর্কশ, এর আকার ভল্লুক হতেও কুৎসিৎ—, এ যে মিথ্যা হতেও দুর্ব্বল, অহঙ্কার হতেও নীচ, দুর্ভিক্ষ হতেও নিদারুণ, দুরারোগ্য ব্যাধি হতেও নির্ম্মম, মৃত্যু হতেও ভয়াবহ—একে তুমি স্বামীর আসন দিয়ে পূজা করেছিলে কি করে?—খোদা, খোদা বলে যখনই একবার ডাকছি তখনই যেন এই ঘোর অন্ধকার ভেদ করে—কে যেন একটা শান্তির স্পর্শ বুকে দিয়ে যাচ্ছে,—কিন্তু তা

ক্ষণিকের জন্য। তারপরই আবার এই নির্জ্জন কক্ষে সহস্র কলরব কাণ ঝালা পালা করে দিচ্ছে।

রাহাজান চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিল ফাঁসি দাও, ফাঁসি দাও—শীঘ্র ফাঁসি দাও একবারে শেষ কর গো—একবারে শেষ কর—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আর ফাঁসিতে ঝুলতে পারিনে, একবারে শেষ কর

পাহারাওয়ালা দরজার সম্মুখে আসিয়া বলিল—তোম কিউ চেল্লাতা হ্যায় উল্লু? কাল ছোবের মে দেখোগে ফাঁসি ক্যায়ছা সহদছে মিঠা লাগতা

রাহাজান কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—পাহারাওয়ালা—আমায় দুটো গালি দাও পাহারাওয়ালা, তোমার পায়ে পড়ি আমায় দুটো গালি দাও—তবুও তোমার দুটো কথা শুনতে পাব এমন নীরব আঁধারের এমন বাকহীন গালি আর সহ্য করতে পারিনে পাহারাওয়ালা! পাহারাওয়ালা অধিক ক্রোধের সহিত বলিল—"ফিন, কোত্তা কা মাফিক চেল্লাতে হো, চোপ রহো।

"আমি যদি কুকুর হতুম, সেও সহস্রগুণে ভাল ছিল। কুকুর কাহারও সর্ব্বনাশ করে না—সে প্রভুর জন্য প্রাণ দেয় আর আমি প্রভুর প্রাণনাশ করেছি। বাঘ কেবল ক্ষুধার জ্বালায় লোককে আক্রমণ করে, অন্য সময় জঙ্গলে ঘুমিয়ে থাকে আর আমি বিনা কারণে মানুষের রক্ত খেয়েছি আর আনন্দে নৃত্য করেছি তুমি দুটো গালি দিয়ে প্রাণে একটু শান্তি দাও . বুকের মধ্যে—এ যে ফেটে গেল—ওহো, আর সইতে পারিনে

পরদিন প্রত্যুষে রাহাজান ও তাহার সঙ্গীদের ফাঁসি হইয়া গেল

পরিচ্ছেদ

(২৪)

আবদুল কাদের পাহাড় ঘুরিয়া আসিয়া মগরবের নামাজ পড়িয়া ছালাম ফিরিতেই দেখিলেন বিছানার উপর একখানা এনভেলপ পড়িয়া আছে। মোনাজাত শেষ করিয়া পত্রখানি খুলিলেন। পত্রে লেখা আছে,—ভাই আবদুলকাদের, দীর্ঘ এক বৎসর কাল-স্রোতে মিশিয়া গেল তোমার প্রেরিত টাকা পাইতেছি আশা করি, আমার কথা বিশ্বাস করিবে —নূরন তোমার আশায় বসিয়া আছে।

আবদুলকাদের আর পড়িলেন না, পত্রখানি দূরে নিক্ষেপ করিয়া মনে মনে বলিলেন—রফিক এত নির্ম্মম, আর নূরন এমন কলুষিত। ছিঃ, প্রাণ ফেটে যায়। রফিক আমার বাল্যবন্ধু, সে আমার নিভান দুঃখে এমন করে বিদ্রূপের আহুতি দিতে পারে! সে আমাকে এত নীচ মনে করে! আর নূরন সেত ভদ্রকন্যা, শিক্ষিতা, সে এমন নীচ হ'তে পারে? সে পরস্ত্রী,—ভাবি নাই রফিক আমাকে এমন গোনার-কালিমা-মাথান-পত্র স্নেহের আবরণ দিয়ে লিখ্‌তে পারে! দুনিয়ায় আর কাকে আপন বলব? প্রাণের বন্ধু রফিক এত নির্ম্মম! আর নূরন এমন? তার এই চরিত্রের কথা ভেবে প্রাণ ফেটে যায় রফিক আমার উপর এমন নৃশংস ব্যবহার করতে পারে? সে আমাকে এমন চক্ষে দেখে! তাত হবেই! যে গরীব, যে নিঃসহায় তাকে যদি কোন বড় লোক বন্ধু বলে সেটা যেন তার দয়া সেটা যেন তার ইচ্ছা। তাকে নিয়ে যা ইচ্ছে তা করতে পারে, প্রাণে আঘাত দিতে পারে, ইচ্ছে করলে দু-ঘা কষেও দিতে পারে। জগতের এই নিয়ম, তাতে দুঃখ

নাই। দেখি সে আর কত নির্ম্মম বিদ্রূপ করতে পেরেছে। আবদুল কাদের পত্র খানা উঠাইয়া লইয়া আবার পড়িতে লাগিলেন :

—"তোমার জন্য একবার প্রীতি-উপহার ছেপে ছিলাম। বোধ হয়, তোমার মনে আছে, তার এক স্থানে লেখা ছিল "বিয়ে, দিল্লী কা লাড্ডু, হ্যায় ভাই সাচ্, এস্‌কো জান্‌না থানা আওর না খানা দোনোমে পস্তানা।" না খেয়ে ত একবার পস্তিয়েছ। এখন একবার খেয়ে পস্তাও

তোমার প্রেরিত টাকাগুলি পেয়েছি। এতদিন তোমাকে এসব বিষয় জানাই নাই তার কারণ আছে। একবার নিরাশার প্রবল আঘাতে তোমার হৃদয় ভেঙ্গেছে, আবার তোমাকে আশার কটাহে চাড়িয়ে দিয়ে নিরাশার আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারব সেই ভয়ে কোন কথাই তোমাকে জানাই নাই। যেখানে নূতন আশা নাই সেখানে নূতন দুঃখ নাই নিজে সন্দেহহীন না হ'য়ে সব ঠিক না ক'রে তোমাকে জানান উচিত মনে করি নাই।

জোনাব আলীর সহিত হুরনের বিবাহ হয় নাই। আমি বোধ হয় তার জন্য দোষী তুমি বোধ হয় সেজন্য আমাকে একটা থ্যাং দেবে আর জোনাব আলী বাগে পেলে আমার ঠ্যাং কেটে দেবে

এবার একেবারে সমস্ত ঠিক। আগামী ১০ই তোমার বিবাহের দিন। তুমি ছুটী লয়ে বা চাকরী ত্যাগ ক'রে চলে আস্‌বে। আমি কিন্তু একজন বড় লেখক হয়েছি—এই শুন :—

রত্ন-ভূষণ-অলঙ্কার-সজ্জিত, তোমার আশায় প্রপীড়িত হুরন এই ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত পাপ-দুঃখ-জ্বালা-তাপ-ক্লিষ্ট পৃথিবীর এক প্রান্তে, এই কোকিল-কূজন-কুজিত বিহগ-কাকলী-ঝঙ্কৃত, রসগোল্লা-পানিতোয়া-

সন্দেশ-বরফি-কাঁচাগোল্লা-সমাচ্ছন্ন, নদী-সরোবর-মুগ্ধ কল্লোল-মোহিত আকাশ-সাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে তুমি বৃক্ষ লতা-পাতা-গুল্ম-ঝরণা শোভিত স্বর্গের তোরণ হিমালয় হইতে একটু নামিয়া আসিয়া সাগরে সাঁতার খেলিতে থাক আমরা ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখতে থাকি।

আমি কিন্তু একজন কবি কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার কবিত্ব-বাস্তুভিটার লক্ষ্মী স্বরূপিণী অধিষ্ঠাত্রী-দেবী আমার হৃদয়-অন্ধকারনাশিনী, সর্ব্ব-সন্তাপ-হারিণী, সর্ব্বদা-পাখা-হস্তে ব্যজন-কারিণী, আমার ইহকাল-পরকালে-মোক্ষদায়িনী, অতি সত্বর ডাল-গোস্ত-পোলাও ভাজি-কাবাব-টুক-পাককারিণী আমার অন্ধে-যষ্টি-স্বরূপিণী, বিদেশে যাইবার কালে চক্ষু ডলিয়া বা সরিষার তৈল প্রয়োগ দ্বারা অশ্রুপাত-কারিণী, সেই উত্তাল-তরঙ্গ মালা-বিক্ষুব্ধ ভব-মহাসিন্ধু-পার-কারিণী—আমার সর্ব্বস্ব—আমার "সেই" ভিন্ন কেহ বুঝতে পারে না নছিব ভাল যে, তার কাছে যেমন বক্তৃতার ভঙ্গী, লেখার জোর, ভাবের গাম্ভীর্য্য আর কবিত্ব ফুটে উঠে এমন আর কোথাও হয় না।

যাক তুমি যদি একটা কুসুম-পরাগ-তুল্য-প্রাণে আঘাত দিয়ে ছিঁড়তে না চাও তবে পত্র পাঠ চলে এস আর তোমার বিয়ের কোরমা পোলাও খাওয়ার জন্য জিভটা বড়ই বেবাগ হয়ে পড়েছে, আঃ, কি নছিব গো, এক দুরনের বিবাহে এই সর্ব্বসংহারক জিহ্বার দুই দুইবার কোরমা পোলাওয়ের সংহার! রসনা-দেব, আর সজল জল-ধারা ফেলো না—কয়টা দিন সবুর কর।

তোমার বিয়ের পোলাও লোভী—

রফিক।

পত্র পাঠ শেষ হইলে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস আবদুল কাদেরের বুক ফুলাইয়া উঠিয়া বাতাসে মিশিয়া গেল আহারের পর—বিছানায়

শুইয়া দার্জ্জিলিংএর শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে পত্রখানা আবার পড়িলেন। অনেক চিন্তার স্রোত মনের উপর দিয়া বহিয়া গেল

পরদিন ডাকের আগে একখানি পত্র লিখিলেন—

প্রিয় রফিক,

তোমার পত্র পাইলাম মনের মধ্যে যে কথাগুলি জোয়াইতেছে তাহা লিখিতে পারিলাম না বাঙ্গালীর চাকরী একটা অমূল্যনিধি (?) এ ছেড়ে দিতে পারছি না—তার একটা কারণ,—তোমার আরও কিছু দেনা আছি। তুমি সুরনের সরকারে আমার যে চাকরীটীর ব্যবস্থা করেছ তা আমি যেন বিশ্বাস করতে পারছি না তা' কি বরকন্দাজ চেৎ সিংএর জায়গায় না, ঘাসুড়ে শিবাজী সিংএর জায়গায়? তারা ফিরে এলে আমি ত পুনর্ম্মূষিক ভবঃ হব না? তা' যদি না হই তবে আমি একমাসের ছুটি লয়ে আসছি খোদা চাহে ঐ তারিখে পৌছিব

সুরনের ভাবী চাকর—

তোমার—

আবদুল কাদের।

আজ আবার সুরনের বিবাহের দিন আবদুল কাদের আর এক পত্র লিখিয়াছেন—"ছুটী পাইয়াছি, আমি খোদা চাহে দার্জ্জিলিং মেলে একেবারে সুরনদের বাড়ী পৌছিব, কেন না নিজের বাড়ী এখন আমার নাই"

রফিক পূর্ব্বেই সুরনদের বাড়ী উপস্থিত হইয়াছে। সুরন দোতালার উপর বসিয়া আজ পথের দিকে চাহিয়া রহিল। আবদুল কাদেরের আসিবার সময় প্রায় অতীত হইয়া গেল সুরন উঠিয়া রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া দূরে মাঠের দিকে চক্ষুর শেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া চাহিল—

মাঠে কৃষকগণ ভিন্ন আর কিছুই দেখা গেল না মাঠ হইতে কোন কৃষক, লাঙ্গল ঘাড়ে করিয়া মাথায় মাথাল এবং পায়ে খড়ের প্রস্তুত জুতো পরিয়া গরুর পিছনে দুই পায়ের মধ্যে ছোট নড়ি দিয়া খেদাইতে খেদাইতে অমৃতবৎ তামাক সেবন করিতে করিতে বাড়ী ফিরিতেছে সূর্য্যের রশ্মি পশ্চাদ্দিক হইতে আসিয়া তাহার ছায়াকে ভীষণ দৈত্যের মত বানাইয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে কেহ ঘাসের বোঝা মাথায় করিয়া অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত কাপড় পরিধান করিয়া গাহিতে গাহিতে আসিতেছে—"হ্যারে ভাই, দুনিয়ার ব্যাপার বোঝ ভার। ক্যামন করে কি যে হয় সব অন্ধকার আহাশের গায় সূর্যি ডোবে, কেমন হাওয়া বয়—, যেন—পরাণ কেড়ে ল্যায় ”

কৃষকগণ একে একে যখন মাঠ ছাড়িয়া স্ব স্ব গৃহে পৌঁছিল, সূর্য্য, সুরনের প্রাণে গভীর বেদনার ছাপ দিয়া ডুবিয়া গেল সে ভাবিল—আর না, তিনি আসবেন না সময় গিয়েছে—আর আশা নাই। তিনি কেন আসবেন? তিনি আমার জন্য খুব সয়েছেন। এখন নিশ্চয় তিনি আমাকে ঘৃণা করেন, আমার ঐশ্বর্য্যকে ঘৃণা করেন তিনি দরিদ্র, কিন্তু সব চেয়ে ধনবান্ তিনি ত দারিদ্র্যকে বরণ করে ঘরে তুলেছেন। বিপদ্‌কে তিনি বন্ধু বলে মনে করেন। তাঁর শান্তি, তাঁর কর্ত্তব্য-জ্ঞান, তাঁর সত্য পবিত্র মূর্ত্তিখানিকে কর্ত্তব্যের রাজ্যে বিপদের মধ্যে উজ্জ্বল করেছে। তিনি আমাকে গ্রহণ করবেন কেন? অভাগিনীকে পৃথিবীতে কে চায়? পিতামাতা নাই স্নেহের পুতুল আবদুর রহিম আমার স্পর্শ সহ্য করতে না পেয়ে দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছে রেখে গেছে এই হতভাগিনীকে। যমেও আমাকে ছুঁতে চায় না চতুর্দ্দিকে শত্রু শাণিত অস্ত্র ধার দিচ্ছে। আমার পিতার সম্পত্তিকে নষ্ট করবার জন্য আমার প্রাণ নষ্ট করতেও অনেকে চেষ্টা করছে, খোদা এখন আমার

সহায় (১) আবদুল কাদেরের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা পাব বলে আশা করে ছিলাম সে আশারও শেষ হল সুরনের প্রাণ এই আলো ও আঁধারের সন্ধিস্থলে দূর মাঠের উপর যাইয়া যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আঁকড়াইয়া ধরিয়া পথের উপর পড়িয়া রহিল আজ তার পবিত্র ভাল-বাসা অনন্ত-গগন ছাইয়া, নিখিল-বিশ্ব ব্যাপিয়, দুনিয়ার সকল মানুষকে ভাল বাসিবার জন্য ছুটিল সে কতক্ষণ পর কামরায় মধ্যে আসিয়া শুইয়া পড়িল দরবেশ সাহেব বাহির বাড়ী চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"এই যে আবদুল কাদের মিয়া নৌকায় এসেছেন, কিন্তু একি ! ইনি যে মৃত্যু শয্যায় !"

---

(1) More enemies I have, than the hairs on my head
Let them not me deprave,
But fight thou in my stead.
—*Anne Askew's Prison Song*

পরিচ্ছেদ

(২৫)

আলোকে আঁধার।

জোনাবালি খাটের উপর শুইয়া লতিফনকে বলিল,—দেখ তোমার রূপ দেখে যে আমি অস্থির হয়ে যাই কি সুন্দর মুখখানি, যেন আকাশের তারা, আর আমি হই তোমায় দেখে পাগল পারা। কেমন মিল হচ্ছে? আমি হলাম কবি, কেন না পদ্য; অক্ষরে অক্ষরে মিল হলেই ত হল। আর যে মিল কর্‌তে পারে সেই হল কবি, আর যেই হলেন কবি সেই হলেন প্রতিভা লতিফন কোন কথা না বলিয়া অন্য কক্ষে চলিয়া গেল আজ কেন যেন তার মন এক অশান্তির আগুনে পুড়িতেছিল মনটা দেহের মধ্যে মাথা কুটিয়া কুটিয়া কাঁদিতেছিল। গহনার লিপ্সা ও অর্থ লিপ্সা মিটিয়াছে আশার শেষ নাই দেখিয়া তাহার মন দমিয়া গিয়াছে। মাটিতে বসিয়া ভাবিতে লাগিল—আমার গায়ে সোণার গহনা, পরণে মূল্যবান্ কাপড়, বাক্সে অনেক টাকা—সবই আছে, অথচ কি যেন নাই হৃদয়ের মধ্যে কিসের অভাব যেন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে আমার কি নেই। কোন অভাবের জাহাজ হৃদয়ে নঙ্গর করেছে যাক এ একটা বিকার। যাই, ঐ ডাকচেন। অনেক সময় কটু বলেন তবু ত স্বামী লতিফন জোনাবালির নিকটে গিয়া খাটের নিম্নে মাদুরে বসিল।

জোনাবালি বালিশের উপর হাত ঠেশ দিয়ে অর্দ্ধ শয়নাবস্থায় লতিফনের মুখের দিকে চাহিয়া গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে বলিল—আমার

উপর রাগ কর কেন? দেহ, মন, ধন, জন সকলই তোমাকে দিয়েছি তবু যে তোমার মন পাইনে? লতিফন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমাকে এ সব কথা বলে বৃথা কষ্ট দাও কেন? আমি স্বীকার করছি—জগৎ সমক্ষ স্বীকার করছি, আমার কিছুরই অভাব নেই আবার সেই জগতের সামনে চেঁচিয়ে বলছি আমার সকলই অভাব যদি টাকাকড়ি অলঙ্কার লোককে শান্তি দিতে পারত তবে আমিও শান্তি পেতাম, ডাকাতদের টাকার অভাব নাই তাই বলে ডাকাতরা সুখী নয়? আর এই অত্যাচার-উপার্জ্জিত টাকা আছে বলে কি তুমি সুখী? তুমি বুকে হাত দিয়ে দেখ রাত্রি দিন কি অশান্তিতে জ্বলছ। তোমার পাশবিক অত্যাচারে আমি কাঁদছি, পৃথিবী কাঁদছে। কিন্তু খোদার বিধানে এবার ঠিক মিল হয়েছে। তুমি পশু, আমি পশু হতেও অধম

আজ কাল জোনাবালীর মেজাজ কেন যেন বড় খিটখিটে হইয়াছে। জোনাবালী প্রায়ই লতিফনকে অকথ্য ভাষায় গালি দেয়, নানারূপ অত্যাচার করে আজ মফস্বল হইতে কিছু টাকা লইয়া আসিয়াছিল বলিয় মেজাজট একটু ভাল ছিল, কিন্তু লতিফনের কথায় ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল—এ সব পেয়ে তোর মন উঠবে কেন? নীচ লোকের মেয়ে, ধরাকে এখন সরাজ্ঞান করছিস্ লতিফন সহসা দাঁড়াইয়া বলিল—না আমি এখন ধরাকে সরা জ্ঞান করি না—একদিন করেছিলাম। স্বর্গের দেবকে পায়ে ঠেলেছি এখন নরকের কীট লয়ে নৃত্য করছি। আমাকে যা বলবার ইচ্ছা, বল আমি নীচ, আমার কর্ম্ম নীচ, আমার শেষ ফল নীচতাময় আমি নীচতার পঙ্কিলপ্রবাহে ভেসে এসেছি। আমি আর যা কিছু হতে পারি কিন্তু আমি নীচ লোকের মেয়ে নই।

জোনাবালির মুখে যে সব ভাষা সম্ভবপর তাহা প্রয়োগ করিয়া

এবং যে অস্ত্রের ব্যবহার করিলে সহসা লোকের জীবনলীলা শেষ হয় এমন অস্ত্রের ভয়ে ভীত করিয়া বাহিরে গেল। লতিফন কোন কথা না বলিয়া বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

জোনাবালি লতিফনকে নানাপ্রকারে অত্যাচার করিতেছে লতিফন বিনাবাক্যব্যয়ে সকলই সহ্য করিতেছে এক দিন রাত্রে জোনাবালির সহসা প্রবল জ্বর দেখা দিল। দুইদিন জ্বরভোগের পর তাহার হস্ত পদ অবশ হইয়া গেল, সে পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িল। পানির মত অর্থব্যয় করিয়াও কোন ফল হইল না, বরং পীড়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়া তাহার জীবনকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া দিল লতিফন দিবারাত্রি রোগীর শিয়রে বসিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল নারী চরিত্র বড় আশ্চর্য্য! যাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে, তার বিপদের সময় নারীর হৃদয়ে সহস্র দয়ার উৎস উথলিয়া উঠে। লতিফনের কত দিবস, কত রজনী জোনাবালির পার্শ্বে অর্দ্ধাহারে অনাহারে কাটিয়া যাইতে লাগিল

জোনাবালির আজ একে একে সব মনে উঠিতে লাগিল। এই মুখ দ্বারা কত সৎলোককে অযথা গালি দিয়াছে, কত নিরন্ন ভিক্ষুকের নিকট হইতে টাকা লইয়া উদরসাৎ করিয়াছে, সব মনে আসিতে লাগিল। চিকিৎসার ব্যয় করিতে করিতে তাহার শেষ সম্বল ভিটা বাড়ীটুকু বন্ধক পড়িল। ১৫৲ টাকা পেনশন মাত্র সম্বল দিয়া তাহার সংসার চলা ভীষণ কঠিন হইয়া উঠিল, তার উপর চিকিৎসার ব্যয়।

লতিফনের আশার বাহিনী বিবেকের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। এখন অদৃশ্য হস্তের দৃশ্যমান আঘাতে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে জোর করিয়া জীবন-উদ্যানে যে ফুল ফুটাইয়াছিল বিধাতার অজ্ঞাত-তাপে তাহা শুকাইয়া গিয়াছে। অদম্য কামনার

তাড়নায় যে আশার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল এখন কোন অজানা দেশ হইতে প্রবল ঘূর্ণিবায়ু আসিয়া ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে। যে ভুল আশার আলোকের পশ্চাৎ সে ছুটিতেছিল সে আলেয়া এখন বিজন প্রান্তরে রাখিয়া নিভিয়া গিয়াছে।

লতিফন ভাবিল, এখন আমার এ সকল হইতে উন্মুক্ত হওয়ার উপায় কি? চিন্তার আগুন যে ধূ ধূ করে জ্বলছে। ধমনীতে ধমনীতে আগুনের খেলা, শিরায় শিরায় চিন্তার তাণ্ডব লীলা, লোমে লোমে বিষের মত জ্বাল, দয়াময়, এ ভীষণ চিন্তার আগুন হতে আমায় মুক্ত কর— আমি যদি মুক্তপ্রাণ লয়ে, বনে বনে, তারায় তারায়, আকাশে আকাশে ঘুরে বেড়াতে পারতাম, এ দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে অপর দুনিয়ায় যেতে পারতাম, তবে বুঝি আমি শান্তি পেতাম তার ত উপায় নাই তোমার রাজ্য ছেড়ে যে আর কারও রাজ্য নাই। যতদূরই যেতে চাব, ততদূরের সীমাই তোমার তুমি আছ, তোমার বিধান আছে, তোমার আইন আছে, তোমার এই মহা-সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা আছে এই নানা দুঃখ, শোক, তাপ, চিন্তা, নৈরাশ্যময় বিশৃঙ্খল জগতে এক মহা-শৃঙ্খলা বিরাজ করছে। আমি স্বহস্তে সে শৃঙ্খলা ভেঙ্গে (১) শিকল পরেছি মুক্ত আকাশের মুক্ত সৌন্দর্য্য দেখবার শক্তি আর আমার নাই। এ পাপ-পঙ্কিল মন লয়ে যে তোমার জগতের কিছুই ভাল লাগে না। গাছ কেটে পানি ঢাললে সে গাছে ফুল ফুটবে কেন?

জেনাব আলী শয্যায় পড়িয়া লতিফনের হাত টানিয়া বুকের উপর রাখিয়া বলিল—দেখ লতিফন, আমার বুকের মধ্যে কি আগুন জ্বলছে। লতিফন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—এই পাপীয়সীর হাত দিয়ে তোমার জ্বালা কি করে বুঝবে? দুই জ্বরে রোগী একের হাত দিয়ে অন্যের

(১) Good order is the foundatio1 of a l good things—Bur1ce

গায়ের তাপ বুঝতে পারে না নিজে সুস্থ না থাকলে অন্যের কষ্টে সাহানুভূতি দেখান যায় না তোমার মুখ চেয়ে আমি কোন দিন কথা বলি নাই কিন্তু আজ আমার মুখের কপাট আপনি খুলে আসছে—জাহান্নাম তোমার জন্য নাই ত কার জন্যে আছে? চিন্তা তোমাকে না পোড়াবে ত কাকে পোড়াবে? পুত্রহীনের হাহাকার তোমার হৃদয়ে ধ্বনিত না হবে ত কোথায় ধ্বনি তুলবে পানিতে প'ড়ে মরা বালকের ভিক্ষুক পিতার ভিক্ষার টাকা আজ তোমার হৃদয়ে শেল না হানবে ত কাকে হানবে?

জোনাবালী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—সত্যই বলেছ লতিফন, এর একবর্ণও মিথ্যা নয়

লতিফন চক্ষুর পানি ফেলিতে ফেলিতে আবার বলিতে লাগিল—আর আমি—আমি না পুড়ব ত এ জগতে কে পুড়বে। যে ভীষণ আগুন, আবদুল করিমের হৃদয়ে জ্বেলেছিলাম, যা লোল-জিহ্বা বিস্তার করে বোধ হয় আল্লার আরশে ঠেকে ফিরে এসেছিল, যাঁর অন্তরের বেদনা আকাশ ছেয়ে দিগন্ত ব্যেপে এক বিরাট হাহাশ্বাস তুলেছিল,—তাঁর সেই দুঃখের প্রবাহ আজ অগণন তীরের প্রবাহের ন্যায় আমার বক্ষ ভেদ করে চলে যাচ্ছে আমার জীবন এখন ভীষণ মরুভূমি। এর চারিদিক ধূ ধূ করছে। এ দুনিয়ায় সব আছে ফুল আছে, ফল আছে, নদ আছে, নদী আছে, নদীতে নক্ষত্রের খেলা আছে পাখী আছে, পাখীর গান আছে, গানের সুরে মিষ্টতা আছে বনে লতা আছে, বৃক্ষ আছে, সে লতা-বৃক্ষে ফুল আছে, ফুলে সৌরভ আছে আঁধারে প্রদীপ আছে, বনে পথ আছে। পাহাড় আছে, পাহাড়ে চোক-জুড়ান ঝরণা আছে এ দুনিয়ায় সন্তানের জন্য মায়ের বুকে স্নেহ আছে ভাইয়ের জন্য ভাইয়ের মায়া আছে, বন্ধুর জন্য বন্ধুর হৃদয়ে ভাল বাসা আছে, সেবক সেবিকার সেবা করবার প্রবৃত্তি আছে জ্ঞানীর জ্ঞান বিলাবার ইচ্ছা আছে, পরের জন্য পরের

চোখে পানি আছে, রোগীর পাশে আপনাকে ভুলিয়া যাবার ইচ্ছা আছে দুনিয়াকে আদরে স্নান করিয়ে দেবার জন্য চাঁদের কিরণ আছে কিন্তু খোদার এই সব দান ভোগ করবার ক্ষমতা আমার নাই। আমার জন্য এখন পাখীর গানে মিষ্টতা নাই, লতায় ফুল নাই, ফুলে সৌরভ নাই, চাঁদের আলোতে প্রাণ মাতান সৌন্দর্য্য নাই এখন আমার, জগতের কোথাও সুখ নাই। পশ্চিম আকাশের ধীর-অস্তগামী সৌন্দর্য্যের আধার সূর্য্য কেবল চিন্তা ছড়িয়ে, দুঃখ ঢেলে ডুবে যাচ্ছে পূর্ব্ব আকাশের উদীয়-মান সূর্য্যের রক্তমাখা লাবণ্য-লীলা কেবল নৈরাশ্য ছড়ায়ে উঠছে, দুপ্রহরের সূর্য্য কেবল আগুন ঝরাচ্ছে, মুক্ত বাতায়ন পথের বাতা-সের ঢেউ কেবল চিন্তার প্রবাহ বয়ে আনছে অসীম আকাশের তারাগুলি আমার দিকে কেমন কট মট করে চাচ্ছে। দুনিয়ার আর কোনটা আমার? মৃত্যু—সে ত বিমল সুখ, সে আমাকে এখন ছুঁইবে কেন? আমার হাড় মাংস পিষ্ট না হলে—সে অকৃত্রিম বন্ধু মৃত্যু আমাকে ভালবাসতে আসবে কেন? এ বুকের স্পন্দন থামবে কেন? আমি কোথায় যাব? যেখানে গেলে সকল আগুন নিভে যায়, লোকে সকল দুঃখ ভুলে যায়,—সকল জ্বালা থেমে যায়, সকল রোগ সেরে যায়, যেখানে গেলে সকল দ্বেষ মুছে যাবে, মানুষ সকল হিংসা ভুলে যাবে—সকল আবেগ ধুয়ে যাবে, সকল আঁধার আলো হবে। যেখানে চির কাল আলোক জ্বলে —পবিত্রতা যেখানে রাজ্য করে, বাতাস যেখানে খোদার গান করে, পাখী যেখানে কলেমা পড়ে, যেখানে কি—যেন—এক স্বপ্নের আবেশে দেহ মন ঘুমিয়ে থাকে "যেখানে বাগাখানা সকলের নীচে দিয়ে কুলু কুলু রবে নদী সকল ধীরে ধীরে চিরকাল বয়ে যাচ্ছে" (১) যে সকল নদীর বক্ষ চুম্বন করে

(১) সুরা জোরম—একাংশের ভাবার্থ—কোরাণ

বাতাসের ঢেউ বয়ে আসে, যেখানে গানের সুর সুধা ঢালে, যেখানে "ইয়াকুত-মারজান-মনি তুল্য হুর সকল আপন আপন স্বামীর প্রতি একদৃষ্টে প্রেম বিতরণ করে, যেখানে ফোয়ারাগুলি চিরকাল উথলিত হচ্ছে, যেখানে গাছের শাখাগুলি চিরকাল ফল ফুলে ভরে থাকে" (১) সেখানে আমার মাথা রাখবার স্থান নাই আমার স্থান সেইখানে—যেখানে চিরকাল আগুন জ্বলে, আগুনের পানির ফোয়ারা যেখানে পানীয় সরবরাহ করে আহা, যদি খোদার দান বুকে রাখতাম, দুঃখের মধ্যে সুখের সন্ধান করতাম তবে আজ সুখের মধ্যে এসে দুঃখের আবর্ত্তে ডুবতে হত ন। এখন এমন ঘোর অন্ধকারের পথে কোথায় চলে যাচ্ছি।

---

(১) ছুরা রহমান একাংশ-ভাবার্থ—কোরাণ।

তৃতীয় প্রবাহ।

এদেশ—ওদেশ।

তোমরা দুর্ব্বল হইও না,—ভাবিত হইও না,—তোমরাই উন্নত থাকিবে যদি তোমরা প্রকৃত মুসলমান হও।

—কোরাণ—(ছুরা এমরাণ ১৪ রুকু)

(২৬)

নুরন্নেহার খাটের উপর শুইয়া বলিল—আচ্ছা বল দেখি, তুমি আমার কে? আবদুল কাদের হাতের বইখানা টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলেন—তুমি যেন কচি খুকী বুঝতে পারছ না আমি হচ্চি তোমার অস্থায়ী চাকর গরীব বেচারা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম দয়া করে আপাততঃ বাহাল করেছ কাজ পছন্দ হয় কিছুদিন রাখবে। আর না হয় বিনা নোটিসেই পদ্মা পার করে দিয়ে—একটা ভাল দেখে স্থায়ী করে নিযুক্ত করবে নুরন হাসিয়া বলিল—ফাজলেম রাখ,—তুমি জান না, যা মানুষের ভাষায় প্রকাশ করা যায় না কেবল অনুভব করতে হয়—তুমি তাই। অবদুল কাদের বিদ্রুপের সহিত হাসিয়া বলিলেন—হ্যা, ভাষায় প্রকাশ হয় না এমন জিনিষ কি আছে? সক্রেটিস, গ্লাডষ্টোন, ওমর-খৈয়াম, মিল্টন, মৌলানা রুম, সেক্ষপীর, সাদী, স্পেনসার, বায়রন, পোপ, হোমার, ভারগিল, এমার্সন—ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ, টেনিসন—এডিসন, হাফেজ, মিল, আফলাতুন, নিউটোন, ফ্রাঙ্কলিন, গ্যালিলিও আরস্ত তালিস, বেকন, কার্লাইল—কেটো, মেকলে, স্মাইলস—মৌলানা হালী—এঁরা জগতের কত নিভৃত ভাব ভাষার রাজ্যে এনে দিয়েছেন আর আমি তোমার কে,—এই ভাষায় প্রকাশ করা যায় না?

নুরন। তা বটেই তুমি হচ্চ জ্ঞান-বাগীশ, বিদ্যা মহিষ—ব্যাকরণ বিড়াল তুমি পারবে না কেন?

"আমি কিছু না হই আপনি ত বিদ্যা-বাগশালী তবে আমার

প্রতাপান্বিত শিক্ষয়িত্রীণী, আপনার ব্যাকরণ-সাগর আমার এই মরুভূমি তুল্য হৃদয়-সরোবরে প্রবেশ করাইয়া দিতে মরজী করুন”

সুরন হাসিতে হাসিতে ঘর ভরিয়া দিয়া কহিল—কি সুন্দর ভাষা-জ্ঞান আর তুলনা শক্তি গো! মরে যাই, ব্যাকরণ সেত তুমি দেখছি, ব্যাকরণ অপচার একেবারে ডবল স্ত্রীলিঙ্গ।

আবদুলকাদের। না, না, ভুল হয়েছে, আমি নিজেই যে ডবল স্ত্রীলিঙ্গ।

“কেমন?” “কারণ—তুমি,—তুমি আমাকে ডবল স্ত্রীলিঙ্গ করেছ। আমার বাড়ী নাই বলে, তোমার বাড়ীতে আমায় রেখে—আমাকে স্ত্রী করে রাখলে। স্ত্রীর বাড়ীতে যে থাকে সেত স্ত্রীর স্ত্রী কাজেই আমি ডবল স্ত্রীলিঙ্গ ”

“তুমি আচ্ছা বাজে বকতে পার পাকাম রাথ, এখন ব্যাকরণ পড় শিক্ষকের স্ত্রীলিঙ্গে শিক্ষয়িত্রী হয়। এইটে মুখস্থ কর, আর ছবক দেব

“তুমি দয়া করে যদি একটা ছবক লও তাহলে বড় সুখী হই” বলিয়া আবদুলকাদের সুরনের মুখের উপর ওষ্ঠ স্থাপন করিলেন সুরনও ওষ্ঠ দ্বারা তাহার উত্তর দিল আবদুল কাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা সুরন ব্যাপারটা কি বল ত? তুমি এমন সুখ ছেড়ে, সে বিয়ে না করে এ গরীব ব্যাচারার উপর এত দয়া করলে কেন বল দেখি?

সুরন।—তুমি আমাকে দয়া করে গ্রহণ করেছ ব'লে অহঙ্কার করছ?

আবদুলকাদের যার সহায় নাই, সম্বল নাই, এমন কি একখানা গৃহ পর্য্যন্ত নাই, তাকে তুমি যে স্বামীত্বে বরণ করলে—এটা কি তোমার দয়া নয়? তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হয়ে, এত বড়

জমিদারীর একমাত্র অধিশ্বরী হয়ে আমার মত পথের ভিখারীকে এত দয়া ক'রে পদ-কোকনদে স্থান দিলে কেন ?

নুরন হাত দিয়া আবদুলকাদেরের মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল—ফের যদি এসব কথা বল, আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাব বলে দিচ্ছি।

আবদুলকাদের বলিলেন—কার সঙ্গে বেরিয়ে যাবে ? আজ রাত্রেই যাবে ? আর বেরিয়ে গেলেই বা উপায় কি ? বেরিয়ে গেলে কেবল পথের দিকে হঁ করে তাকিয়ে থাকতে হবে যদি ধরতে যাই, ২।৪ জন চাকরকে হুকুম দেবে—"ম্যায়, দো এক মাহ্‌নে কো লিয়ে বাহের যাতা হোঁ। আবদুল কাদের কো পাকড়্‌কে বাঁধকে রাখ্‌খে।" তবেই তো আমি গেছি তখন তোমার মায়া ছেড়ে জানের মায়া নিয়ে অস্থির হতে হবে

নুরন যার জন্য কাঁদি তার চোখে নেই পানি।

আবদুলকাদের যার জন্য কাঁদি সে চায় বেরিয়ে যেতে!

উভয়ের মধ্যে একটা চাপা হাসি খেলা করিয়া গেল।

আবদুলকাদের তুমি সে বিয়েটা করলে না কেন ?

নুরন বিয়ে ত করতে চাইলাম তা আল্লার কি মরজী, হ'ল না।

তুমি চলে যাবার পরই এছলাম নিয়ে, নামাজ নিয়ে রফিক মিয়ার সঙ্গে আমার প্রাণের বরের হঠাৎ ঝগড়া বেধে গেল আমার বর ত নাকি কোন দিন নামাজের ধার দিয়েও যায় না তার পর আরও সে তর্ক করতে লাগ্‌ল যে, নামাজ, ও ত মনেই হয়, বৃথা উঠা নামা করার দরকার কি ? রোজা—ওত কেবল শরীরকে কষ্ট দেওয়া। রফিক মিঞা তর্ক বাধালেন—নামাজের দ্বারা মানুষের মন দিনের মধ্যে অন্ততঃ ৫ বার রুজু হয়, সেই মহান্ শক্তির কথা অন্ততঃ ৫ বার মনে পড়ে। নামাজ রোজা ও অন্যান্য ধর্মের বিষয় লয়ে কোরাণ এবং

বিজ্ঞান দ্বারা যে সমস্ত যুক্তি তিনি দেখালেন—মূর্খ বরটি আমার চুপ। এ বিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে দরবেশ-ছাহেব বাপের উপর রাগ করে কোথায় চলে গেলেন। ধর্ম্ম-প্রাণ বাপের মন সহসা যেন কেন এমন ফিরে গেল যে তিনি কিছুতেই বিয়ে দিলেন না। বললেন,—তুমিও যাও আধ্যাত্মিক বিয়ে করগে আমার কন্যাকে কিছুতেই তোমার হাতে দেব না। আমার সোনার বরটি মুখখানা কালি করে আস্তে আস্তে সাগর পার হল। পাত্রকনের পূর্ব্বেই তালাক হয়ে ছিল, তিনমাস দশ দিনও পুরে গিয়েছিল উঠে গিয়ে সেইদিনই তার খায়েরখাঁ সকল তার সঙ্গে আমার বরের বিয়ে দিল। রাফিক মিঞা বে-নামাজি হয়েও নামাজ রোজার জন্য তর্ক করতে করতে এমন নিষ্ঠ তাঁর হয়ে গেল যে সে দিন হতে তিনি নামাজ রোজা ধরে দিয়েছেন। এখন তিনি পাকা মুছাল্লি। তোমার জন্য তর্ক করতে গিয়ে একটা পাকা বেনামাজি নামাজ রোজা ধরে দিয়েছে। আর শুনবে?—আমার বর যখন উঠে গেল, আমি কেঁদে ফেললাম।

আবদুল কাদের। তাহলে তোমাদের মধ্যে বেশ প্রেম হয়েছিল?

নূরন। প্রেম—লোক যে সে প্রেম! আছমান জোড়া জমিন বেড়া। আর দেখ প্রেম যে হবে না—৪ ৫ হাজার টাকার সোনার গয়না,—এতেও যদি প্রেম না হয় আর তুমি একটা কিছুই দিলে না তোমার সঙ্গে বুঝি প্রেম? যাও আমি তোমায় ভালবাসিনে। আবদুল কাদের বলল—তবেই ত গেছি উপায়? "উপায় এই যে" বলিয়া নূরন, আবদুল কাদেরকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিল—খোদার নিকট শোকর কর—যার সীমাহীন দয়ায় আমার মত একটা রত্ন পেয়েছ।

"তুমি ঠাট্টা কর সুরন, আমি কি জানিনে তুমি কি। দার্জ্জিলিং থেকে মৃত্যু শয্যায় তোমার বাড়ী এসেছিলাম—চোখের জলের মধ্যে আমাদের বিবাহ হয়েছিল গাড়ী হতে পড়ে গিয়ে আমার পা'খানা যে রকম ভেঙ্গে গিয়েছিল,—তা আবার সম্পূর্ণ খোদা আরাম করবেন এ কেউ আশা করতে পারে নাই তুমি আপন ভুলে গিয়ে তোমার ঐ গোলাপ ফুলের মত দেহখানি মাটি করে অনাহারে অনিদ্রায় আমার শিয়রে কাটিয়েছ চিকিৎসায় এত অধিক টাকা ব্যয় হয়েছিল যে—তুমি তোমার সম্পত্তি বিক্রী করে ফেললে। এ সম্পত্তির দাম কত, এ জ্ঞান তোমার ছিল না। মাত্র পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রী করলে। রফিক মিয়ারা তা কিনে নিল। আমি সেরে উঠলে রফিক সে সম্পত্তি তোমায় ফিরিয়ে দিল সে কিছুতেই টাকা লইতে চাইল না, কিন্তু তুমি কিছুতেই দান গ্রহণ করবে না,—পাঁচ হাজার টাকা যোগাড় করে দিলে। আমার মত পথের ভিখারীর জন্য যে এ সব করতে পারে, সে আমার কি, তা কি আমি জানিনে!

"থাম থাম, তোমার আর অত বক্তৃতা করতে হবে না, দেশ উদ্ধার করে ফেল্‌লে দেখ্‌ছি।"

ঘোর-অন্ধকার-রজনীর ঘন-ঘটা সরিয়া গিয়া যেমন চাঁদ হাসিয়া উঠে, মহাসমুদ্রের প্রবল-ঝটিকা-সম্পাত দূরে গিয়া যেমন তাহার শান্ত, স্থির বক্ষে নক্ষত্র খেলা করে, অর্ণবপোত সকল তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া চলিতে থাকে, অর্দ্ধ-শুষ্ক-তরু-বল্লরী যেমন বসন্ত-বায়ু-হিল্লোলে মুঞ্জরিত হইয়া উঠে; বৃষ্টিবারি-অভাবে-হতাশ কৃষক যেমন আশাতীত বৃষ্টিপাতে নবজীবন লাভ করে, বিজন-পর্ব্বত-বাসী মেষ-পালক যেমন ঝটিকা-বেগ ও বরফ পাতের পর প্রান্তরে গিয়া তাহার বরফে-অনাহত মেষ-পাল দেখিয়া উৎফুল্ল হয়, প্রবল ঝটিকাহত পথিক যেমন বিজন-প্রান্তরে মনোরম অট্টা-

শিকার আশয় পাইয়া খোদার নিকট কৃতজ্ঞ হয় ঘোর দীর্ঘ, কষ্টময় রজনীর পরে প্রভাত-সূর্য্য যেমন হাসিয়া উঠে, আজ আবদুল কাদের ও নূরনের প্রাণেও তেমনি অনাবিল, অমৃতময়, অভাবনীয়, অপার্থিব ভাবের প্রবাহ ছুটিয়াছে। বিশ্বের সৌন্দর্য্য, বিশ্বের প্রেম, আজ যেন একাকার হইয়া তাঁহাদের দুয়ারে লুটাইতেছে

নূরন বলিল—জ্ঞান ত তুমি ঘোড়ার ডিম কেবল বিদ্যার অহঙ্কার —আচ্ছা বল ত গোল কয় প্রকার।

আবদুল কাদের —ইস, এই বলতে পারব না? অথচ আমি হলাম একজন বিদ্যার জাহাজ আমি ইতিহাস, ভূগোল, খগোল, মাথা গোল যত রকমের গোল পড়ে ফেললাম আর কয় রকমের গোল তাই বলতে পারব না? তারপর সাইকোলজি, বায়োলজি, জুলজি, জিওলজি, এণ্টীমলজি, হিষ্টোলজি, ফিজিওলজি যত রকমের লজি, ফিলোছফি থিওছফি যত রকমের ছফি তারপর লজিক, বোটানী, এনাটমী কেমিষ্ট্রী, পামিষ্ট্রী যত রকমের বিভাগ বল সকল বিভাগে এত গভীর জ্ঞান থাকতে তোমার ঐ বলতে পারব না? তুমি যদি আমার নাম ধরে ডাক, তা হলে আমি বলি।

"সর্ব্বনাশ, বল কি! আমাদের দেশে স্বামীর নাম ধরে ডাকতে আছে? সে যে মহাপাপ।"

"আমার নাম নিলে তোমার যেমন পাপ, তোমার নাম লওয়াও ত তেমন আমার পাপ ওয়ারলী জাতি (১) যেমন প্রাণান্তেও স্ত্রীর নাম

---

(1) A wali (a tribe) never mentions the name of his wife if asked he will give the name of a neighbour's wife and on no condition that of his own

The races of mankind Vol IV.—by Robert Brown. Ph D.

হয় না, জিজ্ঞাসা করলে পাড়া-পড়শীর স্ত্রীর নাম করে। আমিও তাই করব নাকি? আর তুমিও তেমনি কখন হারিয়ে গেলে আমার নাম না বলে অন্য দেশের কোন লোকের নাম লবে তখন আমার উপায় কি হবে?

নুরন আবদুল কাদেরের মুখ চাপিয়া ধরিল

পরিচ্ছেদ

(২৭)

কেবল সোণার কিরণ ছড়াইয়া সূর্য্য উঠিয়াছে আবদুল কাদের কর্ম্মান্তরে কলিকাতা গিয়াছেন। জমিলা সুরনকে বলিল—বুবু, তুমি যে দুলা-ভাইর শোকে পাগল হলে দেখছি! কল্‌কাতা গিয়েছেন, ২১ দিনের মধ্যেই আসবেন এর জন্য চিন্তা কি?

সুরন কার্পেটে সূচী চালাইতে চালাইতে বলিল—বোন, আমি আর পাগল হব কেন, তবে কয় দিন গিয়েছেন—যাক্—খোদার মর্জ্জী আমার আশা আছে—আজ না হয় কাল তাঁকে পাবই কিন্তু তোর কষ্ট দেখে মনটা বড়ই কেমন করে, বড়ই দুঃখ আসে—তোর সৌন্দর্য্য-ভরা ভরা যৌবন এ ভাবে থাকিস না বোন—বিয়ে কর। জমিলা লজ্জা—বিজড়িত মুখে বলিল—আপত্তি নাই বুবু

সুরন্নেছার বিস্ময়-বিস্ফারিত-লোচনে জমিলার দিকে চাহিয়া কার্পেটটা মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল—একি তোর সত্যি কথা—তুই যে তোর স্বামীকে অত ভালবাসতিস, যার জন্যে তুই মরতে গিয়েছিলি—আমি ত ভেবে রেখেছি তুই যেমন দৃঢ় চরিত্রের মেয়েমানুষ তুই তাঁর স্মৃতি বুকে করে পড়ে থাকবি। তার পর আমরা বনিয়াদী ঘর নেকাহ্ যে বনিয়াদী ঘরে হতে নাই জমিলা বলিল—হুঁ বুবু, সত্যি আমি তাঁকে প্রাণ ভরে ভালবাসতাম তিনি দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছেন; এখনও তাঁর স্মৃতিকে ভালবাসি, ভক্তি করি তাই বলে আমি বল্‌তে চাই না—আমি দুনিয়ার মানুষ নই তিনি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন,

আমি বাস্তব জীবন লয়ে এই প্রলোভন-ময় সংসারেই আছি। ও পাড়ার হরি বাবুর মেয়ে ত বিধবা হয়ে ব্রহ্ম চারিণী হলেন, হবিষ্যি খান আর স্বামীর স্মৃতি বুকে করে পড়ে থাকেন তার পর যখন ডুব দিয়ে পানি খেতে আরম্ভ করলেন তখন পিতামাতার মুখও হাসালেন, খোদার কাছেও মহাপাপী হলেন কেন শাস্ত্রে যখন আছে (১) তখন এ সব করার মানে কি? এমন কঠিন সংসারের প্রলোভনের (২) মধ্যে খোদার হুকুম অনুযায়ী একজন মাত্র মাঝির আশ্রয় লওয়া কি উচিত নয়? আর বুবু, একজন পুরুষ যেমন—একই সময়ে দুই স্ত্রীকে বিবাহ করে ও ভালবাসে আর সে বৈধ ভাবেই ভালবাসে, তবে স্ত্রীলোক এক স্বামী মরিয়া গেলে, অন্য স্বামী গ্রহণ ক'রে তাকে ভালবাসবে আর তার পূর্ব্ব স্বামীর স্মৃতিকে ভক্তি করবে—এতে দোষ বা অবৈধতা কি হতে পারে? এক বোঁটায় কি দুটো ফুল ফোটে না?

আমরা স্ত্রীজাতি বলেই কি যত দোষ? পুরুষ আর স্ত্রীজাতি দুই কি এ দুনিয়ার মানুষ নয়? আর তুমি বুনিয়াদী ঘরের কথা বলছ। আমাদের রছুলের চেয়ে বুনিয়াদী ঘরের আর কে আছেন?

নূরন বলিল—জমিলা, তোর হৃদয়-ভরা যেমন ভাল-বাসা, তুই যেমন করে স্বামীকে ভাল বাসতে পারিস—আমার সন্দেহ হয় আমি তেমন করে পারি কি না। তোর এই ক্ষুধিত ভাল বাসা কোন উপযুক্ত

(১) নষ্টে মৃতে, প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চ স্বাপৎ সু নারীনং পতিরণ্যো বিধিয়তে
—ইতি পরাশর।

(স্বামী, নিরুদ্দেশ, মৃত, সংসার ত্যাগ করিয়া গেলে পতিত কিম্বা ক্লীব হইলে—এই পাঁচ প্রকার বিপদে নারী ভিন্ন স্বামী গ্রহণ করিতে পারেন)

(২) The huge army of the world's desire—Shakespeare

প্রাণের আশ্রয় না পেয়ে মুছড়ে যাচ্ছে। তোর মত সরল প্রাণ, দৃঢ়-চরিত্র জমিলা কোন অচেনা অজানা পাষণ্ডের হাতে পড়ে আবার পথে ছারখার হবে—আমি ভেবে ভেবে এমন একজনকে তোর আশ্রয় ঠিক করেছি জমিলা, যার পবিত্র চরিত্র, যার কার্য্যকরী শিক্ষা, অগাধ জ্ঞান, অনুপম সৌন্দর্য্যের মত আমার চোখে জগতে আর দেখতে পাই না আবার কোথায় পড়ে কষ্ট পাবি বুন। .

জমিলা বলিল—খোদা, তোমার কাছে আমাকে সুখেই রেখেছেন তুমি আমায় স্থান না দিলে আমার দাঁড়ানর যায়গা ছিল না। নছিবের ফেরে, পিতা, বাড়ীটুকু পর্য্যন্ত আমায় রেখে যান নাই। তুমি না থাকলে কোথায় আশ্রয় পেতাম বুবু ?

নুরন জমিলাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তার মুখটা নিজের বুকের মধ্যে রাখিয়া বলিল ও সব কথা রেখে আসল কথা শোন—তোর দুলা ভাইকে তুই বিয়ে কর।

জমিলা অভিমানের স্বরে বলিল—বুবু তোমার মনে যা আসে তাই বল নুরন ঈষৎ হাসি মুখে জমিলার মুখটা কোলের মধ্য হইতে বাহির করিয়া মুখের নিকট ধরিয়া বলিল—কেন, এখনই যে তুই বললি এক স্বামী দুই স্ত্রীকে ভাল বাসবে এটা কখনই অসম্ভব নয়, তবে তোর আপত্তি কি ? দুটো বুন একখানে থাকব

"বেশত দু জন পড়া হচ্ছে। ভাল, ভাল, তোমরা দুই বুনে পড় ভাল এ বুঝি সেকন্দারনামার দ্বাদশ অধ্যায়। বেশ যা হোক্ আমার সঙ্গে এই দেখ, কয়টী ছেলে আর এই মেয়ে লোকটী আছে, এদের থাবার আর থাকার যায়গা করে দাও, আর বাইরে এর স্বামী আছে আর রমেশ বাবু আছেন তাদের খাওয়ার বন্দোবস্ত কর" বলিয়া আবদুল কাদের দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

অভিমানক্লিষ্ট মুখে "ছুল ভাইকে খেতে দে বুবু" বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তছির শেখের একটা গরু সম্বল। গরুটা বর্ত্তমানে এক সের করিয়া দুধ দেয়। তাই বিক্রয় করিয়া আর তছিরের স্ত্রী উঠানে জাংলা দিয়া তরকারীর গাছ লাগায়, তার ফল বেচিয়া এদের এক বেলা পরে এক বেলা অন্নের সংস্থান হয়। তছির ম্যালেরিয়ার প্রকোপে চির রোগী। তছিরের স্ত্রী গাইটা দোহাইয়া দুধ টুকু, আর মাচান থেকে একটা লাউ উঠাইয়া তাহাদের দশ বছর বয়সের পুত্র ঘুরোন দ্বারা নিকটবর্ত্তী বাজারে পাঠাইয়া দিল। বাজার সন্ধ্যার সময় জমিদারের কাছারী বাড়ীর সম্মুখে বসে। ঘুরোন বাজারে চলিয়া গেলে তছিরের স্ত্রী গরুর চাড়িতে গোটা কতক খড় মাখাইয়া দিয়া উঠানের উনান হইতে ভাতের হাঁড়িটা উঠাইয়া আনিয়া বারান্দায় রাখিল। তছির বারান্দার উপরে একটা ছেঁড়া মাদুরে শুইয়া ছিল। সে শীর্ণ হাত খানির উপর ভর দিয়া উঠিয়া বসিয়া ভাতের হাঁড়ির দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া আশান্বিত হইয়া বসিল। বাজার হইতে ঘুরোন মরিচ আর লবণ আনিলে তবে ভাতে-দেওয়া কুমড়া ভর্ত্তা করিয়া তাহারা আহার করিবে। ঘুরোনের আসিতে দেরী হইতেছে দেখিয়া তছিরের স্ত্রী সন্ধ্যাকালীন অন্যান্য কাজ সারিয়া ভাত বাড়িতে বসিল। ভাতের হাঁড়ির গলা ধরিয়া উহার ভিতর নাকুড় দিতে দিতে এক একবার ঘুরোনের জন্য দেউড়ীর দিকে তাকাইতে লাগিল। ঘুরোন বিষণ্ণ মুখে খালি হাতে ফিরিয়া আসিল।

"নুন কই বাবা?"

এতক্ষণ ঘুরোনের দুঃখ শোক লজ্জার আড়ালে ছিল, এখন মায়ের কথায় তাহা অশ্রুর আকারে প্রকাশ পাইল। সে কাঁদিয়া

বলিল—মা, উপায় নাই, লবণ আনতে পারি নাই। পিতার দিকে চাহিয়া কহিল—মা, আজ বাবাজানের যে খাওয়া হবে না। বাজারে যাবার পথে জমিদারের ছোট তরফের বরকন্দাজ বললে লাউয়ের দাম কত চাস; আমি বললাম—তিন পয়সা; সে ব্যাটা চোখ রাঙ্গাইয়া বলল—নায়েব মশায়ের জন্য লওয়া হচ্ছে, দুই পয়সা পাবি। আমি স্বীকার করলাম না—সে আমাকে ধরে নিয়ে নায়েব বাবুর কাছে হাজির করল। নায়েব ধমক দিয়ে বললেন—জমিদারের বাড়ীর তরকারী, ঠিক দাম না বললি ত কিছু পাবি না। আমি বললাম—হুজুর! ঠিক দাম বলেছি। আমার একটা পয়সা কম দিয়ে হুজুরদের বাড়ীর এত বড় দালানের একটু চুণের দাম ও হবে না, আমি বড় গরীব আমার একটা পয়সা কম করলে কি আপনার ভাল হবে?

নায়েব অমনি তর্জ্জন গর্জ্জন করে বলল "সে ব্যাটাকে বের করে, বেটা বড় ভাল মন্দ দেখাতে পারে। জমিদারের বাড়ীর জিনিষ এই কথা তার আবার ভাল মন্দ কি রে ব্যাটা? আমি মার খাওয়ার ভয়ে আস্তে আস্তে চলে গেলাম—কপালের কি দোষ মা,—থানার পথ দিয়ে যাচ্ছি—এক কোনষ্টেবল ডাকল "এই, বড় বাবুকে দুধ দিয়ে য,"—গেলাম—দুধের দাম জিজ্ঞাসা করলে বললাম বাবু এক সের দুধ আছে—দুই আনা চাই। তিনি দিলেন চার পয়সা। আমি নিলাম না। 'না নিল বেটাকে দূর করে দে" বলে হুকুম দিল। কোনষ্টেবল বলল—'কি! বড় বাবুকে চার পয়সায় দুধ দিবি না? যা ব্যাটা কিছুই পাবি না" বলে আমাকে তাড়িয়ে দিল।

তছির, পুত্রের কথা শুনিতে শুনিতে অশ্রু মোচন করিতেছিল।

তছিরের স্ত্রীর প্রাণটা তাহার দেহের মধ্যে কাঁদিয়া কাঁদিয়া লুটাইতে-

ছিল, কিন্তু সে বাহ্যিক ধীরতার সহিত বলিল—যাক বাবা, চিন্তা করিস না। কি করবি বাবা, উপায় নাই, এরাই রক্ষক বলে নাম ধরে ভক্ষক হবার সুবিধে পায়।

তছির শুধু ভাত কয়টা নাড়িয়া নাড়িয়া দুই একবার মুখে দিয়া খাইতে পারিল না, হাতের উপর ভর দিয়া আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে গিয়া "লায় লাহা ইল্লালা" বলিয়া তাহার শীর্ণ দেহ শয্যায় মিশাইয়া দিল ঘুরোন পিতার শিয়রে বসিয়া সরকারী ডক্তারের পানি খাওয়াইয়া দিয়া পিতার এই অনাহার-পীড়িত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

পিতা দক্ষিণ হস্ত খানা ঘুরোনের গায়ের উপর দিয়া বলিল—আর কেন বাবা আমায় ওষুদ খাওয়াও? আমার মত লোকের দুনিয়ায় বেঁচে লাভ কি? তোমাদের পেট ভরে এক মুঠো শাক ভাত দিতে যে বাপের ক্ষমতা নাই—তেমন পিতার দুনিয়ায় থেকে ফল কি বাবা? আমায় শীগ্‌গীর এসব থেকে সরে যেতে দাও। আমি বেঁচে থেকে চখের উপর আর এ সব দেখতে পারিনে।

রাত্রি ১০টা। হঠাৎ ঘরের চারিদিক হইতে আগুন জ্বলিয়া উঠিল

তছিরের স্ত্রী অন্য ২টী বালক বালিকা লইয়া এই ক্ষুদ্র ঘরের অপর পার্শ্বে শুইয়া ছিল। সে, উপায় নাই দেখিয় ছেলে দুইটীকে হাতে করিয়া তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল এদিকে ঘুরোন তছিরকে লইয়া কিছুতেই বাহির হইতে পারিল না তছিরেরও সাধ্য নাই, নিজ শক্তিতে সে উঠানে বাহির হইয়া আসে

তছিরের স্ত্রী বাহির হইয়া আসিয়া তার স্বামী পুত্রকে বাহির করিয়া আনিবার জন্য, সকলের পায়ে, লুটাইয়া পড়িতে লাগিল। কেহই অগ্রসর

হইল না দেখিয়া সে নিজে দৌড়াইয়া স্বামী পুত্রের দিকে যাইতেছিল "মা তুমি স্থির হও ওর মধ্যে তুমি যেও না, আমরা চেষ্টা করে দেখি" বলিয়া এমন সময় কে দুইজন যুবক বেগে উঠানে গিয়া দাঁড়াইলেন

"তোমরা এতগুলি লোক দাঁড়িয়ে দেখছ ? তোমাদের সাক্ষাতে দুটী মানুষ পুড়ে মরছে ! ধিক্ তোমাদের ."

"খোদা শক্তি দাও আমাদের সাহায্য কর, আজ এদের যেন রক্ষা করতে পারি" বলিয়া মালকোচা মারিয়া আবদুল কাদের কোরাণের আয়েত পড়িতে পড়িতে দৌড়িয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন

"রাম, মধুসূদন, কে এ আগুনে প্রাণ খোয়াবে মশায় ?" বলিয়া এক ভট্টাচার্য্য রমেশের দিকে চাহিলেন রমেশের কাপড় খুলিতে দেরী হইতেছিল ক্ষিপ্রতার সহিত কতকটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া রমেশ, আবদুল কাদেরের পশ্চাতে আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িল (১)

নিমিষের মধ্যে তাঁহারা অক্ষত দেহে তছির ও তাহার পুত্রকে লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন

অগ্নি আরও কয়েকটী হিন্দু গৃহস্থের গৃহ উদরসাৎ করিয়া নিভিয়া গেল

আজ কলিকাতা হইতে রমেশকে সঙ্গে করিয়া আবদুলকাদের বাড়ীতে আসিতেছিলেন বাড়ী এ স্থান হইতে আর ১১ মাইল নৌকা যোগে ষ্টেশন হইতে বাড়ী যাইতেছিলেন

তাঁহাদের অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইতেছিল এত পথ স্রোতের প্রতিকূলে যাইতে অধিক রাত্রি হইয়া যাইবে ভাবিয়া এবং এই তছির পরিবারটী

(১) The heroic example of other days is in great part, the courage of each generation—Hooper.

এমন অভুক্ত অবস্থায় আছে জানিয়া তাঁহারা এই স্থানেই আহারের আয়োজন করিলেন

তছিরের বাড়ীর উঠানে লেবু গাছ তলায় তাহার পরিবার-বর্গকে রাখা হইয়াছে। গাছ তলার একদিকে আহার্য্য প্রস্তুত হইতেছে। গ্রামের মধ্য হইতে, পয়সা দিয়া চাউল, ডাউল সংগৃহীত হইয়াছে

আবদুলকাদের কোট উঠাইয়া দেখেন, তাহার মধ্য হইতে ২০০৲ টাকার নোট নাই খুচরা কয়টী টাক আছে কতকগুলি লোক তাঁহাদের অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল তছিরের মধ্যম কন্যার বয়স ৬৭ বৎসর হইবে সে বলিল—বাবু; আমি দেখলাম গৌর ঠাকুর একবার কোট থেকে যিনি কি বের করে নিচ্ছিল। আপনারা তখন কোট ফেলে বাপকে আনতে গিয়েছিলেন

রমেশ ও অবদুল কাদের আপাততঃ কোন অনুসন্ধান না করিয়া তছির পরিবার লইয়া আহারে বসিলেন

রমেশ হিন্দু হইয়া মুসলমানের বাড়ী মুসলমানের সঙ্গে আহার করিতেছে;—কৌতূহল পরবশ হইয়া অনেকে এই তামাসা দেখিবার জন্য আসিয়া দূরে দাঁড়াইয়া রহিল

কেহ বলিল;—আরে দেখেছ? লোকটা মোসলমানের সঙ্গে ভাত খেল। আর কিছু নয়; মোসলমানের জলের সিদ্ধ চাউল নয়;—মোসলমানের তৈরী আখের রসের ব, খেজুরে রসের গুড় নয়,—মোছলমানের দোহা জ'লো দুধ নয়,—মোছলমানের ছোঁয়া সোডা লেমনেড নয় কিম্বা চুপে চুপে বাড়ীতে মুরগীর মাংস নয়, একেবারে অন্ন, একেবারে ভাত। কি অন্যায়—কি অন্যায়! জগৎটা রসাতলে গেল! গৌরঠাকুর নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল—আরে,বেটা বোধ হয় ছোট হিন্দু আচ্ছা একবার

ওর পরিচয়টা নিতে হবে। খাওয়াটা শেষ করুক আগে, বুঝলে কি না!

হরিচরণ বলিল—না ভট্টাচার্য্যি মশায়! ছেলেটাকে দেখতে যেন বড় লোকের ছেলে বলেই লাগে

ভট্টাচার্য্য মুখভঙ্গী করিয়া বলিল—আরে রসো হে রসো। ওর খাওয়াটা হলে ওর বড়লোক গিরি বের করব'খন

রমেশের আহার শেষ হইলে ভট্টাচার্য্য অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"মহাশয়ের নাম ?"

"আমার নাম রমেশচন্দ্র মৈত্র"

"কি করেন ?"

এম, এ, পাশ করে ল ক্লাশে ভর্ত্তি হয়েছি"

"বাড়ী, পিতার নাম ?"

"বাড়ী করিমপুর, পিতার নাম রমণীমোহন মৈত্র"

ভট্টাচার্য্য ও বাবু কর্ত্তা, আপনি করিমপুরের জমিদার রমণী বাবুর পুত্তুর ওঁর নামে, কি বলে বুঝলে কিনা বাঘে ছাগলে জল খায় আমাদের এ গ্রামের জমিদারের চেয়ে বড় জমিদারী—আপনি—আপনি তাঁর পুত্তুর ?

রমেশ বিনীতভাবে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—আজ্ঞা হাঁ।

ভট্টাচার্য্য। তবে আপনি—আজ্ঞা আপনি এ করলেন কেন ?

"কি করলুম ?"

"এই ভাত—অন্ন।"

"ও এখানে ভাত খেলাম তাই বলছেন ? আর আপনারা মোছলমানের পকেট থেকে টাকা চুরি করলেন কেমন করে ? তাও করলেন যখন সে মুসলমান অপরের জন্য আগুনের মধ্যে"

"ওরে বাবা বলে কি!" বলিয়া ভট্টাচার্য্য একটু একটু করিয়া পিছাইয়া সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিল।

"আমি এখন থেকে একজনকে ও সরতে দেব না সব বাট' যাতে জেলে পচে তার ব্যবস্থা আমি করছি।"

তছিরের পুত্র অগ্রসর হইয়া বলিল—বাবু,—ঐ ঠাকুরই কোট থেকে টাকা বের করে নিয়েছে, আমি দেখেছি

ভট্টাচার্য্য টিকিটার উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—মধুসূদন! বলে কি! আর কর্ত্তা, আপনি—ওর কথ—বুঝে দেখুন—আমরা—আমরা বেরাহ্মন, তাতে, দেখছই ত বাবা গায়ে নামাবলী—মাথায় এই দেখছ এত বড় টিকি—আমায় এতবড় কথা বলে! মধুসূদন! আমরা কি—

"তুমিই যে টাকা চুরি করেছ তা আমি বুঝতে পেরেছি তোমার কি সাহস?"

"না বাবা, আমরা কি চুরি করতে পারি? তবে বাবা,—তবে কোন জিনিস যদি পড়ে থাকে, তা দেখলে, তুলে না রাখ বড় পাপ, তাই—শাস্ত্রেও বলে—পর জিনিষেষু সর্ব্বত্রং রক্ষতি"

"না ঠাকুর পর পকেট-স্থিতং টাকাং সর্ব্বত্রং ভক্ষতিঃ"

"তাই বলছিলাম বাবা শাস্ত্রে—এই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে, উপনিষদে এই শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় এই— ।"

"এই তোমার মাথায় আর মুণ্ডুতে চুপ কর—টাকা দাও"

"টাকা কয়টা ওখানে পড়ে ছিল তাই তুলে রেখেছিলাম। বাড়ী থেকে এনে দিচ্ছি বাবা! মধুসূদন!" বলিয়া বাড়ী হইতে টাকা আনিয়া রমেশের হাতে দিল

তছির লেবুগাছ তলায় শুইয়াছিল সে পাশ ফিরিয়া ধীরে ধীরে

বলিতে লাগিল—বাবা, বলব কি, আজ এ দুঃখের দিনে আমার আর ভয় হচ্ছে না তাই বলতে সাহস করেছি—ওরা আমাকে যে চোখে দেখে তা ঐ খোদা জানে। সে আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে আবার থামিয়া বলিতে লাগিল—ওরা আমাকে, যা মনে আসে তাই বলে গাল দেয় আমি মাত্র একঘর মোছলমান এই গ্রামে আর দুই ঘর ছিল তারা এখানে নানা রকম ব্যারামের জোর দে'খে উঠে গেছে। ওরা বলে বেটা মুরগী খোর তোকে ছোয় যায় না।

রমেশ রোষকষায়িত-লোচনে বলিল—'তুমি তার উত্তর দাও কি'' ?

''বাবা আমি আর কি উত্তর দিতে পা'র ?''

রমেশ বলিতে আরম্ভ করিল—তোমাদের মোছলমানদের মধ্যে অনেকের আত্মসম্মান জ্ঞান নাই তাই হিঁদুরা গালি দিতে সাহস পায়, তোমাদের ঘৃণাজনক কথা বলে, আর ঐ রকম ব্যবহার করে, আর তোমরা হা করে সহ্য কর।

তুমি মোছলমান তোমাকে যখন বলে মুর্গীখোর, তখন তুমি বলতে পার না ''তুমি দুড়োখোর কাঁকড়াখোর,'' আমাদের কাছে মুরগী যেমন অখাদ্য, আমি জানি—তোমাদের কাছে দুড়ো আর কাঁকড়া তার চেয়েও অনেক ঘৃণ্য তোমাদের কোন মুসলমান, দুড়ো আর কাঁকড়া স্পর্শ করে না, কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেক বাবু মুর্গীকে অতি সুস্বাদু উপাদেয় খাদ্য জেনে সংগোপনে তার শ্রাদ্ধ ক'রে তোমাদের ও খাদ্যটার দাম চড়িয়ে দিচ্ছে আমাদের অনেকে হোটেলের কামরায় বসে মুর্গী মারেন আর অনেকে সুরাদেবীর পাদমূলে আত্ম বিক্রয় করেন, তাঁরা স্পৃশ্য, আর তোমরা অস্পৃশ্য তোমরা প্রকাশ্যে খাও মুর্গী আর তাঁরা গোপনে, এই তফাৎ, আমাদের এই সব কুলগুরুরা এসব করে এসে এক হুকোয় সেই মুখ দিয়ে তামাক খান আর তোমরা সে চৌকীর উপর ব'সে

থাকলে উঠে গিয়ে তাঁদের তামাক খাওয়া হয় তোমাদের সঙ্গে যখন এই রকম অভদ্র ব্যবহার করে, আর ঘৃণাজনক কথা বলে, তখন তোমরাও সেই সব লোকের মুখের উপর দু ঘা কষে দিতে পার না? তা হলে ও সব ভণ্ড মূর্খদের আক্কেল হয়। তা তোমরা করনা, ভদ্রলোকের মত সব সহ্য কর, তাই ওদের অত আস্পর্দ্ধা।

তছির ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—বাবু তা না করেই যে ফল, তাত স্বচক্ষে দেখলেন! আমি একটা মুর্গী জবাই করে খেয়েছিলাম—তার কতক গুলো ফ'ড় পাখা রাস্তার ধারে পড়েছিল, তাই ভট্টাচার্য্য মশাইদের পায়ে নাকি পথে চলতে স্পর্শ লেগেছিল অমনি মুখের উপর আমাকে যা বলবার বললেন—"বেটা মোছলমান, উঠে যা গাঁ থেকে, বেট অস্পৃশ্য করে মারলে।" আবার নায়েব মশায়ের কাছে যেয়ে দাদ-খাহ করল, নায়েব বাবু ডাকিয়ে নিয়ে ধমকাতে ধমকাতে বললেন "বেটা মুর্গী খাওয়া ছাড়বি তবে আমাদের এলাকায় থাকবি। বেটার দশ টাকা জরিমানা করতাম তা বেটা হিসাবানা পার্ব্বণী গুলোই এ পর্য্যন্ত শোধ দিতে পারল না, তারপর আর জরিমানা করে লাভ নাই। 'তবে বারদিগর এ সব করলে হিসাবানা পার্ব্বণী আদায় যেমন ক'রে করে তা হবে আর এর প্রতিকার ও যেমন করে করতে হয় করব। আমার দয়ার শরীর বলে আজ আর কিছু বল্লাম না।"

আমি বল্লাম—"বাবু সে দিন যে আমার বাড়ী থেকে দাম না দিয়েই বড় নায়েব বাবুর জিনিষ বলে আমার বড় খাসে' মোরগ আর ৫ টা ডিম লয়ে এসে আপনারা সেবা করলেন তাতে ত কোন দোষ হল না?' সেখানে আরও অনেক লোক ছিল। নায়েব বাবু মুখ একেবারে ফ্যাকাশে করে ফেলে বললেন—"যা, যা, বেটা ভবিষ্যতে"।—বড় ভাগ্যের জোরে,

আমি সেলাম করে জান বাঁচায়ে বাড়ী এলাম। কিন্তু ঐ ঠাকুর যখন তখনই যা ইচ্ছে তাই বলে।

কথা বলিতে বলিতে তাছরের মুখ শুকাইয়া যাইতেছিল—সে ঢোক গিলিয়া পোড়া ঘরের ছাই গুলির দিকে হাত দিয়া দেখাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল—আর এই যে বাবা দেখছেন, এর মধ্যে যে ঐ ঠাকুরই আছেন তা স্পষ্ট আমি বুঝতে পারছি কিন্তু আমি যখন নিজে ওঁকে দেখি নাই তখন আমি কারও নাম করব না এ খোদা। ওরা আমার যা করল ওদের যেন ভালই হয়।

রমেশ বলিল—আচ্ছা ও যে তোমার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করে তুমি তার কি কর ?

"বাবা, আমি জ্ব'রে ভুগ'ছি আমার বড় ছেলেটা গাইর যে দুধটুকু হয়, আর ফল মূল বেচে আনে, তাই দিয়ে কোন মত সংসার চলে, আমি কি করতে পারি ?"

"তোমাকে ঘৃণা ক'রবার ওরা কে? ঐ ভট্টাচার্য্যের উপর যদি তোমার সন্দেহ হয় তবে তার বিহিত উপায় আমরা করছি।"

ভট্টাচার্য্য আজ্ঞা কর্ত্তা আপনি বামন হয়ে ঐ মোছলমানের কথা শুনে, আমাকে অপমান করবেন না "

মোছলমান শব্দটা এমন ঘৃণার সহিত বলিল যে আবদুল কাদেরের আত্ম সম্মান পূর্ণ বুকে তাহা তীরের মত বিদ্ধ হইল তাঁহার ইচ্ছা হইল, —ভট্টাচার্য্যের টুঁটিটা ধরিয়া একটা ঝাঁকি দিয়া দেন কিন্তু রমেশের হাতের ঈঙ্গিতে তিনি রাগটা তখন সামলাইয়া লইয়া রক্তবর্ণ চক্ষুতে উহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রমেশ।—তা হলে ঠাকুর এ কাজ তোমার দ্বারাই হয়েছে, তুমি এই

নিরীহ লোকটাকে গ্রাম থেকে উঠিয়ে দিবার জন্য জমিদারের সঙ্গে যুক্তি করে এ করেছ।

"ওরে বাপ বলে কি, ও সব কথা শত্রুতা বাপ ধন, আমরা কি ওই পারি বাবা,—বুঝলে কিনা, ওর নাম কি—আমরা তা—তা বল কি বাবা, রাম, মধুসূদন রক্ষা কর!

রমেশ কম্পিতস্বরে বলিল—তা বুঝতে পারি—যে একজন প্রতিবেশীর ঘরের আগুন নিভান রেখে টাকা চুরি করতে পারে—সে না পারে কি? তুমি এত কাণ্ড করেও শুদ্ধাচার, আর ঐ নিষ্পাপ ডছির অপবিত্র ও যদি একটু মিথ্যা কথা বলে যে ঐ ঠাকুরকে আমি আগুন দিতে দেখেছি, তবেই ঠাকুরকে শ্রীবৃন্দাবন ছেড়ে বিশ্রী নির্যাতনে পড়তে হয়! কিন্তু ও এতটুকু মিথ্যা কথা বলতে রাজী নয় সুতরাং ও অস্পৃশ্য, ওর জল অস্পৃশ্য, আর তুমি পবিত্র, তোমার সব জিনিষ পবিত্র! তুমি একবার হিন্দু চামার পাড়ায় গিয়ে বাস কর দেখি তোমাকে কে চামার না বলে? অথচ তুমি পবিত্র!

আবদুল কাদের এতক্ষণ রাগে ফুলিতেছিলেন রমেশের দিকে বক্র দৃষ্টি ফেলিয়া ভট্টাচার্য্যকে বলিলেন—ঠাকুর! আমিও যে মোছলমান!

এই গোলমালের মধ্যে আবদুল কাদেরের টুপী নৌকার মধ্যে ছিল বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়, মোছলমান বলিয়া ইঁহাকে বিশেষ ঠাহর করিয়া উঠিতে পারে নাই—সে চক্ষু উর্দ্ধে উঠাইয়া বলিল—তা বাবা, তোমার ভদ্রলোকের মত চেহারা, তেমনি কাপড়-চোপড়, তুমি কেন মোছলমান হবে বাবা! রামঃ!

আবদুল কাদের ক্রোধমাখা-হাস্যমুখে বলিলেন—ও ঠাকুর তাহলে হিন্দুই বুঝি ভদ্রলোক; আর মোছলমান ভদ্রলোক নয়? সুন্দর চেহারাটা শুধু হিন্দুরই আছে? আর ভাল কাপড় চোপড়, এ মোছল-

মানের পরবার অধিকারই নাই, কেমন ? ঠাকুর সহজ ভাবেই তোমাকে বলি—খোদা আমার অবস্থা ভাল করেছেন, আমি পরিষ্কার কাপড় পরেছি, তা'র অবস্থা খারাপ জন্য—অনেক স্থলে তোমাদের কৃপায়ই ওদের অবস্থা খারাপ—তারা ভাল কাপড় পরতে পায় না। তারা গরীব, নবাবী চালে চলতে পারে না তা মানি, কিন্তু তোমাদের হিন্দুর মধ্যে অনেক নাপিত, কুরি, ময়রা যাদের জল তোমরা অনেকে খাও, তাদের গায়ের ময়লা কাপড় আর গায়ের গন্ধে যে কাছে যাওয়া যায় না, তা কি একবার চোক খুলে দেখে থাক ঠাকুর! তোমাদের অনেক রাঁধুনী বামনের গায়ের কাছ দিয়ে গেলে যে বমি ওঠে!

ভট্টাচার্য্য বলিল—যাই বল বাবা, তুমি কি আমাদের চোখে ধুলি দিতে পার ? তুমি যে মোছলমান নয় তা আমরা বুঝতে পেরেছি আমাদের সঙ্গে কি ঠাট্টা করতে আছে শ্রীরামঃ!

আব্দুল কাদের পূর্ব্ববৎ স্বরে বলিলেন—তোমাকে খালি ঠাট্টা করে ছেড়ে দিচ্ছি না ঠাকুর, মোছলমানকে ঘৃণা করা, গাল দেওয়া আর মোছলমানের ঘরে আগুন দেওয়ার শোধ না দিয়ে তোমাকে ছাড়ছি না, এ জেনে রেখ। ভট্টাচার্য্য এতক্ষণ মনে করিয়াছিল—এই সব বাজে কথার মধ্যে আসল কথাটা ইঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন এখন আসল কথাটার উল্লেখে সে একেবারে আঁৎকিয়া উঠিয়া বলিল—অ্যাঁ—বল কি বাবা, তোমাদের কি বিশ্বাস হয়, বুঝলে কি না, আমরা এর উপর অত্যাচার করেছি ?

"নিশ্চয়, এর প্রতিকার আমরা করবই" ঠাকুর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—ওরে বাবা তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে বাঁচাও বাবা, আমার কোন দোষ নাই বাবা, ঐ নীরোদ বাঁড়ুয্যে ঐ আমাকে যুক্তি দেয়, ও আবার উপর থেকে হুকুম এনেছিল আমি প্রথমে একদিন ওকে

বলেছিলাম বটে, কিন্তু তারপর আমি একেবারে চুপ করেই ছিলাম, ওই ব্যাটাই আমাকে খুচিয়ে তুলে এ করিয়েছে, ও বাবা তোমরা—আপনারা বাদশার জাত বাবা, তোমাদের বড় ক্ষমাগুণ বাবা।

ভট্টাচার্য্য আব্দুল কাদেরের পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল।

আব্দুল কাদের ভট্টাচার্য্যকে উঠাইয়া বলিলেন—ঠাকুর, ওই বেলায়ই আমরা বাদশার জাত, অন্য সময় আমরা বিড়াল হতেও অস্পৃশ্য! বেশী কিছু আর তোমাকে ক'রবার উপায় নাই—এখানে কেউ সাক্ষী দেবে না তা আমরা বুঝলুম—কিন্তু তোমার মত হিঁদুই আজ হিন্দু মুসলমানে প্রাণে প্রাণে মিলবার অন্তরায়। কোন্ আত্মসম্মান-সম্পন্ন মুসলমান এ রকম ব্যবহার পেয়ে প্রাণে প্রাণে মিশতে পারে? তোমরা বিনা কারণে তাদের আত্মসম্মানকে আহত ক'রছ অনেক উচ্চশিক্ষিত হিন্দু মুসলমানে মিলন হলেও তোমাদের মত নীচ প্রাণ হিন্দুর জ্বালায় উভয়ের প্রাণের বিরাট আকাঙ্ক্ষা হাহাকার করছে আর মাথা কুটে মরছে

রমেশ এতক্ষণ চুপ করিয়া সব শুনিতেছিল আর মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। সে বলিল—তোমার কি সাহস ঠাকুর! তুমি এত কাণ্ড করেও আবার আমাদের সামনে এসে—টিটকারী দিচ্ছিলে? তুমি মনে করেছ, তোমার ঐ লম্বা টিকি তোমার সব শয়তানীকে ছাপিয়ে রাখবে।

"যাই বল বাবা—টিকি হচ্ছে ধর্ম্মের নিশান বাবা—এর অবমাননা করো না বাবা, আমি তোমাদের গোলাম বাবা। আমার মত ক্ষুদ্র জীব মেরে তোমাদের কি হবে বাবা" বলিতে বলিতে ভট্টাচার্য্য সরিয়া পড়িল।

উহার বিরুদ্ধে কেহ সাক্ষী দিবে না দেখিয়া তাঁহারা আর কোন প্রতিকার করিতে পারিলেন না।

আব্দুল কাদের, তছির ও তাহার পরিবারবর্গকে লইয়া বাড়ী পৌঁছিয়া সুরনের নিকট সমর্পণ করিতে পাঠক পাঠিকা দেখিয়াছেন

কয়েক দিনের মধ্যে এ বাড়ীর নিকটে তছিরের বাসভবন ও গ্রাসাচ্ছাদনের সুন্দর বন্দোবস্ত দেখিয়া তছির তাহার স্ত্রীকে বলিল—দেখেছ, খোদার ইচ্ছা আর তাঁর কার্য্য! তিনি কি দিয়ে কি করেন কে বুঝবে? এত কষ্টের পর ও যখন আবার ঘরটুকুও আগুনের মুখে গেল, তখন ভাবলাম আমরা নিরুপায়, এখন দেখছি, দুঃখ চরমে উঠ্‌ল সুখ ডেকে আনবার জন্য খোদা, এই করে থাকেন তবে কারও এই দেশে কারও সেই দেশে

(২৮)

এর পর দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। একদিন আবদুল কাদের বলিলেন—আচ্ছা সুরন, তুমি নিজের গহনা গুলো ফেলে রেখে রফিকের দেওয়া ঐ একখানা গহনা পর কেন?

"ওটা যে তোমার বন্ধুর দেওয়া, কিন্তু রফিক মিঞা বলেন—ওটা তোমার দেওয়া—যাই হোক—তোমাদের পক্ষের ত। ওটা রেখে নিজের গুলো গায় দিয়ে ক্ষয় করব কেন?"

"আরে ওটা ও আমার টাকার নয়। এক সময়ে আমি দায়ে পড়ে রফিকদের কাছ থেকে কিছু টাকা কর্জ্জ লই দার্জ্জিলিং যেয়ে সেই টাকা পাঠাই। সে জান'ত, আমি সাধ্য পক্ষে কারও দান লই না বাধ্য হয়ে সে টাকা গ্রহণ করেছে আর তাই দিয়ে ঐটে তৈয়ের করে তোমায় দিয়েছে—অর্থাৎ পাকে চক্রে সে টাকাটা নিল না। আর তুমি যে তোমার মূল্যবান গহনা রেখে—গহনা ব্যবহার করা তোমার ইচ্ছা বিরুদ্ধ হলেও—কেন যে ঐটে সব সময় ব্যবহার কর তা আমি বুঝি সুরন, বুঝি তোমার রূপও যেমন উচ্চের দেশের, মনটাও তেমনি উচ্চের দেশের আমি নিঃস্ব গরীব, তোমার বাড়ীতে তোমার উপর আমার কর্ত্তৃত্ব—আমার মনের এ দুঃখটা যাতে ঘুমিয়ে থাকে—তাই তুমি ঐ জিনিষটাই ব্যবহার কর তুমি দেখাতে চাও তুমি আমার নিকট ঋণী। তোমাকে দিবারও ক্ষমতা আমার আছে"

"কাজলেম করো না বলে দিচ্ছি তোমার আত্ম-সম্মানের

জ্বালায় পুড়ে মলাম। চল তোমার যেখানে ইচ্ছা আমায় লয়ে চল আমি এ বাড়ীতে থাকব না। ওরে কে আছিস? আমি যা বলি চৈৎসিংকে বলে আয় ত”

“তবেই হয়েছে, চৈৎসিংকে আর ডেকো না দেবী। তুমি নাকি আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী, তবে এত নির্দ্দয় হয়ে অর্দ্ধাঙ্গকে চৈৎসিংএর দ্বারা কর্ণ মর্দ্দন আর অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা কর কেন দেবী? আমি নিজেই যাচ্ছি। কোথায় যাবরে, আমার নিজের বলে মাথা রাখবার স্থানও যে আমার নাই।”

'ইস, মিথ্যুক! দেখ ত তোমার আছে কি না?' বলিয়া নুরন বাকসর মধ্য হইতে একখানা রেজেষ্টারী দলিল আনিয়া হাসিতে হাসিতে আবদুল কাদেরের হাতে দিল। তাহাতে লেখা—নুরনের পিতার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী স্বত্বে স্বত্ববতী হইয়া সমস্ত সম্পত্তি আবদুল কাদেরকে উপহারস্বরূপ লিখিয়া দেওয়া হইল। মাত্র দুই আনা অংশ তাহার নিজের রহিল। সে অংশও—খোদা না করেন—তাহার স্বামীর অভাবে তাহাতে বর্ত্তিবে। স্বামী বর্ত্তমানে সম্পত্তির কোন অংশের উপর তাহার কোন স্বত্ব থাকিবে না।

আবদুল কাদের পড়িয়া দেখিয়া বলিলেন—পাগলি, এ করেছ কি?

“পাগল নয় পাগলী, এত ব্যাকরণ শিখালাম তবুও ভুল কর চল এখন তোমার বাড়ী থেকে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। আমায় একটু এগিয়ে দাও চল”—বলিয়া নুরন আবদুল কাদেরের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া দেউড়ীতে রক্ষিত দুইখানা পালকীতে উঠিয়া বাগান-বাড়ী পৌঁছিল। বাগান-বাড়ীটা বাড়ী হইতে বেশী দূরে নয়। এটাও নদীর উপর এ বাড়ীটা প্রকৃত পক্ষে বাগান-বাড়ী নহে এটা নুরনদের

পূর্ব্বপুরুষদের বসত বাটী। এখন এখানে কেউ বাস করেন না তবে নদীর ধারের ঘরটা বেশ সুন্দরভাবে সজ্জিত রাখা হইয়াছে

সন্ধ্যার পর দরবেশ সাহেব এই বাড়ীতে মৌলুদ পাঠ করিলেন। সেই সঙ্গে কতকগুলি মুছাল্লী ও গরীব মিছকিনকে আহার করান হইল।

জ্যোৎস্না-সিক্ত রজনী বাগান-বাড়ীর গাছ পালা ভেদ করিয়া জানালার মধ্য দিয়া চাঁদের কিরণ আসিয়া শয্যার উপর পড়িয়াছে। গৃহসংলগ্ন শস্যভরা শ্যামল-ক্ষেতের উপর চাঁদের আলো ঢেউ খেলিতেছে। কৌমুদী প্রফুল্ল প্রকৃতি হাসিতেছে গৃহ-সংলগ্ন বাগানের ফুলের গাছের ছোট ছোট শাখাগুলি আর ফুলগুলি বাতাসের কম্পনের সহিত নাচিয়া নাচিয়া বায়ু হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করিতেছে। তাদের ছায়ায় খেলা বিছানার উপর পড়িয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া নাচিয়া নাচিয়া আবদুল কাদের ও নুরনের মুখ চুম্বন করিতেছে নুরন বলিল—এমন সুন্দর দুনিয়া যাঁর—তিনি কেমন সুন্দর! আচ্ছা এখন একটা গজল গাও ত, তোমার মুখের গজল ভারি মিষ্টি লাগে ভাই।

আবদুল কাদের বলিলেন—আমার সোনার মুখের মধুর গজল শুনবে? শোন —ফরাকে জানামে হামনে ছাকি, লহু পিয়া হ্যায় সরাব করকে ফরাকে 'নুরন'কো 'কাদের' বেচারা জেগারকো ভোনা কাবাব করকে

নুরন বলিল—কেবল তোমার ঠাট্টা

আবদুল কাদের —ঠাট্টা নয় এর সাক্ষী আছে দার্জ্জিলিংএর নিঝুম নীরব পাহাড়। কিন্তু তোমাকে ভুলতে চেষ্টা করেছিলাম। যখন তোমার স্মৃতি,—স্মৃতিলোপ করে দিতে চাইত, আমি শিউরে উঠতাম—পাছে তোমার পবিত্র স্মৃতিতে দোষ ঘটে—খোদার কাছে গোনাগার হই।

নুরন।—তুমি আমায় ভুলতে চেও না, তোমার পায়ে পড়ি—এখন একটা গজল গাও। আবদুল কাদের গাহিল—

তামামে আলম মে হামনে দেখা ওছিকা জলুয়া চমক রহা হ্যায়,
এ ওছকি কোদরত কি হ্যায় তামাশা ছাদাফ্ মে গওহর
দমক রহা হ্যায়,

* * * *

গজল শেষ হইলে তার শেষ ধ্বনি শুনিতে শুনিতে তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িলেন।

পরিচ্ছেদ।

(২৯)

আবার দীর্ঘ দুই বৎসর হাসিতে খেলিতে কাটিয়া গেল (১) আবদুল কাদেরের চিন্তার কালিমা নুরন চুম্বনে মুছিয়া লইয়াছে। হাসিধারা স্বর্গের আলো আনিয়াছে

আজ দোতালার শয়নকক্ষে বসিয়া নুরন বলিল—আচ্ছা বলত আমরা দুনিয়ায় কেন এসেছি

আবদুল কাদের।—আচ্ছা বৃহৎ দর্শনশাস্ত্র নিয়ে এলে দেখছি! তবে আমার মত দার্শনিক পণ্ডিতের পক্ষে জবাব দেওয়াটা কঠিন হবে না, জেন আমি দুনিয়ায় এসেছি তোমার ঐ আলো-মাখা মুখ খানা দেখ্‌তে

নুরন কৃত্রিম ক্রোধের সহিত চাপা হাসি মিশাইয়া বলিল—তুমি বুড়ো হয়ে গেলে তবুও তোমার ছেলেম গেল না আবদুল কাদের বলিলেন—এই মুস্কিল করেছ! আবার এক দোষ বের হল দেখছি—আমি বুড়ো হয়েছি! সকল দোষের ওষুদ আছে এর ওষুদ জগতে কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি! যাক যদি বুড়ো হয়েই থাকি, তবে তোমার ঐ রূপ-লাবণ্য আর এ বুড়োর পায়ে বিক্রী কর কেন দেবী?

"তোমার মরণ হয় না?"

"মরণ হয় না, বৃদ্ধের মরণ আর কবর হতে নিকট-বন্ধু কে আছে

---

(১) A perfect woman nobly planned
To warn to comfort & command
—*Wordsworth.*

দয়াময়ী ? ২৭ বৎসর বয়স হল বয়সটা কম নয়—এর আগেও মরতে পারতাম মরিনি বোধ হয় সে তোমারই জন্য তোমার ওই পাদপদ্ম ছেড়ে কি যেতে ইচ্ছে হয় ? আচ্ছা বলত, ঐ দেখ মেঘ আর চাঁদ ওর কোন্‌টা তুমি ভালবাস ?"

চাঁদের আলো আজও তাঁহাদের উপর প্রসন্ন হইয়াছে আলোর সমুদ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘগুলি ভাসিয়া বেড়াইতেছে। চাঁদের আলোতে ছোট ছোট মেঘগুলি, কোনটা যেন বাঘের পাঁতি করার মত, কোনটা ভালুকের মত, কোনটা হাতীর এক পাও তুলিয়া দাঁড়ান'র মত, কোনটা গরুর মত, কোনটা পাহাড়ের মত, কোনটা ভেড়ার মত দেখা যাইতেছে।

সুরন বলিল—আমি ঐগুলো ভালবাসি

আবদুল কাদের আমি কিন্তু ভাই, চাঁদ ভালবাসি

সুরন অভিমান-স্বরে বলিল—তাত হবেই! রাত্রি দিন একঘেয়ে অন্ধকার,—আমি তোমায় ঘিরে বসে আছি কাজেই তুমি চাঁদ ভালবাস একঘেয়ে ত কিছু ভাল লাগে না।

কে জানে জগতে কোন মুহূর্ত্তে প্রকৃতি কি কাণ্ড ঘটায়। দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র মেঘগুলি জমাট বাঁধিয়া ভীষণ আকারে হতভাগা লোকের কপালের মত আকাশ ছাইয়া ফেলিল ক্রমে বায়ুর প্রবলবেগে, বৃষ্টিপাতে ও লোকের সহস্র কোলাহলে দুনিয়া কাঁপিতে লাগিল। গৃহ ও বৃক্ষ সকল ভূমিতে লুটাইতে লাগিল। যে কোন দিন ভুলিয়াও খোদার নাম লয় নাই সেও কতদিনের তাপসের মত ভাল মানুষটী হইয়া খোদার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক লোকের হাহাকার আর আর্ত্তনাদে, 'মলাম' "খোদা বাঁচাও" ইত্যাদি রবে ধ্বনিত হইতে লাগিল আবদুল কাদের একটা লণ্ঠন হাতে করিয়া বাহিরে আসিয়া বরকন্দাজদের ডাকিলেন। তাহারা দালানের মধ্যে পরস্পর চুপে চুপে

বলিতে লাগিল—চুপ কর, উত্তর দিও না লেপটা ভাল করে মুড়ি দে আগে নিজের জান বাঁচা ; তার পরে আর কথা।

আবদুল কাদের উত্তর না পাইয়া সমস্তই বুঝিলেন তাহাদিগকে আর কোন কথা না বলিয়া আলো হাতে একাকী গ্রামের মধ্যে গিয়া সমস্ত লোককে অতি কষ্টে বাড়ীতে আনিয়া স্থান দিতে লাগিলেন ভিজা কাপড় ছাড়াইয়া সকলকে শুষ্ক বস্ত্র পরিতে দিলেন বস্ত্র সব পরিতে দেওয়া শেষ হইয়াছে এমন সময় এক হিন্দু মুচি-কন্যা থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে হুরনের ঘরে উঠিয়া পড়িল হুরন বাক্স হইতে তাহার বিবাহকালীন বহুমূল্য শাড়ী আনিয়া মুচী-কন্যাকে পরিতে দিল

ক্রমে বাতাসের বেগ অনেক কমিয়া গেল। নদীর বুক থেকে ২৪ জন লোকের বিপদ-জড়িত কণ্ঠস্বর শ্রুত হইতে লাগিল। আবদুলকাদের বলিলেন—কান্নার স্বর বোধ হয় শুনতে পাচ্ছ হুরন, আমায় একটু গরম দুধ দাও একটু গরম দুধ পান করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি ঘাটে গিয়া ছোট একখানা নৌকায় আরোহণ করিলেন বায়ুর সহিত যুঝিতে যুঝিতে ক্রন্দনের দিকে অগ্রসর হইলেন খোদার অনুগ্রহে অতি সহজেই কয়টী লোককে নৌকায় উঠাইয়া বাড়ীতে ফিরিলেন। ইহারা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিল কৃত্রিম উপায়ে তাহাদের শ্বাস গ্রহণের পর জ্ঞান হইলে তাহাদের মধ্যে একজন কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—ওরে বাবা আমার রমা ত রক্ষে পায় নাই আমি একবার আমার বাবাকে দেখে আসি আমার একইমাত্র ছেলে বাবা।

"আমি দেখে আসছি তুমি পাগল, এই দুর্ব্বল শরীর লয়ে তুমি কিছুই করতে পারবে না বরং নিজের জানটা খোয়াবে। ওরে ছমির,

এদের যদি মোছলমানের দুধ খেতে আপত্তি না থাকে তবে একটু গরম দুধ খেতে দে, আমি আসি"—বলিয়া সুরনের নিকট গিয়া আবার একটু উষ্ণ দুধ পান করিয়া আবদুল কাদের নদীতে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। এবার সুরনের প্রাণে যেন ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের সাড়া আসিল সে ভদ্রঘরের কন্যা, পরদার কথা ভুলিয়া গিয়া বলিল—এবার তুমি থাক, আমি যাই, আর দেরী করা যায় না।

সুরন যুদ্ধগমনোন্মুখ তেজী অশ্বের ন্যায় প্রভুর আদেশের অপেক্ষায় ছট্‌ ফট্‌ করিতে লাগিল।

আবদুল কাদের বিস্ময়-বিস্ফারিত-লোচনে বলিলেন—তুমি কি পাগল হলে সুরন, তোমার কাজ বাহিরে নয়, তোমার কাজ পরদার মধ্যে। (১) তিনি বেগে বাহির হইয়া গেলেন। অন্ধকার ছিল বটে, বায়ুর বেগ তখন খুব প্রবল ছিল না। তাঁহার ক্ষুদ্র নৌকা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে বায়ুর বেগ আবার হঠাৎ প্রবল হইয়া উঠিল এবং নৌকা উল্টাইয়া দিল। আবদুল কাদের সাঁতরাইতে লাগিলেন। কতক্ষণ সাঁতরাইবার পর তাঁহার হস্তপদ অবশ হইয়া গেল তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

অনেক সময় অতিবাহিত হইল, আবদুল কাদের বাড়ী ফিরিলেন না। ঝড়ের বেগ আবার খুব বাড়িল নেমকহারাম চাকর সকলকে একে একে ডাকিয়া সুরন তাঁহার সন্ধান করিবার জন্য হুকুম দিল। যাচ্ছি বলিয়া তাহারা নিজ নিজ কুঠরীতে যাইয়া শুইয়া পড়িল। সুরনের প্রাণে দুর্ঘটনার তাড়িত-প্রবাহ সাড়া দিল সে ওজু করিয়া জায়-নামাজে বসিল। পশ্চিমাভিমুখে বসিয়া যখন সে হাত দুইখানি উপরের

(1) They should be encouraged to a high standard of duty while not forgetting that their true happiness will always lie within the home circle

—Davenport Adams

দিকে উঠাইল, তখন তাহার দেহ হইতে যেন অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল তাহার প্রাণের আবেদনের অব্যক্তধ্বনি যেন দিগদিগন্ত ভাসাইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কাঁপাইয়া সেই নির্বিকার নিরাকার একে সিংহাসনের দিকে ছুটিল।

বায়ুর বেগ ধীর হইতে ধীরতর হইয়া ক্রমে থামিয়া গেল অনেক অনুসন্ধান হইল, আবদুলকাদেরকে পাওয়া গেল না এ ঝড়ের পর নুরনের বুকে যে ঝড় বহিল—সকল ঝড়ের কর্ত্তা যিনি তিনি সে ঝড়ের বেগ কতদূর তা জানেন। দরবেশ সাহেব এ দিন বাড়ী ছিলেন না, তিনি পরদিন বাড়ী আসিয়া পাগলের মত ছুটিয়া বাহির হইলেন। একমাস অতীত হইলেও কোন সন্ধান মিলিল না

নুরন আবদুল কাদেরের নামীয় সমস্ত সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা করা সঙ্গত মনে করিল গ্রামবাসীর পতিত গৃহগুলি শীঘ্রই এই অর্থে উঠিয়া তাহাদের মাথা গুজিবার স্থান করিয়া দিল। আবদুলকাদেরের কবর জেয়ারতের পূর্ব্বেই যাহাতে গ্রামের মধ্যে জঙ্গল না থাকে, এবং 'আঁধারে' পুকুরগুলির যাহাতে উদ্ধার হয় তাহার ব্যবস্থা হইল। কয়েক গ্রামের মধ্যে বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য বৃহৎ বৃহৎ পুকুর খনিত হইল এবং বড় পুকুরের পাড়ে গ্রামের বিদ্যালয়টীর জন্য একটা পাকা ঘরও প্রস্তুত হইয়া প্রাথমিক শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিল। স্কুল ঘণ্টার শেষে নুরন ছাত্রগণকে ডাকিয়া একঘণ্টা করিয়া স্বাস্থ্যতত্ত্বের সাধারণ নিয়ম গুলি সাধ্যপক্ষে শিক্ষা দিতে লাগিল। দরবেশ সাহেব ফিরিয়া আসিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকতা লইলেন। বাড়ীর অদূরে ছোট বাজারের উপর একটা দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপিত হইল। প্রত্যেক শুক্রবারে আগন্তুককে ১সের করিয়া চাউল একখানি করিয়া ৪হাত কাপড় দিয়া অনেকের জঠর জ্বালা ও লজ্জা নিবারণ করিবার

ব্যবস্থা হইল সহরের এতিমখানায় মাসে ১০০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল সুরন একাদিক্রমে রোজা করিয়া এবং রাত্রি দিন কোরাণ পাঠ করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল সে নিদ্রার ক্রোড়ে যাইত কি না তাহা কেহ বলিতে পারে না।

এক মাসে তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল, এখন সে শয্যাশায়ী। শরীর এত দুর্ব্বল যে, দুধ পর্য্যন্ত পরিপাক করিবার ক্ষমতা এখন সুরনের নাই। বিছানার সহিত শরীর মিশিয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে নামজাদা দুই জন চিকিৎসক আনিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে বটে কিন্তু সুরন দ্রুত মরণের পথে অগ্রসর হইতেছে

পরিচ্ছেদ।

(৩০)

ছলিম সেখ কোথায় ?

মা, আজ আমাদের ঘরে বুঝি কিছুই খাবার নাই মা ?

ছলিম-স্ত্রী এক সের ভুরো ও যব রৌদ্রে নাড়িয়া দিয়া ঘর্ম্মাক্ত মুখ, ছিন্ন ও মলিন আঁচল দিয়া মুছিতে মুছিতে বলিল—কেন বাবা, খাবার নাই ত কি ? কালকের রাত্রি যে কয়টা ভাত বেঁচেছে, পানি দিয়ে রেখেছি, খাও। নাই বলো না বাবা, খোদা এ কয়টা ভাত ত তোমার জন্য এ ওক্তে রেখেছেন—এই শোকর, এই হাজার নেয়ামত।

"আমি ও কয়টা ভাত খেলে তুমি কি খাবে ?"

"আমার জন্য ভাবিস না বাবা, আমি মেয়েমানুষ. খোদার নাম ক'রে এক গ্লাস পানি খেলে দিনটা যাবে' এখন, তারপর ভুরো সের ভা'নে রাত্রে যাউ তৈয়ারী ক'রে দুই মায়ে পুতে খাব। আমাদের মত হতভাগার মুখের দিকে যাঁরা তাকায় তাঁরাই আগে দুনিয়া ছেড়ে চলে যায় বাবা। আর যারা রাতদিন গোনার মধ্যে ডুবে থাকে তাঁরাই দুনিয়ায় বড় লোক, তাঁরাই দীর্ঘজীবি। তোমার বাপ চিরকাল খোদা-তালাকে আঁকড়ে ধ'রে কবরের পথ দিয়ে খোদার আলোর দিকে চলে গিয়েছেন—চিরদিন, অভাব আর দুঃখ তাঁকে কখনও ছাড়ে নাই। শুনেছি বাবা, হাদিছ-শরিফে আছে—গরীব লোক বড় লোক চেয়ে অনেক হাজার বছর আগে বেহেস্তে যাবে। তা'হলে দুনিয়ার অভাব আর

দুঃখটা মন্দ কি বাবা ? (১) বড়লোককে দুনিয়াতে অনেক প্রলোভনের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে হয়। আর বাবা, দুঃখ না পেলে যে খোদার দিকে মুখ ফেরে না। অভাব বিপদ না হ'লে যে, খোদার দয়া হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে লয় না। পূর্ণ দুঃখের মধ্যেই ত বাবা, তাঁকে পাওয়া যায়,—তাঁর গফুররহিম নামের পূর্ণ বিকাশ হয় যে বাবা, যখন আমাদের চোখের পানিতে বুক ভাসে। বৃষ্টি নামতে থাকলে পথিক অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাহারও দুয়ারে এসে থামে—তেমনি আমাদের চোখের জল যখন বৃষ্টির মত নামে তখন সে দুয়ারে এসে দেখা দেয়। শুধু সুখের মধ্যে,—ধীরগামী বাতাস যখন আনন্দ বিলিয়ে বয়ে যায়, শুধু তারই মধ্যে যে খোদাকে চায়—সে পাগল,—ভয়ানক ঝড়ের মধ্যে, বজ্রপাতের মধ্যে যে তাঁর দয়ার খেলা দেখতে চায়—সেই মানুষ (২) বাবা, অভাবে অস্থির হসনে।

"তাই মা, অভাব থেকে বাঁচতে আর চিরকাল পরের সাহায্য চেতে যাব না, মাঠে গিয়ে দেখি ধান কাটতে পাই কি না, কাস্তে খানা দেত।"

"তুই ছেলে মানুষ, তুই কি ধান কাটতে পারবি ?"

"যাইত মা, খোদা ব'লে,—যা' পারি সেই ভাল।"

---

(১) দুনিয়ার ধন সামান্য। যে ব্যক্তি সৎভাবে চলে পরকাল তাহার জন্য উত্তম—কোরাণ—ছুরানেছা—১১ রুকু।

নিশ্চয় দুঃখের সহিত সুখ আছে—কোরাণ—ছুরা ইনশারাহ—একাংশ, ভাবার্থ।

Adversity is not without comfort and hope.

—Lord Bacon.

(২) Sweet are the uses of adversity, which like the toad, ugly and venomous, wears yet a precious jewel on his head

—Shakespare.

ছলিম-স্ত্রী পানি দেওয়া ভাত কয়টা একটা কাঁসার থালাতে করিয়া আর উঠানের গাছ থেকে একটা কাঁচা মরিচ আনিয়া পুত্রের সম্মুখে দিল পুত্র ভাত কয়টি ভাগ করিয়া অর্দ্ধেক, মাতার জন্য একটা বাটিতে উঠাইয়া বক্রী সামান্য কয়টী ভাত তৃপ্তি সহকারে আহার করিয়া মাথালটা মাথায় দিয়া কাস্তে খানা হাতে করিয়া মাঠে বাহির হইয়া গেল।

পরিচ্ছেদ।

(৩১)

দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে। নুরন কবরের পাড়িতে আসিয়া পৌছিয়াছে এখন তাহার জীবনের কোন আশা নাই। সে স্থির করিল তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে আবদুলকাদেরের 'ফাতেহা' সম্পন্ন করিয়া যায়। সে অনুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থাই হইল। আগামী পরশ্ব কবর জেয়ারতের দিন। দুই সহস্র মুদ্রা ব্যয় করা হইবে বিশেষ করিয়া অনাথ ভিক্ষুকগণকে আহার করান হইবে ও কাপড় দেওয়া হইবে

অন্ত রাত্রি নুরনের শরীর অধিকতর অস্থির। সে শুইয়া শুইয়া কোরাণের আয়াত পড়িয়া আবদুলকাদেরের উদ্দেশ্যে বখ্‌শিয়া দিতে লাগিল

সন্ধ্যার পর আজ আবার জানালার মধ্য দিয়া আসিয়া চাঁদের হাসি নুরনের বিছানার উপর ঢেউ খেলিতেছে আজ আবার সে দিনকার মত বায়ু-হিল্লোল গাছের পাতা কাঁপাইয়া, ফুলের গাছ দোলাইয়া শয্যার উপর গা ঢালিয়া দিতেছে। তেমন করিয়াই গহনে গহনে বৃক্ষে বৃক্ষে তীরে তীরে, আকাশে আকাশে কুসুমে কুসুমে, তারায় তারায় বাতাস খেলিয়া বেড়াইতেছে। আজ তেমন করিয়াই চাঁদের হাসি ফুলে ফুলে, বুকে বুকে হাসিতেছে। তেমন করিয়াই মাঠের উপর দিয়া কৃষকদিগের গানের সুর, মাঠের আকাশ বাতাস ধ্বনিত করিয়া ভাসিয়া আসিতেছে পল্লী-বালকদের বাঁশীর সুর দিগন্তে মিশিতেছে। কিন্তু *খোদার এই অযাচিত-বিলিয়ে-দেওয়া-নেয়ামত আজ নুরনের হৃদয়ে বাগান-বাড়ীর সেই রাত্রের কথা বড়ই তীব্রভাবে আনিয়া দিল।

সুরন জমিলার কোলের উপর মাংসশূন্য হাতখানি রাখিয়া উদাস দৃষ্টিতে চাঁদের দিকে চাহিয়া পারের দেশের চিন্তা করিতে লাগিল

জমিলা সুরনের চক্ষের পানি আস্তে আস্তে মুছাইয়া দিয়া বলিল—বুবু, অস্থির হ মনে, খোদা তোকে ভালবাসেন তাই তোকে নিয়ে যাচ্ছেন আর আমি কি হতভাগিনী, আমার মুখের দিকে আর কে চাইবে? যাক্ খোদার ইচ্ছা পূর্ণ হউক সুরন শীর্ণ হস্তখানি ধীরে ধীরে জমিলার মুখের উপর দিয়া বলিল—জমিলা এ দুর্দ্দিনে তুই না থাকলে—এর অনেক পূর্ব্বে বোধ হয় জীবন-প্রদীপ নিভে যেত। তোর প্রাণ-ভরা শুশ্রূষার বলেই বোধ হয় এতদিন বেঁচে আছি তুই দিবা রাত্রি অনিদ্রায় অনাহারে থেকে আমার শিয়রে বসে কাটিয়ে দিচ্ছিস আমার গলা শুকিয়ে আসছে, আমায় একটু পানি দে জমিলা!

জমিলা একটু পানি দিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—বুবু, দুনিয়ার এই প্রবল ঝড়ের মধ্যে যে গাছটা ধরে ছিলাম—তা' ভেঙ্গে যেতে লাগল এখন আমার উপায় কি হবে?

"খোদা আছেন" বলিয়া ধীরে ধীরে জমিলার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া সুরন পাশ ফিরিয়া শুইল।

জমিলা আবার বলিতে লাগিল - বুবু, দুলাভাই মরেছেন, তাঁর মৃত্যুতেই সুখ মৃত্যু কালে তিনি ঘোর অন্ধকার দেখে আঁৎকে উঠেন নাই। এ দুনিয়ার ও দিক থেকে আশার কিরণ তাঁকে পথ দেখিয়ে লয়ে গেছে স্বার্থের তাড়নায় যারা সত্য ভুলে যায়, আত্মীয় ভুলে যায়, ইস্লামকে ভুলে যায়—স্বার্থের পায়ে লুটিয়ে, অবিচার, অন্যায়ের মধ্যে ডুবে যায়, জগৎ কি ব'লবে, আত্মীয় কি ব'লবে, বন্ধু কি ব'লবে, বিবেক কি ব'লবে, যারা দেখে না তারাই মরণ দেখে ভয় পায় কিন্তু যিনি দারিদ্র্যে, দুর্যোগে বিপদে কখনই খোদার রহমতকে অস্বীকার করেন নাই, অন্যায়ের

বিরুদ্ধে অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে যিনি জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছেন, ইসলামের পথের বিপদকে আনন্দ জ্ঞানে আলিঙ্গন ক'রে আলোকের পথে চ'লে গিয়েছেন তিনি দুনিয়ার কোন শাসনকেই ইসলামের শাসন চেয়ে বড় ব'লে গ্রাহ্য করেন নাই—তাঁর মরণেও সুখ —কি বুবু, তুই অমন করছিস কেন? খোদার নাম কর

নুরন ধীরে ধীরে বলিল,—জমিল, আর বেশী দেরী নাই, আজই বুঝি আমার শেষ দিন। পারের দেশে কি তাঁকে পাওয়া যায়? যাক্ তুই কোরান-শরিফের ছুরা-এয়াছিন পড়।

উঠানে কে ডাকিল—"নুরন", জমিলা চমকিয়া উঠিল প্রথমে সে ঠাহর করিতে পারিল না এ কার কণ্ঠস্বর আবদুল কাদের ধীরে ধীরে সিঁড়ি বহিয়া উপরে নুরনের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন

"কেও তুমি"—বলিয়াই নুরন চেতনা হারাইল।

আবদুল কাদের নুরনকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন —হে খোদা, আমি কি এই দেখ্‌বার জন্য বেঁচে এলাম! নুরন, আমার প্রাণের নুরন, কথা বল—এই দেখ, তোমার আবদুল কাদের মরণের পর-দেশ থেকে বেঁচে—তোমার কাছে ছুটে এসেছে! খোদা, গফুরর-রহিম, আমাকে যদি তুমি মৃত্যু থেকে ফিরিয়ে আনলে তবে আমার নুরনকে আমার বুকে ফিরিয়ে দাও। আমার শোক সামলাতে না পেরেই আজ আমার নুরন কবরে যাচ্ছে নুরন, আমি তোমার রূপ কতকটা দেখেছিলাম, আজ সম্পূর্ণ দেখলাম—তুমি আমার কে

নুরন অনেকক্ষণ পর চক্ষু মেলিল। আবদুলকাদেরের দিকে চাহিয়া বলিল, কে—তুমি?—এসেছ, এস ভাই, আমার বুকে এস, কবরের বুকে শোবার পূর্ব্বে একবার তোমাকে বুকে করে যাই, আর কিছুদিন আগে আসতে পারলে বোধ হয় বাঁচতাম। কি করবে,

তোমার ত দোষ নাই,—যাক্ তুমি যে বেঁচে আছ, এই শান্তি ল'য়ে তোমার কোলে মাথা রেখে যেতে পারব। জীবনের শেষ সময়ে আমার অনুরোধ—জামলাকে তুমি বিয়ে ক'রো

আবদুলকাদের বালকের মত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—নুরন্, ভুগ্নি—এয়া খোদা, তুমি কি নুরনকে বাঁচাতে পার ন? তুমি কত অসম্ভবকে সম্ভব করেছ হজরত এব্রাহিমকে ভীষণ আগুনের মধ্য হ'তে রক্ষা করেছিলে হজরত ইউনসকে মাছের পেটে জীবিত রেখেছিলে, আজ আমার নুরনকে কি তুমি বাঁচাতে পার না?

আবদুলকাদেরের এ নিবেদন, তাহার প্রাণের ভাষ—খোদার দরগায় পৌছিল। নুরন আজ বেশ সুস্থবোধ করিতে লাগিল এবং ক্রমে আরোগ্যের পথে দাঁড়াইল সে যে কোন্ অজ্ঞাত ঔষধে নিরাময় হইতে লাগিল—তাহ সকল ঔষধের সৃষ্টিকর্তা—সেই সব চেয়ে বড় ডাক্তার জানেন

নুরন একটু সুস্থ হইলে পরদিন সন্ধ্যার পর, সকলে জিজ্ঞাসা করিলে আবদুল কাদের আহার করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"আমি সে দিন নৌকায় চ'ড়ে সেই লোকটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি—ভাল কথা সে লোকটা বেঁচেছে?"

"হুঁ সে সাঁতরিয়ে সাঁতরিয়ে পাড়ি ধরে বেঁচেছে"

"শুনে সুখী হ'লাম যে, খোদা ওদের বাঁচিয়েছেন,—তার পর হঠাৎ একটা ঝাপটা এসে নৌকা উল্টে দিল; আমি পানির মধ্যে প'ড়ে চীৎকার কর্‌তে লাগলাম। কারও উত্তর পেলাম না, কিন্তু নুরন, তোমার একটা ওআব যেন কানে ধ্বনিত হতে লাগল কতকক্ষণ সাঁতরাতে সাঁতরাতে যখন অজ্ঞান হব হব—এমন সময় একটা কাঠ হাতের কাছে ঠেলে দিয়ে তুমি যেন চীৎকার করে বললে—"কাঠখানা ধর।" গাছে

থেকে পড়ার সময় লোক শূন্যকেও যেমন আঁকড়ে ধরতে চায়, আমিও তেমন বিশ্বাস করে হাত বাড়িয়ে কাঠখানা পেলাম বটে কিন্তু কিয়ৎ-ক্ষণ পরই অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়লাম। যখন জ্ঞান হল, তখন দেখি আমি ষ্টীমারের উপর। ঢেউয়ের সঙ্গে স্রোতের টানে আমি অনেক দূর ভেসে গেছে—প্রত্যুষে অজ্ঞান অবস্থায় দেখে—জাহাজের এক খালাসী আমাকে তুলে লয়ে—ক্রমে আসাম লয়ে যায় এবং সেখানে প্রাণ-পণে আমার চিকিৎসা করে আমি খোদার মরজী আরাম হতে লাগলাম, কিন্তু খালাসী বেচারার এক বিপদ্ উপস্থিত হ'ল। দুই মাসের মধ্যে আমার চিন্তাশক্তি ফিরল না দেখে, সে আমার শুশ্রূষা করার জন্য সাহেবের কাছে ছুটী চাইল সাহেবের মন যদিও ভিজল,—কিন্তু ভারতের আপিসের অধিকাংশ বড়বাবু যেরূপ হয়—সে কসাই কিছুতেই ছুটী দিল না সে চাকরীর তোয়াক্কা ছেড়ে আমায় আগলে বসে থা'কল। বড়বাবু তাকে বরখাস্ত করলেন। আমি আরাম হলে—সে ঘটী বাটী বাঁধা রেখে আমার গাড়ীর ভাড়া দিল। আমার দুর্ব্বল শরীর বলে—সে আমাকে একা ছেড়ে দিল না, সেও আমার সঙ্গে এসে গোয়ালন্দ পৌছিয়ে দিয়ে ফিরে গেছে

হুরন শুনিতে শুনিতে চক্ষু মুছিতেছিল জমিলা বলিল—দুলা ভাই,—বুবুর ঐ চোখের পানির মূল্য আজ বুঝতে পারছি। নামাজান্তে জায়-নামাজে বসা অবস্থায় বুবুর চোখের পানির সঙ্গে তার যে মূর্ত্তি মাঝে মাঝে দেখেছি আর মরণের পথে দাঁড়িয়ে ও যা' ক'রেছে—তা' আমার চোখের উপর ভাসছে

"তা বুঝেছি জমিলা, তা' না হ'লে ঐ ওদেশ থেকে কয়জন আমার মত এদেশে ফিরে আসতে পারে? আমি যখন অজ্ঞান হলাম, জানি না সে স্বপ্ন কি সত্য, তখন কোথায় কোন্ দেশে এগিয়ে যেতে লাগলাম,

সে দেশের আকাশ বাতাস, গহন কানন নদী, লতা পাত কি যেন এক আলোক দিয়ে মাখান বাতাস ফুলের হাসি, কোরানের সুর ও বিরাট শান্তি বহন করে বয়ে যাচ্ছে। সে সুর থেমে গেলে দেখি ষ্টীমারের কোলাহল

আহারান্তে সকলেই স্ব স্ব গৃহে নিদ্রা গেলেন শেষ রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে আবদুল কাদের বলিলেন—সুরন, তুমি মরণের পথে দাঁড়িয়েও দেখছি কিছু ক'রেছ প্রাথমিক শিক্ষা, দেশের স্বাস্থ্য এবং এতিম গরীবদের জন্য যা করেছ এ দেখে আমার মনে আনন্দ ধরছে না। ভাল কথা, বাড়ীতে যে সব আয়োজন দেখছি এ বুঝি আমার কবর জেয়ারতের? যাক্, আর একবার ম'রতে পারলে আমার মত গরীব বেচারারা দুই এক ওয়াক্ত পেট ভরে খেতে পাবে খোদ য' করেন ভালই করেন

সুরন বাধা দিয়া বলিল- তোমার আর ম'রে কাজ নাই, তুমি এই আয়োজন দিয়ে জমিলাকে বিয়ে কর আহা! জমিলা দিবা রাত্রি আমার শিয়রে ব'সে কাটিয়েছে তোমাকে হারান'র পর জমিলাকে বুকে ক'রে যখন কাঁদতাম আমার মনটা যেন অনেক পাতলা বোধ হ'ত। আর তোমার জন্য ও, খোদাকে কতই ডেকেছে। ওর দেহটাও যেমন সুন্দর, খোদা ওর মনটা তার থেকেও সুন্দর করেছেন ওর ঐ ভালবাসা-ভরা হৃদয়টা কোন্ অজানা অচেনা পাষণ্ডের হাতে প'ড়ে আবার পুড়ে খাক হবে। ওর যৌবনের এই ক্ষুধিত ভালবাসা আশ্রয় না পেয়ে মাথা কুটে কুটে মরছে কিন্তু আমি ওকে কাছছাড়া করতে পারব না

আবদুল কাদের হাসিতে হাসিতে বলিলেন—তুমি পাগলের মত বল কি সুরন!

"কেন, তুমি কি জমিলাকে বিয়ে করতে পার না? এ বিয়েতে লতিফনকে, তার স্বামীর শুশ্রূষা করার লোক রেখে, দুই একদিনের

জন্ম নয়ে আসব রফিক মিঞা ও রমেশ বাবুকে আসবার জন্য চিঠি লিখে দাও খালাসীকে দুই হাজার টাকা পাঠিয়ে দিখে দাও সে যদি একবার দয়া ক'রে আসতে পারে "

বলিতে বলিতে তাঁহারা আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন কতক্ষণ পর ফজরের নামাজ পড়িবার জন্য উঠিলে দেখিতে পাইলেন—আবদুল কাদেরের বিমাতা জোবেদা খাতুন, তাঁহার পুত্রগণসহ উঠানে দাঁড়াইয়া আছেন।

নুরন, জমিলা ও আবদুল কাদের তাঁহার পদধুলি লইয়া বলিলেন—মা, আপনি এসেছেন, আমাদের বড় সৌভাগ্য

নুরন বলিল মা এ বাড়ী আপনারই আমরা আপনার সন্তান, আপনি দেখে শুনে আমাদের চালান

জোবেদা-খাতুন পূর্ব্ব ব্যবহার মনে করিয়া লজ্জা ও কৃতজ্ঞতায় কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন

অবস্থা-বিপর্য্যয়ে জোবেদা-খাতুন তাঁহার পুত্র কয়টী লইয়া অতি কষ্টে দিন কাটাইতেছিলেন নুরন ও আবদুলকাদের এ সংবাদ পাইয়াছিলেন কয়মাস পূর্ব্বে আবদুলকাদের একবার তাঁহাদিগকে আনিতে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা আসেন নাই

এখন সংসার আর চলে না অনন্যোপায় হইয়া আজ তাঁহারা আসিয়াছেন।

জোবেদা খাতুন বলিলেন—মা, আমি একা আসি নাই কয়টী গলগ্রহ পুত্রসহ এসেছি

নুরন জোবেদা খাতুনকে গৃহে উঠাইয়া লইয়া বলিল—মা, ও কয়টী আমার ভাই, আমি দেখে শুনে ওদের মানুষ ক'রব, সেজন্য আপনার চিন্তা নাই

আবদুলকাদের বৈমাত্রিক ছোট ভাই কয়টীকে কোলে লইয়া মুখ-চুম্বন করিতে করিতে বলিলেন—মা, এরা আর আমি কি আপনার দুই ?

আনন্দের ঢেউয়ের উপর দিয়া এর পর দীর্ঘ সাত বৎসর চলিয়া গেল। তাঁহাদের সুখ দুঃখ-মহিমান্বিত জীবন শান্তির মধ্য দিয়া বহিয়া চলিল

প্রত্যেক বৎসরের ন্যায় এবার শবেবরাৎ উপলক্ষে এক হাজার গরীব ভিক্ষুককে আহার করাইতে পরিশ্রান্ত হওয়ায় এবং তাঁহার নিজের হাসপাতালে কয়েকজন কলেরা রোগিণীকে অনবরত কয়রাত্রি শুশ্রূষা করার পর সুরনের শরীর হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িল সে পীড়িত হইয়া ক্রমে অন্তিম শয্যায় শায়িত হইল

আজ রাত্রে আবদুল কাদের ও জমিলা সুরনের দুই পার্শ্বে এবং লতিফন আড়ালে উপবিষ্ট লতিফন সুরনকে দেখিতে আসিয়াছে সুরন আবদুল কাদের ও জমিলার ক্রোড়ের উপর দুই হস্ত রাখিয়া বলিল —জমিলা, আমার আর তোর বুকের রত্ন আজ তোর বুকে দিয়ে যাচ্ছি, বুকে করে রাখিস আবদুল কাদেরের দিকে চাহিয়া বলিল—আমি অভাবে তোমার কোন কষ্ট হবে না জমিলার প্রাণ-ভরা ভালবাসা আর যত্ন আমার অপেক্ষা কম নয় আর আমার যখন ডাক এসেছে তখন যেতেই হবে—লায় এলাহা ইল্লাল্লা মহম্মদর রছুলোল্লাহ

জমিলার গর্ভজাত আবদুল কাদেরের পুত্রটীকে কোলের পার্শ্বে রাখিয়া তাহার মুখে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—যাক, খোদা আমার উদরে সন্তান দেন নাই, আমার ভিটায় বাতি দিবার জন্য তোকে পাঠিয়েছেন। আজ আমার কি সুখের দিন—তোমাদের কোলে মাথা রেখে, তোমাদের চোখের পানির নীচে এ জীবনের শেষ নিশ্বাস ফেলব আরও আমার একটা আনন্দ হচ্চে,—আমি বর্ত্তমানে এই সংসারে তোমাদের একটা সঙ্কোচভাব আমি অনেক সময় লক্ষ্য ক'রেছি অনেক চেষ্টা

করেও আমি তা' দূর করতে পারি নাই—আজ সে ভাবটি সরে যাবে আমার মনে হয় তোমরা এখন অধিক সুখী হবে। আমার জন্য দুঃখ ক'রবার কিছু নাই। এ চিরসত্য মতবাদের দেশে একদিন সকলের সম্মুখেই আসবে। এ দীর্ঘ কয় বৎসর খোদা তোমাদের সঙ্গে প্রকৃত আনন্দ ভোগ করতে দিয়েছেন।

পূর্ব আকাশের পথে ঊষার আলোক এখনও ফুটিয়া উঠে নাই। আকাশের গায় শাদা শাদা রেখ লইয়া ছোবেহ ছাদেক (১) এক স্বপ্নময় রাজ্য সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। কি এক নীরব বাঁশী এমন সময়ে খোদার রহমতের সুর দিকে দিকে ছড়াইয়া দিতেছে। আশা ও আনন্দের বারতা মাথায় ধীর বাতাস বহিতেছে। বেহেস্তের দুয়ার ভেদ করিয়া যেন আকাশের পাড়িতে ধাক্কা খাইয়া, ছিটকাইতে ছিটকাইতে শান্তির ঢেউ, সকল পথ আলোকিত করিয়া, শান্তির দেশ হইতে জগৎময় নামিয়া আসিতেছে।

সুরন ধীরে ধীরে বলিল—আমার জীবনের নির্ধারিত সময় শেষ ক'রে আমি আগে যাই। তোমরা কয়দিন পরে এস। কয়দিন পরেই চির-শান্তির দেশে দেখা হবে।

লতিফন বলিল—সুরন, তোমরা এমনি দেশের পথ ধ'রে চলেছিলে—তাই তুমি এত সুখে চ'লে যাচ্ছ। আমি এমন ক'রে এ আঁধারে আর কত দিন প'ড়ে থা'কব?

সুরন বলিল—লতিফন, বড় নদীর পানি, স্রোতের সঙ্গে গা মিশায়ে, ভীষণ ঢেউ, কঠিন দাঁড়ের আঘাত সহ্য ক'রে সাগরের দিকে অগ্রসর হয়। আবার যখন সে ঢেউ সে আঘাত সরে যায় তখন তার শান্ত

(১) প্রভাতের প্রকাশ

বক্ষে স্নিগ্ধ বাতাস বইতে থাকে, তা'র মধ্যে চাঁদের কিরণ খেলা করে, মাঝিরা নৌকার উপর সুমধুর গান ধরে আর যে পানি স্রোতও ঢেউ হতে দূরে যেয়ে কোনও ডোবার মধ্যে প্রবেশ করে, ত'সব আঘাত সব ঢেউ হতে কিছুকাল নিরাপদ হয়, তার উপর নানারূপ জলজ ফুলের মুকুট শোভা পায় বটে কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই নানা অগাছায় তার হৃদয় ঘিরে লয়, সে পানি অস্পৃশ্য হয়ে উঠে ফলতঃ, এই সুখ দুঃখময় বিশৃঙ্খল জগৎ এক বিরাট্ শৃঙ্খলার মধ্য দিয় চল্‌ছে আর সেই সুখ, দুঃখের সঙ্গেই জগতের সমস্ত জীব ক্রমে সেই খোদার আলোর দিকে অগ্রসর হচ্চে তুমি সে ঢেউ হতে দূরে যেয়ে অন্যায় করে ফেলেছ যা' হোক এখন সব অবস্থায় তাঁর উপর নির্ভর ক'রে— সে স্রোতের সঙ্গে খোদার শান্তিময় আলোর দিকে অগ্রসর হতে থাক —সে আলোকের পথ সুখের ও সহজ হবে

সমাপ্ত

নদীয়ার উদীয়মান সাহিত্যিক ও দার্শনিক

মৌলভী কে, এম, আজাহারুল ইসলাম

সাহেব প্রণীত

"আলোকের পথে।"

(উপন্যাস)

সুখে দুঃখে প্রাণে এক অপরূপ ভাবের ঢেউ বহাইয়া দেয়। বইখানি, একাধারে উপন্যাস, সমাজ চিত্র, এসলামের বিশেষত্ব মানব জীবনের সুখ দুঃখের উজ্জ্বল চিত্র ভাষার সৌন্দর্য্য, ভাবের গাম্ভীর্য্য লেখকের প্রতিভার সাক্ষ্য দিতেছে এমন সুন্দর, এমন নূতন ভাবপূর্ণ বই সাহিত্য জগতে বিরল পাপ তাপ ক্লিষ্ট নিরাশ হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ মাখাইয়া দেয় দুনিয়াটাকে যদি ভাল করিয়া দেখিতে চান, মানুষের মন যে কত বড় শক্তির আধার তাহা জানিতে চান—তবে, সাহিত্যের গৌরব আজহার মিঞার "আলোকের পথে" পাঠ করুন। মূল্য ১৷০

মখদুমী লাইব্রেরী দ্বারা প্রকাশিত ৫নং কলেজস্কোয়ার কলিকাতা

এবং

গ্রন্থকারের নিকট পোঃ কুমারখালী, বানিয়াকান্দী (নদীয়া) ঠিকানায় পাওয়া যায়।

উক্ত মৌলভী কে, এম, আজাহারুল ইসলাম

প্রণীত সাহিত্য জগতের অপূর্ব্ব বই—

"হিমালয় বক্ষে"

যন্ত্রস্থ।

[illegible]

উপন্যাস।

	পুস্তকের নাম	গ্রন্থকারের নাম	মূল্য
[illegible]	[illegible]	[illegible] হোসেন	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	১
৩	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৪	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৫	পারের পথে	[illegible]	[illegible]
৬	[illegible]	[illegible]	১
৭	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৮	[illegible] কুটীর	[illegible]	[illegible]
৯	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১০	[illegible]	[illegible]	২
১১	[illegible]	[illegible]	১০
১২	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৩	[illegible]	সৈয়দ [illegible]	[illegible]
১৪	আমার [illegible]	[illegible] হোসেন	২
১৫	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৬	[illegible]	সাহাদৎ হোসেন	২
১৭	[illegible]	[illegible] চৌধুরী	
১৮	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৯	বঙ্গের জমিদার	[illegible] চৌধুরী	২
২০	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২১	[illegible]	শেখ [illegible]	[illegible]

স্ত্রী পাঠ্য উপন্যাস

২২	[illegible]	মৌলবী মোহাম্মদ [illegible]	[illegible]
২৩	সৈয়দ সাহেব	[illegible]	[illegible]
২৪	[illegible]	শেখ মো: [illegible]	[illegible]
২৫	[illegible]	খোন্দকার [illegible]	[illegible]
২৬	প্রেমের সমাধি	মোহাম্মদ [illegible]	১০
২৭	[illegible]	[illegible]	১০
২৮	সাধনার জয়	[illegible] চৌধুরী	[illegible]
২৯	[illegible]	শেখ মো: [illegible]	[illegible]
৩০	[illegible]	শেখ [illegible]	[illegible]

মখদুমী লাইব্রেরীর প্রকাশিত কয়েক খানি অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক।

নং	পুস্তকের নাম	গ্রন্থকারের নাম	মূল্য
৩১	ঘরের লক্ষ্মী	মৌলবী সাহাদৎ হোসেন	১৲
৩২	হজরৎ ফাতেমা	,, আহম্মদ উল্লা	১৲
৩৩	খেয়া তরী	, সাহাদৎ হোসেন	১৲
৩৪	বালিকা জীবন	,, সাহাদৎ হোসেন	০
৩৫।	দেবী রাবিয়া	রাহাতুন্নেসা খাতুন	৸০

কাব্য

নং	পুস্তকের নাম	গ্রন্থকারের নাম	মূল্য
৩৬	*কোহিনুর কাব্য	মৌলবী শেখ হবিবর রহমান	১৷০
৩৭	স্পেন বিজয় কাব্য	,, সৈয়দ সিরাজী	৸০
৩৮	*মহরম চিত্র কাব্য	, ফজলুর রহিম চৌধুরি এম এ	৸০
৩৯	*পারিজাত	, শেখ হবিবর রহমান	৷০
৪০	*সোহরাব্ রোস্তম কাব্য	, ফজলুর রহিম চৌধুরি এম,এ	৸০
৪১	*বাঁশরী কাব্য	,, শেখ হবিবর রহমান	১৲
৪২	প্রেমাঞ্জলী কাব্য	, সৈয়দ সিরাজী	১ ০
৪৩	*আবে হায়াৎ	, শেখ হবিবর রহমান	০
৪৪	মোসলেম বীরত্ব	, মীর মশাররফ হোসেন	৸০

শিশু পাঠ্য ও প্রাইজ পুস্তক।

নং	পুস্তকের নাম	গ্রন্থকারের নাম	মূল্য
৪৫।	*বিষাদ সিন্ধু	মৌলবী মীর মশাররফ হোসেন	২৲
৪৬	*গাজী	শেখ আবদুল জব্বার	১৲
৪৭।	*ছেলেদের গল্প	, সাহাদৎ হোসেন	০
৪৮।	*শাহনামা	মোজাম্মেল হক্	১৸০
৪৯	*পয়গম্বর কাহিনী	, ফজলুর রহিম চৌধুরী এম এ,	১।০
৫০	*পরীর কাহিনী	,, শেখ হবিবর রহমান	৸০
৫১	*ছেলেদের হজরত মোহাম্মদ	সফিউদ্দীন আহম্মদ	৴০
৫২	*ভারত সম্রাট বাবর	, শেখ হবিবর রহমান	৴০
৫৩	*পুণ্য কাহিনী	, সফিউদ্দীন আহম্মদ	৴০
৫৪।	*ডন্ কুইক্ সোট্	,, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী	৴০
৫৫।	*হাসির গল্প	শেখ হবিবর রহমান	০
৫৬	*মোতির মালা	,, সফিউদ্দীন আহম্মদ	৴০
৫৭	*সিন্দবাদ হিন্দবাদ	,, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী	৴০
৫৮	*বৃহৎ হীরক খনি	,, মীর মসাররফ হোসেন	৴০
৫৯।	*শিশুর মজলিস	,, সফিউদ্দীন আহম্মদ	৴০

মখদুমী লাইব্রেরী, ৫ এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা   বৃহৎ তালিকার জন্য পত্র লিখুন

*পুস্তকগুলি গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত (কলিকাতা গেজেট ২৩ ৮-২২)

মখদুমী লাইব্রেরীর প্রকাশিত কয়েক খানি অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক।

পুস্তকের নাম		গ্রন্থকারের নাম	মূল্য
৬০	*নিয়ামত	মৌলবী শেখ হবিবর রহমান	১৲
৬১।	টাকার কল	,, মফিউদ্দীন আহম্মদ	৹
৬২	চিন্তার ফুল	,, আবদুর রসীদ সিদ্দিকী	৹
৬৩	*এসলামের জয়	,, মীর মশাররফ হোসেন	১৷৹
৬৪	*চেতনা	,, শেখ হবিবর রহমান	৹
৬৫	গজল গীতি	,, মফিউদ্দীন আহম্মদ	৹
৬৬	বাঙ্গালা মৌলুদ সরিফ	,, মীর মশাররফ হোসেন	১৲
৬৭	*নামাজ শিক্ষা	,, শেখ আব্দুর রহিম	./০
৬	বাব কাশেম	,, আবদুল হামিদ	৵০
৬৯	নামাজ তত্ত্ব	,, শেখ আব্দুর রহিম	১৲
৭০।	গোলে বাকাওয়ালী	,, গোলাম রসুল	৵০
৭১	আউলিয়া কাহিনী	,, খোন্দকার খলিলর রহমান	১৲
৭২।	* আঙুর" (ছেলে মেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্র ১৩২৭ সালের ১২ সংখ্যা একত্রে বাঁধান)		১৷০

স্কুল পাঠ্য পুস্তক।

৭৩	*শিক্ষা ও নীতি ১ম ভাগ	মোহাম্মদ মোবারক আলী	৵০
৭৪।	*শিক্ষা ও নীতি ২য় ভাগ	ঐ	৶০
৭৫	*শিক্ষা ও নীতি ৩য় ভাগ	ঐ	।০
৭৬	সরল রচনা	ঐ	৵০
৭৭	সচিত্র বর্ণ পাঠ	ঐ	✓১০
৭৮।	সরল ধারাপাত	ঐ	./০
৭৯।	মক্তব শিক্ষা ১ম ভাগ	ঐ	৶০
৮০	মক্তব শিক্ষা ২য় ভাগ	ঐ	৹
৮১।	মক্তব শিক্ষা ৩য় ভাগ	ঐ	./০
৮২।	First Book (প্রথম শিক্ষার্থীর জন্য)	ঐ	✓১০
৮৩।	Childrens Grammar	ঐ	./০
৮৪	*Elementary Genera Geog aphy.	বগলা রঞ্জন দাস	৶০
৮৫।	Gem Read:	মৌলবী মো. মোহসেন ইমাম বি এ	৹
৮৬।	Ang o Arab c Word Boo.	ফজলুর রহিম চৌধুরী এম এ	।০
৮৭।	*Model Pers an Word Book	মোহাম্মদ ফজলু	৶০
৮৮।	আমির সাহিত্য	মৌঃ খোরসেদ আ৹। খা বি.এ.	৹

মখদুমী লাইব্রেরী, ৫ এ, কলেজ স্কোয়ার ক লকতা   বৃহৎ তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

* পুস্তক গুলি গভর্ণমেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত (কলিকাতা গেজেট ২৩-৮ ২২)

মখদুমী লাইব্রেরীর সোল এজেন্সীর কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক।

	পুস্তকের নাম	গ্রন্থকারের নাম	মূল্য
১	সাগর জ্যোতিঃ	মোসাম্মাৎ সারা তৈফুর	১৲
২	প্রদীপ ও চেরাগ	মৌলবী মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লা	৷৷
৩	প্রিয়পয়গম্বরের প্রিয়কথা	মৌলবী তস্লীমুদ্দিন আহম্মদ	৷৹
৪	সংসার জীবন	কাজি আতাউল হক	৷৷৹
৫	Beauties of Islam	সরফরাজ হোসেন কাবা	৷৹
৬	Vindication of Aurangzeb	মোঃ সাদিক আলি	১৲
৭	প্রবন্ধ মালা	কাজি এমদাদুল হক বি এ বি,টী	৸৹
৮	শিশু প্রবাহ	মৌলবী নসিরউদ্দিন আহম্মদ	১৹
৯	সত্য বক্তিম	মৌলবী মোঃ মনসুর আলি	৷৹
১০	সোণার বাতি	মৌলবী শেখ ফজলুল করিম	৷৷৹
১১	মোগল বিদুষী	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
১২	নামাজ	মৌলবী কলিমউদ্দিন আহম্মদ বি এ	১৹
১৩	হজরত আলা	মৌলবী শামউদ্দিন আহম্মদ	১৲
১৪	যোবেদা	মৌলবী মোহাম্মদ এবরাহিম	১৹
১৫	প্রতাপ নন্দিনী	,, রফিউদ্দিন আহম্মদ	১৵৹
১৬	উন্নত জীবন	,, লুৎফর রহমান	৷৹
১৭	হজরত বড় পীরের জীবনী	আজহার আলি	১৹
১৮	হজরত মোহাম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি	শেখ আবদুর রহিম	৩৹
১৯	কতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি	মৌলবী আবদুল আজিজ খাঁ	১৵৹
২০	খাজে মইনুদ্দিন চিশতী	,, মোজাম্মেল হক	৷৹
২১	তাপসমালা ব তাজকেরাতল আউলিয়ার বঙ্গানুবাদ ৬খণ্ড		৬৲
২২	হাদিস মেস্কাত শরিফের বঙ্গানুবাদ ১ম খণ্ড ৪৲, ২য় খণ্ড		২৲
২৩	হজরত মোহাম্মদের জীবনী	মৌলবী আবদুল আজিজ খাঁ	১৵৹
২৪	হাফেজ (হাফেজের বঙ্গানুবাদ)		২৲
২৫	আওরঙ্গজীব চরিত	আবুনসের মোহাম্মদ অহীদুল্লা	২৹
২৬	ভাঙ্গাবুক	মৌলবী গোলাম মস্তফা	১৹
২৭	এসলাম কৌমুদী	মৌলবী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা	১৹
২৮	কোরআন তত্ত্ব ১ম	,, মোবিনউদ্দিন আহম্মদ	১৹
২৯	সৌভাগ্য স্পর্শমণি (৮ খণ্ডে সম্পূর্ণ)	মীর্জ্জা ইউছুফ আলি	১১৹
৩০	পারলৌকিক সম্বল	সৈয়দ মজিরুদ্দিন আহম্মদ	৸৹
৩১	ফবায়েজুল মোসলেমিন	হাকিম মসিহর রহমান	৷৹

মখদুমী লাইব্রেরী, ৫ এ, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা   বৃহৎ তালিকার জন্য পত্র লিখুন